বক্ররেখা

বক্ররেখা

করুণা প্রকাশনী | কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
অবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১২ বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৬

অগ্রজ প্রবীর ঘড়াই ও ভারতীকে

প্রাক্‌কথন

বিহারের প্রান্তিক জেলা সিংভূম আমার কর্মস্থল। সেই সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে পরবাসী হয়েও এ জেলার সব হারানো জনজীবনের সঙ্গে কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি তা এতদিন খেয়াল করিনি। তাদের জীবনের স্বাভাবিক রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি তাদেরই সমাজের একজন হয়ে। এই একাত্ম হয়ে উঠতে আমার জীবনে-মননে যে বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতার স্বাদ অর্জন করেছি, সেইসব ছিন্নমূল মানুষের হতাশা, দারিদ্র, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের পাশাপাশি যে প্রেমময়, সংগ্রামমুখর জীবনের গান শুনেছি, তা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে বাস্তবের যে সংঘাত, আমি আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় পাঠকের সামনে তাই-ই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সেই রূপময় ঐতিহ্যপূর্ণ জীবনের গান আমাকে দারুণভাবে আপ্লুত করেছে, আমাকে বাধ্য করেছে তাদের জীবনের সেই দরদী ভালবাসার স্পর্শ সকলকে পৌঁছে দিতে, মানুষের সেই শাশ্বত প্রেম যা সমস্ত দুঃখ, হতাশা যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়ে নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়, সেই প্রেমেরই জয়গান গাইতে চেয়েছি এই উপন্যাসে। কতখানি সফল হয়েছি সে বিচারের ভার পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে শুধু এটুকু বলছে চাই, বেঁচে থাকার জন্য অন্ন-বস্ত্র আর বাসস্থানের পরও মানুষ আরও কিছু চায়। সেই আরও চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, যে সত্য লুকিয়ে আছে তাকেই খোঁজার চেষ্টা। সেই খোঁজায় কোন মিথ্যার আশ্রয় নিইনি। প্রতিটি চরিত্রে প্রকৃত রূপময়, বর্ণময় অনিন্দ্যজীবনের যে অপার সৌরভ মিশে আছে, তাকেই স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। খাঁটি, সত্য ও স্বাভাবিক সেই জীবন যেন হিরণীর জলপ্রপাতের মতো কল্লোলময় অজস্র স্ফটিকস্বচ্ছ জলধারা। এই ভূমিকা লেখার সময় আমার সামনে এখন সাক্ষী হিরণীর জলপ্রপাত, সূর্যাস্তের সোনালী কিরণ আর প্রকৃতির আদি-অকৃত্রিম স্নেহচ্ছায়া। খাঁটি, সত্য, স্বাভাবিক সেই জীবনধারা যদি কোন পাঠকের অন্তরে সাড়া জাগায়, যান্ত্রিক সভ্যতার মুখোশের আড়ালকে উন্মোচিত করে তবেই আমার এই শ্রম সার্থক হয়।

উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে পাক্ষিক বসুমতী'র পাতায় প্রকাশিত হওয়ার পিছনে যে নির্মল স্বচ্ছ মনের মানুষটির অবদান কখনই ভুলে যেতে পারব না তিনি হলেন আমার অগ্রজ কবি ও কথাসাহিত্যিক শ্রীমুকুল গুহ। এই সুযোগে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর কৃতজ্ঞতা জানাই দে'জ পাবলিশিংয়ের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় সুধাংশুশেখর দে মহাশয়কে। তিনি যদি উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের এই সুযোগ না দিতেন তাহলে আমার মত একজন তরুণ লেখকের পক্ষে এভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত হওয়া হয়তো সম্ভব হোত না। সবশেষে সহৃদয় পাঠক সমাজের প্রতি রইল আমার বিনম্র প্রণাম ও ভালবাসা।



এক

বিহারের এই ছোট্ট শহরটাতে বিষফোঁড়ার মতো পাহাড়, খসখসে পাথুরে জমিতে দারু হাড়িয়ার ঘ্রাণ। শীতের বিষণ্ণ সকালে কুয়াশারা দল বেঁধে উড়ে যায় বিনজুয় নদীর দিকে, রাক্ষুসি রোদে তাদের টিকিও দেখা যায় না। ক-দিন থেকে শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। উড়ন্ত কুয়াশারা মাছের থকথকে ডিম হয়ে সাঁতার কাটে নদীর জলে। নদীর দু-পাড়ে অশন-গামার-শাল-মহুয়ার বুক চিতান সারি যেন আদিবাসী যুবকের পেশি বহুল পাথর চাট্টান শরীর।

রাঁচি-চাইবাসা রোডের ধারে বটুর একটা গুমটি চায়ের দোকান। রোজই কুয়াশা মাখামাখি ভোরে দোকানের ঝাঁপ খুলে দিয়ে দূরের দিকে উদাস চোখে চেয়ে থাকে বটু। দু-চোখ জুড়ে যন্ত্রণার আঁকিবুকি রেখা, বুকের ভেতর বিরামহীন দুঃখের চাষ-আবাদ।

যার কেউ নেই তার তো ভগবান আছে—এমন কথা পুরনো। বটু বলে—মাখনদাদা, তোমরা আমার ভগবান। খদ্দের তো ভগবানের সমান।

গুল-কয়লার আঁচ শীতের বিকেলের চেয়ে অতিদ্রুত ফুরিয়ে যায়, সেই নিভু নিভু আঁচে মুঠো মুঠো গুল কয়লা ফেলে দিয়ে ভাঙা তাল পাখায় পাখির ডানা ঝাপটানোর মতো এক নাগাড়ে হাওয়া করে যায় বটু। ঘেমে গেলে কালি-ঝুল মাখা হাতে ঘাম মুছে নেয় অভ্যস্ত কায়দায়। তখন পরিশ্রমের চিহ্নগুলো মুখে প্রগাঢ় হয়ে ফুটে ওঠে। হতাশা, ব্যর্থতার পাশাপাশি তার ডাগর চোখ দুটো বড়ো চমকায়। হারতে হারতে মানুষ যেমন মাটি কামড়ে উঠে দাঁড়ায় তেমন মনোবল বটুর ভেতরেও আছে। আমার মনে হয় সে নিজেই একটা জীবনদায়ী, প্রাণশক্তি উথলে ওঠা সালসা।

শীতের হিমেল আঁচল এ তল্লাটে ছড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। টিং টড়ং

পাখি কাঁপতে কাঁপতে উড়ে যায় রোদের খোঁজে। মহুয়া আর কুসুম গাছের পাতা চুঁইয়ে ঝরে পড়ে অভিমানী কুয়াশার চোখের জল। এ সব দেখতে দেখতে চায়ের জন্য গুঁড়ো দুধ গোলে বটু। তখনও সূর্যের কোনো দেখা নেই, নিদ্রাতুর তরল আঁধার পোকাসিমা গাছের জঙ্গলে মুখ হুমড়ে শুয়ে থাকে। শুনশান পিচ সড়কে ভারী চাকার শব্দ তুলে ছুটে যায় দূরপাল্লার ট্রাক। কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা কুকুরটা ডেকে উঠে বাতাস বিদীর্ণ করে। তার ডাক অনেকটা শ্মশান কুকুরের মতো। তখনও কাঁচা সূর্যের মুখ দেখা যায় না, শীত হাওয়া সপাং সপাং চাবুক মারে দোকানের ঝাপে। নড়েচড়ে বসে বটু। কখনও শীত তাড়াতে হাত দুটোকে মেলে ধরে গনগনে আঁচের উপর।

রাঁচি-চাইবাসা সড়কের ধারে আমাদের যে মেসবাড়ি তা এখন ডুবে আছে কুয়াশায়; আলোর অপ্রতুলতায় মাত্র দশ কদম দূর থেকে ঢালাই করা ঘরটাকে ধোঁয়ার উৎসমুখ বলে মনে হয়। পরিমল মেসের ম্যানেজার। শুধু এই অবৈতনিক পদাধিকার বলে গায়ে লেপ চাপিয়ে দড়ির খাটিয়ায় সে সকাল আটটা অব্দি ঘুমোয়। ঠাকুর রামধন সুখী তোতাপাখি, দু-বেলা রান্না ছাড়া সে কুটোটি ভেঙে দুটো করে না। এই নাজেহাল শীতে তার নাকি হাড় কাঁপে, ফলে ভেড়ার লোমের কম্বলের উপর দশাসই লেপ চাপিয়ে দিয়ে বারোটায় সে-ও নাক ডাকায় আলো না ফোটা পর্যন্ত। অফিসের ভাত দশটায় না দিলেও আমরা তার উপর রাগ-ঝাল করতে পারি না। কারণ সে যদি কাজ ছেড়ে চলে যায় তাহলে এই প্রবাসে স্টেশনের ধড়ধড়িয়া মার্কা হোটেলে ভাত খেয়ে আমরা নির্ঘাত ডাইরিয়া বাধিয়ে বসব। পরিমল তার ম্যানেজারি অক্ষুণ্ণ রাখতে রামধন ঠাকুরকে রীতিমতন তোয়াজ করে চলে তার কড়া অর্ডার, বেড-টি খেতে হলে সোজা বটুর দোকানে চলে যাও। ওখানে হিসাবের খাতা খোলা আছে, খেয়ে-দেয়ে শুধু লিখে দিলেই হবে। বিল যা হয় মাসের পয়লা তারিখে সব মিটিয়ে দেওয়া যাবে।

পরিমলের কথা অমান্য করার সাহস কারও নেই, তাই এই তীব্র শীতে খদ্দরের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে আমি চলেছি বটুর দোকানে। আমার দু-আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে সুগন্ধি তামাকের নমনীয় শরীর। আর্দ্র হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে তামাকের ধোঁয়া।

ভোরবেলায় কী কারণে যে ঘুম ভেঙেছিল, তারপর আর ঘুম আসেনি আমার। চটকে যাওয়া ঘুম চটকে যাওয়া ফুলের মতো কিছুতেই আর আগের অবস্থায় ফেরে না। ওই অত ভোরে কী খেয়ালে জানালাটা খুলে দিতেই চতুর চোরের মতো হিম ঢুকে এসেছিল ঘরে। পরিমল তো রেগে আগুন! ঠাণ্ডা লাগতেই ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিল, তোর কী মাথা-টাথা খারাপ মাখন, এই এত ভোরে কি কেউ জানালা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে

থাকে। ঠাণ্ডা লাগিয়ে খক্‌খক্‌ করে কাশলে দেব একেবারে মেসের বাইরে বের করে। এটা বেঙ্গল নয় রে যে সকালবেলায় খালি গায়ে হাওয়া খাবি!

পরিমলের সতর্কবাণী বড়ো মজার! ছেলে হিসাবে পরিমলও আদ্যোপান্ত মজার। অমন আড্ডাবাজ ছেলে আমাদের মেসে নেই বললেই হয়। ওর লাগামছাড়া মুখকে আমরা সবাই সমীহ করে চলি। মন ভালো না থাকলে ও নদীর কাছে চলে যায়। পাথর ফাটিয়ে, বন-জঙ্গল চিরে, সমতলের বুক ঘা করে বিনজয় সতত প্রবহমান। এই বিনজয় আবার মিশেছে সঞ্জয়ে। আসলে, বিনজয় সঞ্জয় দুই ভাই। আমরাও দুই ভাইয়ের মতন মিলেমিশে বেশ আছি এখানে। বাংলার জন্য মন কেমন করে, এই মন কেমন করাটাও স্বাভাবিক।

মেস ছাড়িয়ে কিছুদূরে আসতেই ঠাণ্ডাটা খুব জোর লাগে, দাঁতে দাঁত চেপে কেঁপে উঠি আমি। গতকালের বাংলা কাগজে পড়েছিলাম—বঙ্গোপসাগরীয় নিম্নচাপ, শৈত্য প্রবাহ মাঝে মাঝে জ্বালাবে। বিহার এমনিতে শীতের জায়গা, তার উপরে নিম্নচাপে কেঁপে যাচ্ছিল ধরিত্রী। বাঁদর টুপিটায় কান ঢেকে আমি যখন হাঁটছিলাম তখন বড়জোর ছ-টা বাজে ঘড়িতে। শুনশান পিচ রাস্তা। করাত কলের গেটের মুখে টুকরো কাঠের আগুন জেবলেছে দারোয়ান লাটু সিং। তার অসুরের মতো চেহারা এই শীতে গুটিয়ে আধুলি হয়ে যাওয়া কেন্নো। আমি গিয়ে সেই আগুনের সামনে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালাম।

আমাকে দেখে লাটু আড়ষ্ট গলায় বলল, বাবু, কাল যে অমনভাবে বাজি লড়ে হেরে যাব জিন্দেগিতে ভাবিনি। ধোপ্‌ মুরগাটা বড়ো ধোঁকা দিল।

লাটু মুরগা পাগল মানুষ। শীতের সিজিনে তার উড়ুক্কু মন ঘরে থাকে না। কাল একটা সাদা রঙের মোরগ হেরে বাটি চারেক হাঁড়িয়া খেয়ে ঘরে ফিরেছে সে। তার বউ মালতীর এসব আবার না পসন্দ। সে ছাপোষা মেয়েমানুষ। নেশা-ভাং, মরুগা লড়াই, হাব্বা-ডাব্বা, তিন তাস- -এসবকে বড়ো ভয় পায়। ভয় পেলেও তার মুখ চলে ক্ষুরের মতন। রেগে গেলে তার মাথায় নাকি ভাপ বেরোয়, দু-চোখ আঁধার দেখে সে। কাল বিকেলে লাটু যখন ধোপ মুরগাটা হেরে গেল লড়াই মাঠে, তখন এই দুঃসংবাদ পেয়ে সেখানে ছুটে এসেছিল মালতী। গাল দিয়ে বিষিয়ে দিয়েছিল বাতাস, হিড়হিড়িয়ে টেনে এনে বলেছিল, 'ঘর চলো, তোমার মান্‌সো কেটে-কেটে ছেলে-মেয়েদের আমি খাওয়াবো। আমার পোষা মুরগাটা কেনে হেরে গেলে ধ্যাঙ্গড়ের বাচ্চা! লাটুর ভালো নাম লাটবাহাদুর সিংহ। এক পুরুষ বিহারে থেকে সে সিংহ ছেড়ে সিং হয়েছে। খুবই পরিশ্রমী যুবক, মোষের মতো খাটতে পারে। আগে সে রিক্‌সা টানত কিন্তু টিবি হওয়ার

পরে গোঁফ রেখে করাতকলের দারোয়ান। হাতে কাজ না থাকলে সে প্রায়ই আমাদের মেসে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে, তারপর ঠাকুর রামধনকে নিয়ে হাড়িয়া ঠেকে চলে যায়। ভরপেট হাড়িয়া খেলে লাটুকে তখন চেনা যায় না ; আনশান বকে, খিস্তি-খেউড়ের বন্যা বইয়ে নিরীহ বউটাকে চুলের মুঠি ধরে পেটায়। মারধোর খেয়ে মালতী দমতক চেল্লায়, কখনও বা পাল্টা আক্রমণে দরজার খিল কাঠ নিয়ে তেড়ে যায়। এসব ওদের নিত্যকার নাটক, দেখে-দেখে আমাদের চোখ সওয়া।

বটুর চা দোকানটা ছোট্ট কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় তা অনেকটা আদিবাসীদের নিকোনো তকতকে ঘরগুলোর মতো। তোলা আঁচের উপর অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে জল ফুটছিল টগবগিয়ে। বটু সেই ফুটন্ত জলের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে। আমার পায়ের শব্দে সে ধড়ফড়িয়ে তাকাল, তারপর হাসি-হাসি মুখ করে বলল, ভেতরে এসো মাখন দাদা। আজ যা হিম পড়ছে—বাইরে বসলে পুরোটাই ভিজে যাবে।

বটুর কথা শুনতে মজা লাগে আমার। মাঝে মাঝে ওর বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে কথা বলার ধরনটায় অমাবস্যা-পূর্ণিমার খেলা চলে। তবে ওর মুখের ভাষা রেল লাইনের শক্ত খোয়া পাথর নয়, সন্দেশের চেয়েও নরম। বটু যা বলে তা আবেগ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। ওর সরল নিষ্পাপ চোখে কোনো ফাঁকি নেই, ছলনা নেই। অনেক সময় মনে হয় বটু ওরফে বটকৃষ্ণ—সে নিজেই যেন একটা আকাশ।

কাল রাতে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হয়েছিল সামান্য, পথের ধুলোতে সুস্পষ্ট জেগে আছে বৃষ্টি সোহাগের চিহ্ন। রোজ যে ঘেয়ো কুকুরটা আমার পেছনে পেছনে আসে আজও বটুর চা-দোকানের সামনে এসে লেজ নাড়াচ্ছে বিস্কুটের লোভে। বটু তাকে দুটো কমদামি বিস্কুট দিতেই কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিস্কুট দুটো তুলে নিয়ে রেল লাইনের দিকে চলে গেল। তার খাওয়াটা এমনই সতেজ, বেগবান—আমি আর বটু হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম সেইদিকে।

বটু ইদানিং কী যেন ভাবে একা একা। দোকানে খদ্দের না থাকলে সে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। সে যে কী এত ভাবে আমরা কেউ জানি না। শুধালে বটু হাসে। বলে, কিছু না।

আমি নিশ্চিত, সব মানুষের মতো বটুর এমন কিছু অতলস্পর্শী দুঃখ আছে যা সে ঝিনুকের মুক্তোর মতো লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসে। বটুর এই ভাবনা-কাতর মুখ মাঝে মাঝে আমাদেরকেও .পীড়া দেয়। সে সহজ হতে পারে না বলেই দুঃখবোধ গাঢ় হয় মনে। মাঝে মধ্যেই সন্দেহজনিত কারণে আমি বটুকে শুধাই, আচ্ছা বটু, তোমার দেশ কোথায় ছিল ?

বটু উত্তর না দিয়ে ক্লান্ত চোখ মেলে আমার দিকে তাকায়। আমি যখন জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা বটু, তোমার মা-বাবা এখন কোথায় থাকে? আমার এই প্রশ্ন যেন বটুর মুখের সমস্ত রক্ত শুষে নেয়। তখন সে ভারাক্রান্ত গলায় জবাব দেয়, আমার কেউ নেই মাখনদাদা। এ দুনিয়ায় আমি একা।

এত বড়ো দুনিয়ায় কেউ একা ভাবলেই কষ্ট হয় আমার। বটুর ধড়কানো বুকের প্রতিধ্বনি আমার বুকেও প্রতিফলিত হয়। ওর চোখে মুখে ছড়িয়ে থাকা নিখাদ আতঙ্ক ছুঁয়ে যায় আমাকে। আমি বুঝতে পারি না ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উঠলে ও কেন এত বিমর্ষ হয়ে পড়ে। ইদানীং কেন ধোঁয়াশাময় আর রহস্যে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে ওর মনের জগৎ। নানান কৌতূহলী প্রশ্ন আমার ভেতরেও খেলে বেড়ায়। আমি বটুকে আর উত্যক্ত করার চেষ্টা করি না। এক ধরনের পাপবোধ আমার সত্তায় আঘাত হানে, কাউকে অবজ্ঞা করাও তো এক ধরনের হীনমন্যতা, পাপ। আমি বটুকে দুঃখ দিতে চাই না। ওর ভেতরে যে দুঃখের নদীটা বয়ে যায় তার গতিপথটা শুধু পালটে দিতে চাই।

আলো ফুটলেই কুয়াশার মলিন চাদরটা সরে যায়, দুধ দাঁত নিয়ে প্রাণবন্ত হেসে ওঠা শিশুর মতো প্রফুল্ল হয়ে ওঠে পৃথিবী। বিনুজয়ের উপর থেকে ধীরে ধীরে সরে যায় কুয়াশার ডিম, লাল মুখ দেখিয়ে পুব কোণে উঁকি দেয় অতি চেনা সেই মুখ।

বটু কাঠের পিঁড়িটায় ঝিম ধরা মোরগের মতো ঘাড় নিচু করে বসে থাকে চুপচাপ। ওর দু-হাত চাদরের ভেতরে ঢোকানো, গেঁড়ি শামুকের চেয়েও উঁচু হয়ে জেগে আছে ওর মাথায় বাঁদরটুপি। এই শীতে ওর গায়ে কোনো সোয়েটার নেই, বহু ব্যবহৃত পাতলা ফিনফিনে একটা জামা। যদিও পরণে রঙ-জ্বলা ফুলপ্যাণ্ট, তবু এই প্যাণ্টেই তাকে বছর দুয়েক দেখছি। মাঝে মধ্যে কোথাও যেতে আসতে ওকে একটা নীল রঙের ফুলপ্যাণ্ট পরতে দেখি, যেটা ও ব্যবহারের পর কেচে ইস্ত্রি করে টিনের সুটকেসে ঢুকিয়ে রাখে। বটু এত উপার্জন করে তবু ওর এত দুর্দশা কেন? এ অঞ্চলে ভালো চায়ের দোকান বলতে বটুর চায়ের দোকানকেই বোঝায়। শুধু চা কেন, পান-বিড়ি পাউরুটি-ডালমুট সবই পাওয়া যায়। সততা যার মূলধন তার তো বিক্রি কোনোদিন খারাপ হয় না। বটু এত টাকা রোজগার করে অথচ সে সব টাকা যায় কোথায়? যতদূর জানি বটুর কোনো বাজে নেশা নেই। মদ-মহুয়ার দেশে ও কোনো নেশালি দ্রব্য ছুঁয়েও দেখে না।

বটুকে জুবুথুবু বসে থাকতে দেখে আমি শুধোলাম, আজ বুঝি খুব ভোরে দোকান খুলেছ? এত ভোরে যে দোকান খোল তোমার শীত লাগে না?

প্রশ্ন শুনে বটু স্বভাবসিদ্ধ এক গাল হাসি ছুঁড়ে দেয়। চাদরের ভেতর থেকে কাছিমের মতো হাত দুটো বের করে চা তৈরির কাজে মন দেয়। আমি

আগ্রহ ভরে শুধোলাম—বটু, রাতে তোমার ভালো ঘুম হয় তো ?

ঘুম ? বটু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, তারপর আত্ম সমীক্ষায় ডুবে গেল। জানো মাখনদাদা, সাচমুচ ঘুমের জন্য আমার আর কিছু হল না। ঘুমই আমার সব কেড়ে নিল। বলেই ধূমায়িত চায়ের কাপটা ধরিয়ে দিল আমার হাতে।

বটু যখন তার চায়ের দোকানের সুখ-দুঃখের গল্প বলতে ব্যস্ত আমি তখন কাঠের বেঞ্চিতে বসে হাঁটু কাঁপিয়ে কাঁপছি। আমার দু-আঙুলের ফাঁকে আগুনমুখো সিগারেট, যার উত্তাপে বিন্দুমাত্র পার্শ্বপ্রক্রিয়া নেই ! গতকালের অবিক্রীত কেকগুলোর দিকে নিস্তেজ চোখে তাকিয়ে বটু আমাকে বলল, এক সাথে অত মাল তুললে লোকসান হয়। এবার থেকে ভাবছি মাল কম তুলব, তাতে ফয়দা বেশি।

আমি ভেবে-চিন্তে বললাম, শীতকাল, পচে যাবার তো কোনো চান্স নেই। বাড়তি কেকগুলো আজ তুমি বিক্রি করে দিয়ো।

আমার কথায় সন্তুষ্ট হল না বটু, মুখটা নিম-তেতো করে বলল, বাসি মাল লোকের হাতে তুলে দিতে লাজ লাগে। তাছাড়া আমার তো আলতু-ফালতু খদ্দের নেই, দিতে হলে জানা-শোনা লোককেই দিতে হবে।

বটুর এই ভাবনা আমাকেও ভাবায়, শুধু লাভের কথা ভেবে নয়—আমাদের কথা ভেবে ওর যে দ্বিধাজনিত সংকোচ এটা ওর সহজাত গ্রাম্যগুণ। কাঠের পিঁড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে বটু আমার মুখোমুখি বসল। শীতের চাবুক হাওয়ায় মাটির দেওয়ালে লটকে থাকা গণেশের ছবিটা বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে দোলে। ঘ্যার ঘ্যার শব্দ হয় টিনের পাতে। বাইরে আমি হাল্কা চালে বললাম, বটু এবারের শীতটা কেমন ?

বহুৎ তাগড়াই ! বটু গজদাঁত দেখিয়ে হাসল।

সম্ভবত আমি এর দোকানের প্রথম খদ্দের। করাতকলের শ্রমিকগুলো অন্যদিন এ সময়ে এসে যায়, আজ তারা আসেনি বলে বটুকে বেশ চিন্তিত দেখায়। দূরের কুয়াশা ঢাকা পথটার দিকে তাকিয়ে কী মনে করে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, তারপর আঁচটা খুঁচিয়ে দিয়ে পিঁড়ি সরিয়ে আরও আমার কাছাকাছি চলে এল। আমি কথা খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বটু তোমার শীত লাগে না ? বটু হাতের তালুতে তালু ঘষে স্তব্ধ চোখে তাকাল, শীত তো সবার লাগে কিন্তু কী করব, মজবুর। ধান্দা না করলে যে দানাপানি জুটবে না।

ওর কথা শুনে কষ্টের চোখে তাকালাম। বুকের ভেতর থেকে উঠে এল নিখাদ অপ্রতিরোধ্য এক দুঃখের ঢেউ। বটুর কথায় বিন্দুমাত্র ভুল নেই, পেটের মতো শত্রু এ দুনিয়াতে নেই। এই যে আমরা স্বভূমি, স্বগৃহ ত্যাগ করে এখানে এসে নোঙর ফেলেছি সে-ও তো সেই পেটের দাবি

মেটাতে। লোকে বলে, বটু এখানকার অনেকদিনের বাসিন্দা। ওর আসল ঘর-বাড়ি কোথায় তা কেউ জানে না। বটু কাউকে আগ বাড়িয়ে কিছু বলে না। দুপুরের দিকে ভিড় পাতলা হয়ে এলে আঁচে দুটো গুল কয়লা ফেলে সে প্রতিদিন নিজের খাবারটা ফুটিয়ে নেয়। তারপর, অন্ধকার দোকান ঘরের এক কোণে চট বিছিয়ে সে দুপুরের খাবার খেয়ে নেয়। বেশির ভাগ দিনই সেদ্ধ ভাত। খুব বেশি হলে গরম ভাতে সে এক চামচ ঘি ফেলে দেয়, এছাড়া তার কোনো ভোজন বিলাসিতা নেই। বটুর একা থাকার যন্ত্রণাটা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। বিগত দশ-বারো বছরে কেউ তার ঠিকানায় চিঠি লেখেনি, কোনো আত্মীয় স্বজন এসে খোঁজ খবরও নেয়নি। বটুর কি তাহলে ঘর-সংসার, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই? এ প্রশ্ন আমার মতো এখানকার অনেকের। আমরা যারা ওর ঘনিষ্ঠ আমাদেরও জানতে ইচ্ছে করে ওর পূর্ব ইতিহাস। দোকানে লোকজন না থাকলে কথার মার প্যাঁচে বহুদিন ওকে আমি কাহিল করে ফেলেছি। তখন দেখেছি—ওর চেহারায় আশ্চর্য এক পরিবর্তন। ঘাবড়ে যাওয়া মানুষের মতো বটু তখন ঘনঘন জল খায়, ভয়-বিহ্বলতায় ভরে ওঠে ওর চোখ দুটো। পচা ঘায়ে বেশি খোঁচাখুঁচি করা অন্যায়, আমি হিসাব খাতায় চায়ের দামটা লিখে উঠে দাঁড়াই। বটু তখনই উশখুশিয়ে বলল, আর একটু বসো মাখনদাদা, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কাজ আছে। অনেকদিন থেকে ভাবছি কিন্তু কিছুতেই আর সময় হয়ে উঠছে না। আজ তোমাকে কাজটা করে দিতেই হবে।

আমি বটুর দিকে ঝুঁকে পড়ে শুধাই, কী কাজ?

বটু ইতস্তত চোখে তাকিয়ে পিছনের ঘুপচি ঘরটায় চলে যায়। ওটা বটুর শোওয়ার ঘর। দড়ির একটা চৌপায়া ছাড়া ছোট্ট ঘরটাতে ঘুঁটে-কয়লা, পিচবোর্ডের বাক্স, বিসকুটের পুরনো টিন আর হাজার গণ্ডা আরশোলায় ভর্তি। দিনের বেলায় আলো-বাতাস খুব কম ঢোকে, সব সময় চাপা গুমোট একটা ভাব। শীতকালে যেমন তেমন কিন্তু গরমকালে ওই ঘরে বসবাস করা খুবই কষ্টের। অথচ বটু সেখানে অম্লান বদনে দিনের পর দিন থাকতে অভ্যস্ত। আমরা যদি বলি, বটু এবার তুমি নিজের জন্য একটা খাপরার ঘর তুলে নাও। —তখন বটু আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে শব্দহীন হাসে। তখন ওর চোখে হাজার স্বপ্নের আঁকিবুকি। বটু যে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে তখন ওর চোখে দুটো দেখলে বোঝা যায়!

অন্ধকার নিঃঝুম ঘর থেকে বটু ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যে, ওর হাতে একটা মানি-ওর্ডার ফর্ম! আমার দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, এটা ভরে দাও মাখনদাদা। খুব জরুরি।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, টাকা পাঠাবে বুঝি? ঘাড় ঝোঁকায়

বটু। ওর চোখে-মুখে গোপন উত্তেজনা টগবগিয়ে ফুটছে। আমার মনেও তখন পুঞ্জীভূত সন্দেহের মেঘ। যার কেউ নেই সে আবার টাকা পাঠাবে কার কাছে ?

বটু সোৎসাহে তাগাদা দিয়ে বলে, ঝটপট লিখে দাও দেখি, আমার একটু জলদিবাজি আছে।

নাম বলো ?

বটু সন্দেহের চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল, অনেকক্ষণ কী যেন ভেবে মুখে কুলুপ আঁটল সে। আমি কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, যার কাছে টাকা পাঠাবে তার নামটা বলো ? ফর্মটা ভরে দিয়ে আমি চলে যাই। আমারও অনেক কাজ পড়ে আছে।

বটু বাক্যহারা চোখে দূরের দিকে তাকাল। ততক্ষণে কুয়াশা চিরে গর্ভের সন্তানের মতো বেরিয়ে এসেছে রক্তমুখী সূর্য। আলোর বর্ণময় দ্যুতিতে রেল লাইন স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বটু বলে কুমারী সুখিয়া পাসোয়ান।

আমি ওর হিসাব লেখা কমা ডটপেনে ঘ্যাস ঘ্যাস করে লিখলাম—কুমারী সুখিয়া পাসোয়ান !

'কেয়ার অফ' শুধাতেই বুঝতে না পেরে হা-করে আমার মুখের দিকে তাকায়। আমি বলি, সুখিয়ার বাবার নামটা বলো ? পুরো ঠিকানা না লিখলে টাকা কীভাবে পৌঁছবে ?

বটু গুম হয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে পুরো ঠিকানাটাই বলে। আমি লেখা শেষ করে ওর মুখের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাই, এবার তোমার ঠিকানাটা কী লিখব বলো ? দোকানের ঠিকানাটা কি লিখে দেব ?

হায়-হায় করে উঠল বটু, তারপর ফর্মটা ছিনিয়ে নিয়ে সে কেমন অস্থির হয়ে বলে, না না মাখনদাদা, তাহলে আমার সত্যনাশ হয়ে যাবে।

আমি তার অশান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে শুধোই কী ব্যাপার বটু ঘটনাটা কী খুলে বলো তো ?

ভয়ে ছোট হয়ে আসে বটুর চোখ। কাছিমের মতো হাত-পা গুটিয়ে সে আবার পিঁড়িটায় গিয়ে বসে। করাতকলের লোকগুলোকে আসতে দেখে সে নিচু গলায় বলে, এখন নয় পরে এক সময় বলব। সে আবার চা তৈরির কাজে মন দেয়। তখন দুঃস্বপ্নে ডোবা মানুষের মতো থমথমে দেখায় বটুকে।



দুই

রোদ উঠলে সূর্যের আলো কিৎকিৎ খেলে রেলপাতে, কয়লার ইঞ্জিন পাত কাঁপিয়ে চলে যায় ধূমদৈত্যের মতো, দু-পাশের মাটি পড়ে থরথর। পাখ-পাখালির সে কী উল্লাস, চেঁচামেচি! ইঞ্জিনের মাথায় চক্কর কেটে ওড়ে ধূকো চিল। সেদিকে হাপুস চোখে তাকিয়ে থাকে বটু। চা দোকানটা তার কাছে তখন জেলখানা, নরকখানা। পালিয়ে যাবে তেমন চওড়া বুকের তাগত কোথায়? একঘেয়ে লাগে জীবন জীবন নয়,—শীতের শুরুতে পাতা ঝরা বৃক্ষ। ওই হলদেটে কাঠবাদাম গাছটার মতো কখন ডাক আসবে হাওয়ার, উড়ে যাবে হলুদ স্মৃতিমুক্ত পাতা।

যত দিন যায় বটুর হাঁপানি, ছটফটানি তত বাড়ে, বড়ো একা আর কোণ-ঠাসা হয়ে পড়ে সে। অসাবধানে গরম জল আর কড়া লিকার ছিটকে পড়ে গায়ে, ফোস্কা নেয়। বাইরের ফোস্কা দ্রুত মেলায় কিন্তু ভেতরের ফোস্কায় জল জমানো জমাট বাঁধা ব্যথা। মনটা আশ্রয় খোঁজে, যে আশ্রয়ে দুঃস্থ পাখিও ডিমে তা দেয় নির্ভাবনায়। এই কঠিন-কঠোর দিনে তেমন নিরাপদ আশ্রয় কোথায়? চা দোকানের একঘেয়েমি বটুর আর ভালো লাগে না। রেল লাইন ধরে কখনও হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় অনেক দূর, হাওয়ার শিসে কাঁপুনি ওঠে ঠোঁটে, নদীর জলে ঢেউ জাগে তিরিতিরি। জলের মায়া তো মায়ের মায়া। জলে হাত ছোঁয়ালেই মন হয়ে যায় চঞ্চল ফড়িং। ছোটো-বেলার অভিশপ্ত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনটা উড়তে উড়তে সুদূরে প্রবাসে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। পাথর কখনও জলের ভাষা বোঝে না, পাথর শুধু আটকে রাখে জলকে। তার বাবা অনেকটা পাথরের মতো, পাথরের বুকে জমে ওঠা শ্যাওলা যেন তার স্নেহ। বাবার স্নেহ-ভালোবাসা থেকে চিরকালই বঞ্চিত ছিল বটু। ধনলালের চওড়া ছাতিতে স্নেহ মায়া-মমতার চাষ-আবাদ ছিল না, সে ছিল নির্দয় প্রকৃতির ঘোরতর সংসারী মানুষ। রৌদ্রদগ্ধ শুষ্ক দিনগুলোর সঙ্গে তার মরুভূমি মনটার মিল খেয়ে যায়।

মন যে ইঁট-পাথরে তৈরি হয় বটু জ্ঞান পড়ার পর থেকেই হৃদয় দিয়ে জেনে যায়। মা ছিল তার আশা-ভরসার স্থল, ভাঙা দেব দেউলের মতো। অনেক পরে মা-কেও সে চিনতে পারে, বুঝতে পারে—মা হল চোরাবালির ঢিপি, যার কোলে ঘুমোলে তলিয়ে দেবে জল অতলের রাজ্যে। তাই বাবা-মা কারোর কথাই সে আর মনে করতে চায় না। লিকার নিষ্কাশিত চায়ের মতন এখন অপ্রয়োজনীয়। যে সম্পর্কে চিড় ধরেছে তার আর নতুন করে ভাবনার সেচ লাগিয়ে সবুজ সম্বন্ধ ফিরে পায় না। মা-বাবা বটুর কাছে ভেঙে ফেলা শ্লেট—যার টুকরোগুলো আমূল গেঁথে গিয়েছে বুকে, সময়ে অসময়ে ঘাম নুন ধারায় হু-হু করে জ্বলে। ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বটু আর ভাবতে চায় না, ভাবতে পারে না। স্মৃতির মাকড়শাগুলোয় বড়ো বেশি বিষ, জ্বালা।

হাটবার বলেই ভিড় উপছে পড়ছিল দোকানে। শোনুয়া, লোটাপাহাড়, দেওগাঁও আর চ্যালাবেড়ার আশপাশের গাঁগুলো থেকে লোক আসছিল কাতারে কাতারে। মাথায় সবজির ঝুড়ি, কারও হাতে ঝোলানো শাঁওনি, বালিয়া আর ধোপরঙ্গুরা মোরগ। তারা অনেকেই বেচা-কেনা সেরে বটুর চা দোকানে নাস্তাপানি করে, তারপর গাঁয়ের পথে দীর্ঘশ্বাসের মতো মিলিয়ে যায়। হাটবার থাকলে বটুর বিক্রি-বাটা ভালো হয়, তবে ঘাড় গুঁজে চায়ের দুধ গুলতে গুলতে এক সময় সে হাঁপিয়ে ওঠে। তখন বুক ভরে শ্বাস নিলেও শরীর থেকে পরিশ্রমের চিহ্নগুলো মেলায় না, জন্মদাগের মতো আঁকড়ে থাকে।

রোদ ফুটতেই খোলাম কুচি এলোমেলো ছুঁড়ে দেওয়ার মতো উড়ে বেড়ায় কাক! হাওয়া ছোটে এলোপাথাড়ি, হাওয়ায় ওড়ে বুড়ো শিশমের পাতা। বটু ঘাড় তুলে দেখে লাঠি ঠুকে ঠুকে তার দোকানের দিকে এগিয়ে আসছে হাসান মাস্টার—তার সফেদ দাড়িতে সোনালি রোদের ঝিকমিক। এত বয়স হল, তবু মাস্টারের পরিশ্রমের শেষ নেই। তার প্রসারিত উজ্জ্বল দুই চোখের দিকে তাকালে আপসেই নুয়ে আসে বটুর মাথা, শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ওঠে অন্তর। হাসান মাস্টারের কাছে তার তো ঋণের কোনো গাছ-পাথর নেই, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সে বড়ো দরাজ। এই পাথুরে মাটিতে সে যখন পা দিল তখন এ এলাকার কেউ চিনত না, জানত না তাকে। অজ্ঞাত কুলশীল বটুকে গোয়াল ঘরের এক কোণে আশ্রয় দিয়েছিল মাস্টার। শুধু আশ্রয় নয়—খেতে-পরতেও দিত। বলত, বেটা তোর উমর কম। পুরা জিন্দেগি তোর পড়েই আছে। এখন থেকে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা কর। কাজে ফাঁকি না থাকলে মানুষ একদিন দাঁড়ায়, সেদিন কিন্তু পেছনের কথা ঝাপসা হয়ে আসে। মাস্টারের কথামতো বটু দূর-দূরান্তের গাঁ থেকে ডিম কিনে এনে স্টেশন চত্বরে সেদ্ধ

করে বেচত। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সময় অনেক মানুষ উঠত-নামত এখানে। ডিমের খাঁচা হাতে নিয়ে ঘুরঘুর করত বটু। লাভের পয়সা জমা রাখত হাসান মাস্টারের কাছে। তার সততায় খুশি হয়ে মাস্টার একদিন বললেন, জমানো পয়সায় তুই একটা চা দোকান কর বেটা। দরকার হলে আমিও তোকে কিছুই সাহায্য করব।

বটুর চা দোকান হল। রেলের লোকজন তখন আসতে শুরু করেছে, রেল কলোনি তখন ফুলিয়ে দেওয়া বেলুনের মতো বাড়ছে।

হাসান মাস্টার বললেন, শুধু চা নয়, বিস্কুট-কেক, পান-সিগারেট সব কিছু রাখ্। অফিসবাবুরা তোর দোকানে নাস্তা সেরে চায়ের অর্ডার দেবে, পুরো পয়সাটা তোর পকেটে যাবে।

হাসান মাস্টারের সুবুদ্ধি আর উপদেশে বটুর চা-দোকানে এখন মালক্ষ্মীর দয়া। দিন গেলে খারাপ কামাই হয় না। প্রতিদিন দু-বেলা এসে খোঁজ নিয়ে যায় মাস্টার। বটু দু-বেলা দু-কাপ চা দেয় মাস্টারকে, পয়সা নেয় না। হাসান মাস্টার এ ব্যাপারে ইতস্তত করলে বটু জোর গলায় বলে, আপনার দয়াতে আমার এই চা-দোকান। বুকের খুন দিলেও যে ঋণ শোধ হয় না, দু-কাপ চায়ে কি সব শোধ হয়ে যাবে মাস্টারসাব ?

দশ বছর আগেকার সেই রমরমা অবস্থা নেই হাসান মাস্টারের, এখন ঝড়তি-পড়তি সময়। তার একমাত্র ছেলে জালাল—কামচোর, লাফাঙ্গা। মাস্টারের তাই বদনসিব। আক্ষেপ করে বলেন, ছেলেটা আমার মানুষ হল না বটু। ওটা একটা জানোয়ার। ওর কলিজায় কোনো দয়ামায়া নেই। কোন্‌দিন ছেলেটা আমার পুলিশের গুলিতে মরবে। সেদিন কাঁদার জন্য চোখের জলও আর অবশিষ্ট থাকবে না।

রেল কলোনি আর আশপাশের গ্রামগুলোয় হাসান মাস্টারের সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। অবসর সময়ে মাস্টারমশাই হোমিওপ্যাথির ব্যাগ নিয়ে ঘোরেন, কেউ একবার খবর পাঠালেই হল—শত অসুবিধা থাকলেও মাস্টার সেখানে যাবেনই। মানুষের আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়ানোর জন্যই তাঁর বুঝি পৃথিবীতে আসা। হোমিওপ্যাথি ছাড়াও মাস্টারসাবের চোখের দাবাই এ অঞ্চলে বিখ্যাত। নিজের হাতে তৈরি ওষুধ—ছোটো-খাটো চোখের রোগে অব্যর্থ ফল। সবই গাছ-গাছড়া শেকড়-বাকড় বেটে তৈরি। জয় বাংলার সময় মাস্টারসাব ঘর ঘর গিয়ে ওষুধ দিয়েছেন, পয়সা কামানোর ইচ্ছে থাকলে সেই মওকায় বেশ কিছু গুছিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু এ মানুষ সে মানুষ নয়, পরের কথা ভেবে যাদের প্রাণ কষ্ট পায় তাদের দলে সবার আগে হাসান মাস্টার। বটুর চোখটা ঠান্ডা লেগে লাল হয়েছে, অনবরত জল কাটে ; হাসান মাস্টারের নজরে পড়লেই সস্নেহে ডাকবেন, আয় দাবাই দিয়ে দিই। চক্ষু বলে কথা, হেলাফেলা তো করা যায় না !

তিন-চার দিনের জ্বালা-পোড়া দু-চার ফোঁটাতেই নিষ্পত্তি। বটু দুটো টাকা দিতে গেলে 'হায়, হায়' করে দশ হাত পিছিয়ে যাবেন মাস্টার। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলবেন, স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ টাকা নিলে তেজ কমে যাবে। তার চেয়ে এক কাপ কড়া করে চা দে। মাথাটা ভার ভার ঠেকে। তোর চা খেলে ভার মাথাটা হাল্‌কা হয়।

হাসান মাস্টারের পায়ে ছেঁড়া পাম্প শু, পথের ধুলোয় জুতোর আসল রংটা বোঝা যায় না। সেলাই ছিঁড়ে, ফেটে-ফুটে জুতোটা একেবারে শ্রীহীন। অথচ, চাকরি থাকতে মাস্টারসাব কত ফিটফাট ছিলেন। সর্বদা ইস্ত্রি করা ধুতি-পাঞ্জাবি, কানে আতর ভেজা তুলো গোঁজা। ঘাড় উঁচু করে চলতেন, মেঘের চেয়েও গম্ভীর গলায় কথা বলতেন। আজ সেই চড়া গলায় অনেক আপোষ। ক্ষীণ স্বরে বলেন, বটু চা বানা, কড়া লিকার দিবি। কাল রাতভোর নিদ্‌ আসেনি, যা জব্বর ঠাণ্ডা! বটু জানে, মাস্টারসাবের ঘুম হয়নি অন্য কারণে, তার একমাত্র ছেলে জালাল রাত ঘনালে ঘরে থাকে না। রাতের আঁধারে জালালের চোখ জ্বলে, রাত হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতেই জালাল রাতচরা। পুলিশ তাকে বিভিন্ন কারণে খুঁজছে, পাকড়াও করলে শ্রীঘরের ঘানি টানিয়ে ছাড়বে।

হাসান মাস্টার কতদিন, কতরকম ভাবে বুঝিয়েছে জালালকে, সে কথা শোনার ছেলে নয়। মাস্টারের কথাগুলো এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। উল্‌টে দোষারোপ করে বলে, তুমি তো মাস্টার, কিন্তু জিন্দেগিভর মাস্টারি করে কী পেয়েছ তুমি? তোমার জন্য আমার মা-টা মরল—তার মুখ দিয়ে খুন বেরোত। টি-বিটা আজকাল কোনো রোগ নয় অথচ তোমার অবহেলায় সে মারা গেল! তুমি কি তার মুখে কোনোদিন ভালো-মন্দ তুলে দিয়েছ? দাওনি। তোমার মাস্টারির পয়সায় শুধু শিকড়-বাকড় কিনেছ আর হরেক রকমের শিশিতে হোমিওপ্যাথি বাক্স ভরেছ। তোমাকে আমি অন্তত হাড়ে হাড়ে চিনি। তুমি ঘর না দেখে পর দেখেছ। তুমি হলে ঘরজ্বালানি; পর ভোলানি। তোমার মধ্যে যে ফাঁকি ছিল, ধোঁকা ছিল, তা আমি লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব—তাতে আমার জেল-ফাঁসি যা হয় হোক। আমি কোনো কিছুতেই আর ভয় পাই না।

জালালের কথা আপাত সত্য হলেও সে কথায় ভিত্তি করে পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না। চায়ে চুমুক দিয়ে হাসান মাস্টার দাড়িতে হাত বুলিয়ে উদাস চেয়ে থাকেন দূরের দিকে। শুকনো চোখ, মলিন মুখ। খড়খড়ে ঠোঁটে রাত্রি উপবাসের চিহ্ন। বটু বুঝতে পেরে সংকোচ কাটিয়ে বলে, মাস্টারসাব, একটা কেক দিই? সকালে মনে হয় কিছু খাননি?

আত্মপ্রত্যয়ী চোখে তাকিয়ে চুপ করে থাকেন গম্ভীর স্বভাবের মানুষটা।

বটু কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই কেকটা প্লেটে রেখে এগিয়ে দেয় সামনে। এ রকম রোজই দেয়, এটা তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অন্য এক ধারা। যে মানুষের দয়ায় সে দুটো করে খাচ্ছে, তার অসময়ে পাশে না দাঁড়ালে গুনাহ্ হয়। মাস্টারসাব একবেলা তার দোকানে না এলে ফাঁকা-ফাঁকা লাগে বটুর। লোকমুখে সে খবর নেয় নয়তো নিজে গিয়ে দেখে আসে। যে মানুষটা সবাইকে দেখে এখন তাকে দেখার যে কেউ নেই!

আদিবাসী বুড়োটা টমাটো আর কাঁটা বেগুন নিয়ে হাটে এসেছে, তার চোখের কোণে শুকিয়ে হলুদাভ হয়ে আছে পিচুটি। বয়স্ক চোখ দুটো ফোলা-ফোলা, চোখের জমিতে যেন জবা ফুলের পাঁপড়ি ছড়ানো। হাসান মাস্টার কেকে কামড় মেরে তাকিয়ে ছিলেন সেই দিকে। অভিজ্ঞ চোখ এক নজরেই বুঝে ফেলে এ রোগের জটিল ফ্যাকড়া। আদিবাসী ভাষাতেই শুধোন, চোখের এ হাল কবে থেকে, কিছু দাবাই নিয়েছে কিনা। দস্যু চেহারার উদোম বুকের বুড়োটা মাস্টারের কথা শুনে নরম চোখে তাকায়, চোখ রগড়ে পিচুটি সাফ করে বলে, না বাবু, দাবাই-ওবাই কুচ লিইনি, হাসপাতালেও যাইনি। যা কাজের ঝামেলা, সময়ই পাই না।

হাসান মাস্টার তাকে কাছে ডেকে চোখ ফাঁক করে ওষুধ দেন, তারপর ঢোলা পাঞ্জাবির বাঁ পকেট থেকে বের করে আনেন পেনিসিলিনের শিশি, তাতে বেদানার রসের চেয়েও টলটলে ওষুধ। শিশিটা বুড়োটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন, দিনে তিনবার দু-ফোঁটা করে লাগাবে। একদিনে যদি আরাম না পাও হাসপাতালে দেখিও। তবে, আমার বিশ্বাস ভালো হয়ে যাবে।

সেই আদিবাসী বুড়োটা তার ঝাঁকা থেকে সেরখানিক টমাটো আর নরম দেখে চারটে বেগুন বের করে জোর জবরদোস্তি হাসান মাস্টারকে দিয়ে দিল, খুশি হয়ে বলল, আমার ঘরের জিনিস, তুমি লাও মাস্টার—ইগুলান তুমাকে আমি খুশি হয়ে দিলাম।

হাসান মাস্টারের বাধা-নিষেধ বুড়োটার আন্তরিকতার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, টমাটো আর-বেগুনগুলো শেষ পর্যন্ত নিতে হয় তাকে। বটুর কাছে ওগুলো রেখে হাসান মাস্টার বলল, যাই রে, অনেক বেলা হয়ে গেল পাঁচ নাম্বার ওয়ার্ডে একবার যেতে হবে, ওখানে শুনেছি অনেকের তেজ জ্বর।

বটু চুপচাপ শুনছিল। বলার চেয়ে শোনাই তার প্রিয়। হাসান মাস্টার চলে যাচ্ছিলেন, ফিরে এলেন একজন নেশাড়ু মানুষকে মুরগা নিয়ে যেতে দেখে। শীতের মুখেই এ তল্লাটে মুরগা লড়াই জমে যায়। লাটু সিং তাদের সর্দার, এই পাগল নেশায় অষ্টপ্রহর সে মশগুল। মাস্টার তাকে কত বোঝায়, তবু লাটু সিং তার কথা শোনে না। বেশি বোঝালে বলে, লড়াই না থাকলে মানুষ বাঁচবে কী করে মাস্টারসাব? লড়াই আছে বলেই আমি এখনও বেঁচে আছি, না হলে কবে কাত্তির চোটে খেয়ে পাম্প রোডের শ্মশানে

চলে যেতাম। এই জব্বর শীতে লড়াই আমাদের তাতিয়ে রাখে, মাস্টারসাব।

তবু হার মানে না মাস্টারসাব, উচ্ছৃংখল মানুষগুলোকে জড়ো করে ভাষণ দেন সাধ্যমতো। নিষেধ করেন ইউরিয়া মেশানো জীবনহানিকর হাড়িয়া খেতে। সবাই তার কথা শোনে, কিন্তু কথা রাখতে পারে না। না পারুক, তার জন্য মাস্টারসাবের কোনো দুঃখ নেই। তিনি আশায় বুক বাঁধেন, আত্মপ্রত্যয়ী স্বরে বলেন, এ সংসারে কোনো কিছুই বিফলে যায় না! এসব তো একদিনে রোখা যাবে না, এসব হল গিয়ে শ-শ বছরের পুরনো মজ্জাগত রোগ। সারাতে সময় লাগবে।

হাসান মাস্টারকে ফিরে আসতে দেখে বটু উঠে দাঁড়াল পিঁড়ি ছেড়ে। শুধোল, কিছু কি বলবেন?

দুশ্চিন্তায় ছেয়ে ছিল হাসান মাস্টারের মুখ। কাঁটা গেলার মতো কষ্টদায়ক। ঢোক গিলে বললেন, এই হাটবার আসলেই ভয়ে আমি শুকিয়ে যাই। লড়াই-লড়াই করে পাগল হয়ে গেল এখানকার মানুষগুলো। ওদের জন্য আমার কষ্ট হয়! সুস্থ সবল মানুষ মুরগার পায়ে বাজি ধরে যেথায় কামধান্দা, জমিনদারি ভুলে গেছে। এ এক তাজ্জব ব্যাপার। কবে যে এদের চোখ খুলবে, ভুল ভাঙবে তা খোদাই জানে। বটু সমব্যথীর চোখে তাকাল, আজ তাহলে আমার এখানে দুটো খেয়ে নেবেন, আজ আর আপনার রান্না করার দরকার নেই।

পরিচ্ছন্ন হাসিতে ভরে গেল হাসান মাস্টারের ঠোঁট, অভ্যাস মতো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, দরকার হবে না। যেদিন দরকার হবে সেদিন আমিই তোকে বলব। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ভাবলেন তিনি, তারপর অত্যন্ত কুণ্ঠা জড়ানো গলায় বললেন, বটু-রে তোর কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। জালাল যদি তোর কাছে টাকা চায়, তাকে তুই টাকা দিবিনে। আজ মুরগা বাজার, যা দিবি সব বাজি ধরে, জুয়া খেলে খতম করে দেবে।

বিষণ্ণতায় ভরে গেল বটুর মন। জালালের শয়তানি সে হাড়ে হাড়ে জানে। ফি-হাটবার ঝামেলা করে বটুর উপর! মুরগা বাজারে বাজি ধরার জন্য টাকা-পয়সা চায়! প্রথম-প্রথম সৌজন্য দেখিয়ে বটু তাকে টাকা দিত। পরে তা একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে যায়। জালাল বেপরোয়া হয়ে ওঠে দিনকে দিন। সে আর টাকা চাইত না জোর করে ছিনিয়ে নিত ক্যাশ বাক্স থেকে। বটু বাধা দিলে শক্তি প্রয়োগ করত সেই প্রতিপক্ষ। শক্তিতে বটুও কম যায় না। তারও গাট্টা-গোট্টা, তাগড়াই চেহারা। জালালের মতো নেশাখোর মানুষটাকে শিক্ষা দিতে তার বেশি সময় লাগবে না। তবু মুখ বুজে থাকে বটু। জালালের উপর শক্তি প্রয়োগ করতে গেলেই হাত দুটো অসাড় হয়ে যায় ভ্রাতৃত্ববোধে। হাসান মাস্টার দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেলেছিল, আমার দু-টা বেটা। একজন জালাল, অন্যজন হল বটু।

এক ব্যাটা না দেখলে আমার এখন কোনো চিন্তা নেই। এই অযাচিত স্বীকৃতি বটুর মাথা নত করে দেয়, জালালের কু ভাবতে ক'কিয়ে ওঠে ভেতরটা। ছেলেবেলা থেকে বাপের স্নেহ-ভালোবাসা সে পায়নি, মাস্টার সাব যেটুকু দিয়েছে তা কোনো শর্তে হারাতে রাজি নয় সে।

রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাটের চিৎকার ছড়িয়ে পড়ছিল বাতাসে। মুরগা বাজার থেকে উড়ে আসছিল মহুয়া-হাড়িয়ার গন্ধ। গন্ধটা ঝাঁঝালো হলেও এখন গা সওয়া হয়ে গিয়েছে বটুর।

মুখে একটা কাঁচা হাড় নিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে ছুটে এল করাত কলের কুকুরটা। কাঁচা হাড়ের গন্ধে কেঁপে যাচ্ছিল দুনিয়া। বটু নাকটিপে কুকুরটার গায়ে ছিটিয়ে দিল গরম জল। কেঁউ কেঁউ করে হাড় ফেলে ছুটে পালাল কুকুর। দুর্গন্ধটা থেকেই গেল।

বিকেল শেষ না হতেই জালাল এল হাঁপাতে হাঁপাতে। স্টেশনের ধারে এখনও উজ্জ্বল রোদের ছড়াছড়ি। স্টেশনের উল্টো দিকে যে পাহাড়টা আছে সেখানে ঠেকেছে সূর্যের টিকি। ছোট-বড়ো গাছগুলোতে আলোর আভা। আর একটু পরেই জায়গাগুলোতে যমপুরীর আঁধার নামবে। তখন গাছপালা, পাহাড়ের সামনের ক্ষেতটা, ছোটো-ছোটো বস্তির ঘরগুলো নজরের মধ্যে আসবে না। শুধু আলোর ফুটকিগুলো বেঁচে থাকবে জীবিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস ভরা বাতাসে।

বটু চায়ের গেলাসটা জালালের দিকে এগিয়ে দিতেই মুখ ভেংচি কেটে জালাল বলল, আমি চা খেতে আসিনি।

তাহলে ?

দশটা রুপিয়া ছাড়। বহত দরকার।

রুপিয়া তো নেই।

ন্যাকড়াবাজি রাখ। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল ব্যাকাব—বুঝলি ?

জোর জবরদস্তি ?

হ্যাঁ-হ্যাঁ। জালাল লাল চোখ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল বটুর উপর। ওর গলায় বাঁধা লাল মাফলার। মুখ থেকে ভকভকিয়ে গন্ধ আসছিল মদের। টেনে টেনে বলল, আমার বাপের শেয়ার আছে দোকানে। আজ তোকে দশ রুপিয়া দিতেই হবে। নাহলে বেইজ্জত করে ছেড়ে দেব। কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না।

বটুর রক্ত ফোটে উত্তেজনায়। মেহনতের পয়সা হাতে তুলে দিতে গেলে গায়ে লাগে। তাছাড়া, দু-একদিন পরপর এমন উৎপাত—একি মামার বাড়ির আব্দার ? নিজেকে কী ভাবে জালাল ? শের ! মস্তান ? রেল কলোনিতে কত মস্তান হাওয়াই বাজির মতো জ্বলে উঠে হারিয়ে গেল। জালালের কি

সময় ঘনিয়ে এসেছে তাহলে? বটু নম্র গলায় বোঝাবার চেষ্টা করল জালালকে। জালাল আরও বেপরোয়া। বলে, হারামখোর, রুপিয়া দিবিনে? তুই দিবি, তোর বাপও দেবে। শালা, আগাছা—তোকে আমি উপড়ে ফেলব। কাঁচের বয়ামটা দু-হাতে শূন্যে তুলে আছাড় মারল জালাল। বটু স্তম্ভিত চোখে তাকায়। গুমটি ঘরের সামনে ছড়িয়ে গিয়েছে কাঁচের টুকরো। এতদিনের পয়মন্ত বয়ামটা ভেঙে চুরচুর। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল বটুর। মাস্টার সাব বলেছেন, জালাল তার ভাই। এই কি তাহলে ভাইয়ের নমুনা?

চেক লুঙিতে গিঁট দিয়ে ক্যাশ-বাক্সের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই জালালের জামার পেছনটা খিঁচে টেনে ধ'রে বটু। বাধা পেয়ে জালাল হুংকরায়, ছাড়, ছাড় বটু। আমার গুস্সা চড়িয়ে দিস না। কোন্দিন তোর চা দোকানে আমি আগুন ধরিয়ে দেব।

তবু হাতের মুঠো আলগা করে না বটু। জালাল বেগতিক দেখে পা দিয়ে লাথি মারে বিস্কুটের টিনে। পায়ের চাপে ঢাকনা খুলে রাস্তায় ছড়িয়ে যায় বিস্কুট। ঝনঝন করে খসে পড়ে সাজিয়ে রাখা শিশি-বয়াম। তোলা আঁচটা ঠিকরে পড়তেই সম্বিত ফেরে বটুর। এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা তার পায়ের উপর পড়েছে। জালালের জামার পেছনটা ছেড়ে দিয়ে যন্ত্রণায় পিছিয়ে গেল সে। জালাল এই মওকাটিও নষ্ট করে না। নিমেষে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বটুর বুকের উপর। চোখের নিমেষে এলোপাথাড়ি ঘুষিতে ছেঁচে দেয় বটুর নির্বিরোধী ঠোঁট। শুধু ঠোঁট নয়, কপালের কাছটাও সুপুরি হয়ে ফুলে যায় জালালের অষ্টধাতুর আংটিতে। কপালটা ছেচড়ে গিয়ে রক্ত টুপায় মুখে। মার খেয়ে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে বটু। আফশোসহীন, প্রতিবাদহীন চোখ-মুখ। শুধু বুকের ভেতরটা পুড়ে যায়। ভাইয়ের হাতে মার খেলে কি সম্মান যায়? মাস্টার-সাব তাকে ছেলে বলে। তাহলে জালাল তাকে দশ-ঘা মারলে সে কি এক ঘা-ও মারতে পারত না? খুব পারত। কিন্তু এই সহজ কাজটা তার দ্বারা আর হয়ে ওঠেনি। ক্রোধী, পেশিবহুল হাতটা তুলতে গিয়ে কচুডাঁটির চেয়েও নরম হয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

সন্ধ্যেবেলায় হাসান মাস্টার আর চায়ের দোকানে এলেন না, হয়তো কোনো গাঁ থেকে রোগী দেখে ফিরতে দেরি হয়েছে। তিনি যখন এলেন তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। চাঁদহীন আকাশটা এলোকেশীর ছিরিছাঁদহীন নিকষ কালো চুল। সাদা পুঁতির উজ্জ্বলতায় ফুটে আছে কয়েকটা গোটা-গোটা তারা। রেল কলোনীর বিজলি থাম্বায় আলো নেই। বাদাম গাছের কাছের ঝোপটায় ঝিঁঝি ডাকছে সন্তানহারা মায়ের গলায়। বটুর চায়ের দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন হাসান মাস্টার। বোবা

গলা। কুণ্ঠা-ঘেন্নায় শরীর কাঁপছে। বস্তিতে ঢোকার মুখে কানাঘুষো আলোচনা কানে ঢুকেছে তাঁর। সেই থেকে মাথা নোয়ানো, অন্ধকারেও সেই মাথা তুলতে পারছেন না তিনি। জালালের আস্পর্ধার যেন শেষ নেই। তার মস্তানিতে বস্তি-কলোনির সবাই তটস্থ। এর একটা প্রতিকার করা দরকার। বিষ-গাছকে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। হাসান মাস্টার ঠোঁট কামড়ে ভাবলেন। কপালের ভাঁজগুলো প্রকট হল অন্ধকারে। কোন্ মুখ নিয়ে এখন তিনি বটুর কাছে যাবেন? গুন্ডার বাপের মাথা কখনও উঁচু থাকে না। তাঁর মান-সম্মান এখন চীনেমাটির বাটির মতো ঠুনকো হয়ে পড়েছে।

ধীর পায়ে হাসান মাস্টার যখন বটুর চা-দোকানের চৌকাঠের কাছে দাঁড়ালেন তখনও তার হেঁট মাথা, চোখের দু-কোণ ভেজা। বুকটায় নখ ঢুকিয়ে দেওয়ার যন্ত্রণা।

ঘুম আসছিল না বটুর। চোটটা মারাত্মক লেগেছে, বাঁ পায়ের ফোসকাটাও জব্বর। শত পীড়াপীড়িতে হাসপাতাল যায়নি সে। মেসের ছেলেরা তুলোয় ডেটল ঘষে দিয়েছে কপাল আর ঠোঁটে। সেই পাতলা তুলোর রোঁয়া এখনও লেপটে আছে কপালে। কনকনে শীতে যন্ত্রণাটা হু-হু করে বাড়ছিল। যন্ত্রণার মধ্যে ঘুম নিরুদ্দেশ। শুধু ভাবনা ডুব সাঁতার কাটছিল মনে। তাতেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল বটু। ঘুম না এলে প্রতিদিন সে যা করে আজও তাই করল। চৌপায়া থেকে নেমে গিয়ে টিনের সুটকেশটা পেড়ে আনল তাকের ওপর থেকে। ছড়ছড় করে পাতলা ডানার শব্দ তুলে উড়ে পালাল কতকগুলো আরশোলা। খুব যত্ন নিয়ে বাক্সের তালাটা খুলল বটু। তারপর জিনিসপত্র হাতড়ে পুরনো খবরের কাগজের ভাঁজ থেকে বের করে আনল একটা পাসপোর্ট মাপের ছবি। ছবিটা পুরনো, ভালো বোঝা যায় না। আবছা একটা ধারণা গড়ে শুধু। সময়ে সব কিছু যে লীন হয় ছবিটা তার প্রমাণ। ডিবরির আলোটা উসকে দিয়ে ছবির উপর গভীর আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল বটু। সুখিয়ার মুখটাকে সে ঠিকঠাক মেলাতে পারল না। রামনবমীর মেলায় তোলা ফটোটা এখন শুধুমাত্র স্মৃতিচিহ্ন। তার উপর টপটপ করে ঝরে পড়ল বটুর চোখের জল। সে সুখিয়ার মুখোমুখি বসে আছে—এমন প্রত্যয় মাথা তার চাইনি। সুখিয়াকে কী যেন বোঝাচ্ছে বটু, তার ছ্যাঁচা ঠোঁট নড়ছে কথোপকথনের ভঙ্গিতে।

তখনই টিনের দরজায় খুট্ খুট্।

ভয় পেয়ে বটু ফটোটা তাড়াহুড়ো করে লুকিয়ে ফেলল বাক্সে। চোখ মুছে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ডিবরি হাতে এগিয়ে গেল সামনে।

হাসান মাস্টার শীতে কাঁপতে কাঁপতে ডাকলেন, বটু, বটু—কপাট খোল বেটা। বাইরে জব্বর হিম পড়ছে, শীতে আমি শেষ হয়ে গেলাম।

চেনা গলায় ভরসা পেয়ে দরজা খুলে দিল বটু। ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন হাসান মাস্টার। বটুর ক্ষতচিহ্নগুলোর দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট গলায় যা শুধোলেন, কাফেরটা কোথায়? তাকে আমি খুন করব। অমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই যে ঢের ভালো।

বটু কোনো উত্তর করল না। হাসান মাস্টার উত্তেজিত হয়ে বললেন, জামা-প্যান্ট পরে নে, তোকে আমার সাথে এক্ষুনি যেতে হবে।

কোথায় যাব মাস্টারসাব?

থানায়।

থানায়! কেন?

তোকে দিয়ে জালালের বিরুদ্ধে আমি ডাইরি করাব। শয়তানের শাস্তি না হলে সে এই সমাজকে ডাঁটিয়ে বেড়ায়।

আমি থানায় যেতে চাই না মাস্টারসাব।

এভাবে তুই আর কত পড়ে মরে খাবি? হাসান মাস্টারের ছলছলে চোখে জিজ্ঞাসা, হ্যাঁ রে বোকা, তোর তাগত নেই, মারতে পারলি না জানোয়ারটাকে? তুই একটা ঘুষি মারলে সে ঘুষি সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না তার। দারু-হাড়িয়া খেয়ে ওর শুধু হাড় কটাই সম্বল। তুই যদি ওর হাড় কটা ভেঙে দিতিস—তাহলে সবচাইতে খুশি হতাম আমি।

বটুর অভিমানী চোখ মাটির দিকে নামান। এই পরোপকারী মানুষটার মন সে প্রথম দর্শনেই চিনেছে। শত দুঃখে না পড়লে কেউ কি নিজের ছেলের বিরুদ্ধে অমন কঠোর কথা বলে।

বটু নিরপেক্ষ গলায় বলল, জালাল আমার ভাই। মাস্টারসাব—আপনি না বলেছিলেন, আপনার দু-জন বেটা! তাই ভাই হয়ে ভাইয়ের গায়ে কী করে হাত তুলি? এবার সশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়লেন হাসান মাস্টার। বটুকে বুকে টেনে নিয়ে গায়ে মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, খুব লেগেছে না? দাঁড়া, আমি তোকে ওষুধ দিয়ে যাই। আর কিছু না হোক বেদনাটা তো কমবে।

ওই রাতে মাস্টার তাঁর হোমিওপ্যাথি বাক্স খুলে পুরিয়া বানালেন যত্নসহকারে। পুরিয়াগুলো বটুকে দিয়ে বললেন, এখন একটা খেয়ে নে। কাল অত ভোরে আর উঠবি না। মনে রাখবি—দোকানের চেয়ে জীবন বড়ো। আর, জীবনের চেয়ে ইমান বড়ো, বিশ্বাস বড়ো। কথাগুলো বলেই হাসান মাস্টার হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। মিশমিশে আঁধারেও পথ চলতে তাঁর কোনো কষ্ট হয় না।



তিন

রেল ব্রিজটার কাছে চালের বস্তা নামাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল বনা। তার ভালো নাম বনমালী হাজরা। পুলিশ এসে ঘা কতক বসিয়ে দিয়ে বলল, শালা হারামখোর, রেলের জায়গায় থাকিস আর রেল থামিয়ে চাল নামাচ্ছিস—দাঁড়া দেখাচ্ছি তোর মজা। গুহ্যদ্বারে রুল ঢুকিয়ে তোর নাড়ি চটকে ছেড়ে দেব!

মার খেয়ে বনা হাউ হাউ করে কাঁদছিল, রেল লাইনের এক পাশে কাতিয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছিল প্রাগৈতিহাসিক কোনো জন্তুর মতো। তার দু-চোখ ভর্তি জল বসন্ত খাবলানো চিমড়ে গালের উপর আম কষের মতো গাঢ় চিহ্ন রেখে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নেমে শেষে থ্যাবড়া চিবুকে এসে থেমে গেল। বড়ো আজব আর বিচিত্র দেখাচ্ছিল তাকে। কান্নাটা যে পেশাদারি কান্না এটা বুঝে নিতে পুলিশ ইন্সপেক্টরের আর বাকি থাকল না। ব্রিজের উপর থেমে গিয়েছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন, বিরক্ত যাত্রীরা উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখছিল বনার আজব কাণ্ডকারখানা। সে প্রথমে তার দড়ির মতো চেহারাটাকে হেলে সাপের মতো পাক মোড়া দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে উচ্চস্বরে কাঁদল। টুপি মাথায় পুলিশটা আর একটা মোক্ষম কাঁচা খিস্তি দিয়ে বলল, পাঁয়তাড়া ভাঁজলে দেব শালাকে একেবারে নদীর ঢালুতে গড়িয়ে। বল্, আর কে-কে আছে তোর সঙ্গে? না হলে চুল ছিঁড়ে তোর হাতে দেব। মারের চোটে রক্ত আমাশা হাগিয়ে ছেড়ে দেব।

চুল ছিঁড়ে হাতে দিতে গেলে বনাকে ছুঁতে হয়, কিন্তু তার যা চেহারা—তাতে গায়ে হাত ছোঁয়াতেও ঘেন্না হয় পুলিশের। বনার সারা গায়ে কুষ্ট ফুটেছে, অসাড় ঘেয়ো চামড়া অশ্বত্থ গাছের বুড়ো ছালের চেয়েও খসখসে, কর্কশ। মাঝে মাঝে সেই চামড়া ফেটে সরু রক্তের ধারা। কোথাও চাড় বেঁধে আছে রক্ত। মাছি ভনভনিয়ে উড়ছে রক্তের লোভে, ঘেয়ো মাংসের স্বাদ পেতে। হাতে, পায়ের আঙুলগুলোয় নখ বলতে কিছু নেই, চকের

মতো ক্ষয়ে ক্ষয়ে এক গিঁটে এসে ঠেকেছে। সেখানে নোংরা, শত ছিন্ন কালি জড়ানো। কালিগুলো ভিজে জড়িয়ে আছে পুঁজ সাদা রক্তে। বড়ো করে শ্বাস নিলে মাংস পচার গন্ধে ঝাঁঝিয়ে ওঠে নাক, স্নায়ু খুব শক্ত না হলে বমির বেগ আটকে রাখা অসম্ভব! ধোপ-দুরস্ত ছোকরা পুলিশ ইন্সপেক্টর বাঙালি, তিনি নাকে রুমাল ঠুসে ঘেন্না চোখ করে তাকালেন, তারপর বনা যেখানে শুয়ে ছিল তার হাত তিনেক দূরে থুতু ফেলে সেই নাক চেপে ধরা রুমালে ভেজা মুখটা মুছে কঠিন কঠোর চোখে তাকালেন। অনুগত পুলিশটি পাশে সরে এসে দক্ষতা প্রদর্শনের ভঙ্গিতে বলল, স্যার, এই বনমালী বেটা দেখতে ভেজা বেড়ালের মতো হলে কী হবে এর পেটে-পেটে কুবুদ্ধি জড়ানো। মানুষটা মোটেও সুবিধের নয়। এ শালা কুষ্ঠ রোগীর বাচ্চা, খেতে পায় না-পরতে পায় না—তবু রাম শেঠের সাথে কারবার করে। এ একবার সাপের গালে চুমু খায়, একবার ব্যাঙের মুখে চুমু খায়। এর ক্যারেক্টার বোঝে কোন্ শালায়। এর একটা ধিঙ্গি মেয়ে আছে, সে মাগি তো পিওর প্রস্। চাপকে নুন ভরে দিন তাহলে গড় গড় করে ধারাপাতের মতো সব বলে যাবে। ওদের নাড়ি-নক্ষত্র আমি সব জানি। এই সিকেপি ডিভিশনে আমার দশ বছর হয়ে গেল। স্লা, স্মাগলার, গায়ে কুষ্ঠ নিয়ে মানুষের সিমপ্যাথি আদায় করার চেষ্টা করে। যা না স্লা, ভিখ মাঙ. এখানে কি ভিখ দেওয়া লোকের অভাব আছে, তা না খালি ছুঁকছুকানি-হাঁড়ি ফাটানোর ধান্দা।

বনা শুয়ে শুয়ে শুনছিল ক্রুদ্ধ পুলিশের গর্জন, আর ভয়ে ঘুঘরো পোকার মতো মুখ লুকাতে চাইছিল খোলোয়। বনা কান্না থামিয়ে ছেঁচড়ে-মেচড়ে এগিয়ে গেল পুলিশ ইন্সপেক্টরের দিকে তারপর রক্ত পুঁজ উগরানো দু-হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল সেই স্যুটেড বুটেড পা দুটো। বনা ঘনিয়ে অবিকল প্রেতাত্মার মতো কেঁদে-কঁকিয়ে বলল, বাবু তোমার দুটা গোড়তল ধরি মোকে ছেড়ে দাও। যা ভুল করচি, এই কান-নাক মুলচি আর করবানি। মোর এক বাপের জন্ম। খাইতে পাইনি, সারাদিন ঘরা মাথায় ফ্যা ফ্যা ঘুরলে মোকে কেউ ভিখ্ দেয়নি, সব বাবুরা মোকে কোকোরের মতো দূর দূর করি ভাগিই দে। মুই কুন্ঠি যাবা, বাবু? হা, মোর এই পেট কথা শুনেনি, টাইমে টাইমে ভোখ পায়, কোঁকায়। কেঁচুয়া জল উঠি আসে মুখে। তখন বাবু মুই আর ভোখ তরাসে থাকতে পারিনি। রাম শেঠ মোকে কয়—হ্যাঁরে বনা, কাজ করবু। মুই রাজি হই যাই। শেঠ মোকে কয়, তুই যা। ঝারসুগুদায় চাউল সস্তা। সিখান থেকে তুই চাউল নি আয়। পয়সা-কড়ি সব আমার। তুই খালি টেরেনের সিটের তলায় চাউল বস্তা ঢুকিই কি ভিখ মাঙ্গিঁ-মাঙ্গিঁ আসবু। মুই তোকে ফি খেপ পাঁচ টংকা দিবা। তা বাবু, মুই গরিব মানুষ! সারাদিন এ দোর-সে দোর ভিখ মাঙলে দু

টংকা হয়নি। চাউল আনলে যদি পাঁচ টংকা হয়—এই লভে আমি যাই। গায়ে কুঠ ফুটবে, সে-ও চখা চোরা অভিশাপ। বাঁচতে তো হিবে? তাই বাবু ভোর-ভোর যাই. বিকেলের টেরেনে ফিরে আসি। রেল পুলিয়ার কাচে চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে দেয় রাম শেঠের লোক। তখন আমি বাবু শুধু চালের বস্তাটা গেটের কাছে আনি কী নীচে ঠেলে দিই। যে বাবু চেন টেনে টেরেন থামায়, সে বাবু মোকে পাঁচ টংকা দিয়ে গাড়ি থিকে.নামি যায়। যা ঘটনা তা কইলি, এবার বাবু মোকে মারতে হিলে মারো, কাটতে হিলে কাটো, জেল দিতে হিলে জেল দাও—মুই চালি যাবা—এ তিতা জীবন মোর আর ভালো লাগেনি।

বনা হাঁপিয়ে উঠে হাঁইফাঁস করে দম নিল, তার মুখের দু-পাশে গুজরা, চোখের কোণে ভাঙা ভাতের টুকরোর মতো পিচুটি, টায়ারের দাঁড় বাঁধা চপ্পলটা ঘামে হড়কে গিয়েছে পা থেকে—তবু সে কাঁপতে কাঁপতে শেষ বারের মতো বলল, বাবু গো, হাতজোড় করি মিনতি করি. মোকে আপনারা ছাড়ি দেন, যা করচি করচি আর কুনোদিন করবানি, বাপের দিব্যি দিলাম।

তার কাকুতি-মিনতি বাতাসে ভেসে বিনজয় নদী পেরিয়ে লাউড়িয়া টিপির দিকে চলে যায়। পুলিশ ইন্সপেক্টর ঝুঁকে পড়ে ঘেমো জামার কলার ধরে খিঁচে টেনে তুলল তাকে, তারপর সজোরে একটা থাপ্পড় কষিয়ে বলল, গুড়বয়ের মতো গাড়িতে উঠে পড়, না হলে এক লাথিতে তোর শিরদাঁড়া চুর-চুর করে দেব। কথা শেষ না করেই তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল গেটের কাছে, টুপি পরা হ্যাঁচকা টানে তুলে আনল কমপার্টমেণ্টে। ততক্ষণে গাড়ি চলতে শুরু করেছে, যান্ত্রিক শব্দে হারিয়ে যাচ্ছে বনার চিৎকার, কান্না, আর্তনাদ এবং যন্ত্রণা সম্পৃক্ত গোঙানি। বটুর চা দোকানে পাঁউরুটি কিনতে এসে প্রথমে খবরটা শোনে শুকু! শুনেই মাথাটা তার কেমন হয়ে যায়, দু-চোখ দিয়ে গল গলিয়ে বেরিয়ে আসে সর্ষেফুল আলো। বটুর চা দোকানের সামনে মাথায় হাত দিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল সে, কাপড়-চোপড়ের ঠিক নেই. গা-হাত-পা, ভরন্ত ডাগর বুকটা হেলঞ্চা ডগায় বাতাস লাগার মতো কাঁপছে। বটু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, চুপ কর্ শুকু, বিপদের সময় অত ভেন্‌গে পড়তে নেই। মাথা ঠিক রাখ। না হলে এত বড়ো বিপদ তুই সামাল দিবি কী ভাবে?

বটুর কথা শুনে শুকু বুকের আঁচল ঠিক করে হাউ হাউ করে কাঁদল, আমি এখন কার কাছে যাবো গো বটুদা, আমার যে কেউ নেই।

বাস্তবিক শুকু এই পোড়ার সংসারে একা, তার মা মরেছে ছোটোবেলায় সর্বাঙ্গে যৌন ঘা নিয়ে। বনা তাকে বাঁচাতে পারেনি, সে কথা এখনও বনা মদে চুর হয়ে থাকলে মেয়েকে খনখনে গলায় শোনায়। শুকু শোনে, শুনে শুনে হতভাগি মায়ের উপর তার একটা ধারণা জন্মেছে. সে তার মাকে ঘৃণা

করে না—উলটে শিশম গাছটার আড়ালে গিয়ে বুক ভাসিয়ে কাঁদে। মা বেঁচে থাকলে তাকে কি পথে পথে ঘুরতে হত? বাপটা তার কোনো খেয়ালই রাখে না, খেয়াল রাখার তার সামর্থ্য কোথায়? নিজেরই বলে নড়তে-চড়তে আঠারো মাসে এক বছর। ঘা শরীর নিয়ে সেই মানুষটা সর্বদা তটস্থ, তাকে আর জ্বালাতন করতে চায় না শকু! নিজের পোড়াটে কপাল নিয়ে শকু দিব্যি মানিয়ে নিয়েছিল এই অভিশপ্ত জীবনকে, এর মাঝে এই আচমকা বিপদ তার শ্বাসরোধ করে দেয়, সে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে আমার অফিসে। তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে, কমা আলোয় শীত তার আধিপত্য বিস্তারে মগ্ন। ফাইলে গিঁট দিয়ে মেসে ফেরার মতলব আঁটছিলাম—এমন সময় শকু এসে আমার টেবিলের সামনে কান্নায় ভুকরে উঠল, বাপরে পুলিশে ধরে লে গেচে বাবু, তুমি এট্টু চলো, নাহলে তারে আচ খতম করে দেবে গো—ও ও-ও। ও বাবু, তুমার দুটা গোড়তল ধরি, তুমি একবার চলো।

গুডস শেডের সামনে গজিয়ে ওঠা ঝুপড়িগুলোর একটাতে শকুরা থাকে। ওর সঙ্গে আলাপের মুহূর্তটি আমি কোনো দিন ভুলব না। তখন মেস চালু হয়নি, হোটেল থেকে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসছিলাম রেল লাইন ধরে। চাপ চাপ, নিকষ কালো অন্ধকার। দু-পাশের পুটুস ঝোপে ঝিঁঝিঁ ডাকছিল এক নাগাড়ে। ফাঁকা রেলপথ, রোজ যাই আমি—তাই ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই বুকে। লেভেল ক্রশিং ছাড়িয়ে কিছুটা হেঁটে এসেই ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দে থমকে দাঁড়াতে হল আমাকে। পা টিপে টিপে এগিয়ে দেখি শকুর বুকের উপর কাম-উন্মাদনায় চেপে বসেছে একজন, অন্যজন পাশে দাঁড়িয়ে পথ-ঘাট দেখছে। সেই পাতাল পুরীর অন্ধকারে আমি ছেলে দুটোকে চিনতে পারিনি কিন্তু তাদের একটা কথা আমার কানে গেঁথে আছে।

এ মাগি হিজরে রে! বলেই ঝটপট প্যান্টটা পরে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা, দ্বিতীয় ছেলেটি হয়তো সুযোগ নিত কিন্তু আমার হঠাৎ উপস্থিতি তাকে বেশ ঘাবড়ে দেয়। অন্ধকারে চটি ফেলে, খালি পায়ে রেল লাইন পেরিয়ে উলটো দিকের বস্তিটায় হারিয়ে গেল তারা। শকু শাড়িটা বুকে জড়িয়ে অন্ধকারে কাঁদছিল, তার কান্না সুতীক্ষ্ম নখ হয়ে ফালা ফালা করে দিল আমার বুক, সেদিনই আমি জানতে পারি—ভালো নাম শকুন্তলা—ওরা ভাণ্ডামুণ্ডা থেকে পেটের দায়ে উঠে এসেছে মাল গুদামের সম্মুখের বস্তিটায়। ওর বাবা একজন কুষ্ঠ রোগী—যে ভিক্ষে ছাড়া আর কোনো কিছুই করতে পারে না। শকুকে বস্তি অব্দি পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরে এসেছিলাম বাসায়, সে রাতে আমার ঘুম হল না, ভার দু-চোখের পাতায় অস্থির একটা কাঁপুনি—শকুর অশ্রুসিক্ত মুখটা আমাকে কিছুতেই ঘুমোতে

দিল না। যারা ওকে হিজড়ে বলে পালিয়ে গেল তাদের মতো অপদার্থ যুবক এ অঞ্চলে আমার আর নজরে পড়েনি।

বৃহন্নলা শব্দটি আমাদের দেশে অবজ্ঞা আর অবহেলা নিয়ে উচ্চারিত হয়। কিন্তু শুকুকে সূর্যালোকে পর্যবেক্ষণ করে ওই শব্দটিকে মনে মনে উচ্চারণ করতে ভয় পেয়েছি আমি। ক্যালেণ্ডারে হরিণ শাবক পরিবেষ্টিত পূর্ণ যৌবনা যে শকুন্তলাকে আমি দু-চোখ ভরে দেখেছি তার সঙ্গে ঝোপড় পট্টি নিবাসী বনমালী হাজরার মেয়ে শুকুর কোনো পার্থক্য নেই। এক মাথা চুল তাতে যদিও তেলের স্পর্শ নেই তবু সেই চুলের রেশমি ঔজ্জ্বল্য হতদারিদ্র্যে ম্লান নয়, বরং কেশবতীর টিকোলো নাক, জোড়া ভুরুর নীচে ডাগর ভাসা চোখ দুটিকে খাপ খোলা তরবারির মতো সপ্রতিভ করে তোলে। ওর শারীরিক শোভা প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। তাহলে কেন সেই চরমক্ষণে ছেলেটি অস্থির হয়ে পালাল ?

শুকুকে নিয়ে স্টেশনে পেঁছোতেই সন্ধে নেমে এল, গায়ের চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে আমি শুকুর দিকে ঘনিষ্ট চোখে তাকালাম, ওর গায়ে পাতলা কম দামি একটা চাদর, কোনো মতে বুকের উপর ফেলে শীত তাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সে। বনা হাজত ঘরে কুঁকড়ে-মুকড়ে বসে, শুকুকে দেখতে পেয়ে তার ধড়ে যেন প্রাণ এল। ডুকরে কেঁদে উঠতে গিয়ে মশার কামড়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। শুকু নীরব চোখে তাকাল। বনা ঘা শরীর নিয়ে এগিয়ে এসে গারদ ধরে দাঁড়াল। তার মুখেও কথা নেই কেবলই বোবা দৃষ্টি বিনিময়।

পুলিশ ইন্সপেক্টর ঘোষ আমার বিশেষ বন্ধু রোজ সন্ধ্যায় তাসের আসরে আমাদের হাতাহাতি হতে কেবল বাকি থাকে, একই সিগারেট দু-জনে শেয়ার করে খাই, তখন পদমর্যাদার কথা আমাদের কারোরই খেয়াল থাকে না, বন্ধুত্বটা সোনার আংটির চেয়েও চকচক করে সর্বদা। আমাকে শুকুর সাথে আস্তে দেখে ঘোষবাবু নাক কুঁচকে কেমন পুলিশি চালে তাকালেন, কী ব্যাপার, আজ কোন্ দিকে সূর্য অস্ত গেল আবার ?

আমি ঘোষবাবুর খোঁচাটা গায়ে মাখি না, হাসতে হাসতে বললাম, আপনার কাছে আসতে হল বিশেষ প্রয়োজনে। শুকুর বাবাকে হাজতে রাখার কোনো মানে হয় না ! সে বেচারি নির্দোষ।

নির্দোষ, তাকে আমি রেড হ্যাণ্ড ধরেছি। একটা ফিলটার টিপড সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ঘোষবাবু কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, আপনি জানেন না মাখনবাবু, ওটি একটি চিজ। ছেড়ে দিন, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঠিক চলে যাবে রাম শেঠের গাদিতে। কেন রাম শেঠ কি ওর বাপ হয়—যার জন্য লাইফ রিকস্ নিয়ে চালের বস্তা বয়ে আনে সেই বিলাসপুর

ঝাড়সুগুদা থেকে ? ওকে আমি চাইবাসা কোর্টে চালান দেব। চাপকে পিছনের ছাল না তুলে দিলে ওর শিক্ষা হবে না। যেমন ঘোড়া তাকে তেমন চাবুক দিয়ে বশ মানাতে হয়, না হলে সে আবার আপনাকে পিছনের পায়ের লাথ ঝেড়ে উলটে ফেলে দেবে—তখন ?

আমি চুপ করে থাকতে ঘোষবাবু আমাকে বললেন, আপনি যখন ওই ছোটোলোকটার জন্য সুপারিশ করছেন তখন আমার আর কিছু বলার নেই। যান, নিয়ে যান তবে ভালোভাবে শিখিয়ে দেবেন আর যেন ও পথে না যায়। আবার যদি ধরা পড়ে সেদিন কিন্তু ও কোনো ক্ষমা পাবে না।

হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে বনমালী স্টেশনের সামনে অশ্বত্থ গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে কাঁদল। তখন ওর মুখের উপর ভয় ভাবটা ছড়ানো। আমি দেখলাম—ওর এক পায়ে টায়ারের চটি পাটের দড়িতে বাঁধা, অন্য পা-টা উদোম। কানি ভিজিয়ে রক্ত চোঁয়াচ্ছিল হরদম। সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ-ই নেই। ছাড়া পাওয়ার আনন্দে খাবি খাওয়া বিলজলের মাছের মতো সে খালি হাঁকুপাঁকু দম নিচ্ছিল। কিছুটা হেঁটে এসে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে বলল, আপনি না থাকলে মই আচ হাজত ঘরে পচি মরতি, বাবু। ভগবান আপনাকে না পাঠাইলে কী যে হিতা ! বনার গায়ে চাদর নেই, ছেঁড়া-খুঁড়া একটা বহু পুরোনো রঙজ্বলা সোয়েটার। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। শুকু তার গায়ের চাদরটা খুলে দিয়ে বলল, ইটা তুমি গায়ে জড়িয়ে লাও। জার টুকে কম লাগবে।

ফেরার পথে অনেক কথা হল, সব কথাই শুকুকে ঘিরে। বনমালী খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছিল, কথা বলার সময় আশ্চর্য কায়দায় থমকে দাঁড়িয়ে মাজা কুঁজো করে সে বলছিল, মায়াঝিটাকে লিয়ে মোটে শান্তি নেই বাবু। বিয়ে থাওয়া দিলাম কিন্তু সোয়ামির ঘর ভাগ্যে সইল না। কী করব, সবই অদৃষ্ট !

আমি চুপ করে বনার কথা শুনছিলাম, শুকুকে নিয়ে তার যে চিন্তার শেষ নেই এটা বুঝে নিতে আমার কোনো অসুবিধা হল না। বনা কাচুমাচু মুখে বলল, সবার কপালে সুখ সয় না বাবু। মই কী করবা ? মুই তো চেষ্টার কোনো কসুর করিনি। ভালা টকা দেখি বে দিলি। কিন্তু মাস পুরলানি, সে মায়াঝিটাকে ঘাড় ধাক্কা দিই কী ভাগিই দিলা। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠছিল শুকুর মুখ, সে থাকতে না পেরে বলল, তুমি চুপ যাও দিনি, ওসব পুরনো কথা আমার আর শুনতে ভালা লাগেনি। মায়ামানুষের ভাগ্য বিধাতা আঙরা দিয়ে লেখে। টুকে ডলা মারলে উঠি যায়। আমি কী করবো ? আমার ভাগ্যটাই পুকাড়ে ! মার ভাগ্য যাবে কুথায়, সে তো মরলা, তার ভাগ্যটা আমাকে দিয়ে গেল। শুকুর মতো মন্দ ভাগ্যের মেয়ে আমি হয়তো খুব কমই দেখেছি নাহলে বিয়ের এক মাস

পরে রবার্ট তাকে কেন ফিরিয়ে দেবে পথের কুকুরের মতো ? রবার্টকে আমি যে ভালো মতন চিনি না তা নয়, সে আউট হাউসের ছেলে তার জন্মের পাঁচ বছর আগে তার বাবা মারা যায়। তার মা ছিল দেহাতি রূপসী এক মহিলা। যে সাহেবের ঘরে সে রাঁধা-বাড়া করত, সেই যুবক সাহেবের দয়ায় রবার্টের জন্ম হয়। রবার্টের মা অসুখে-বিসুখে মরেনি, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এক বর্ষণ মুখর সকালে রবার্টের মাকে পথচারীরা দেখতে পায় বড়দা পুলের নীচে তার শরীরের সমস্ত রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে মিশে যাচ্ছে সঞ্জয় নদীর জলে, বুকে- মুখে এমনকী যৌনাঙ্গে ধারাল চাকুর দাগ। সেই অনাথ রবার্ট এখন শক্ত সমর্থ জোয়ান, ভাড়া রিক্শা চালায়—মদ খায়—বেশ্যা বাড়ি যায়, কখনও মন হলে ঝুপড়িতে ফেরে নাহলে স্টেশনের চাতালে মেয়েছেলে দেখে রাত কাটিয়ে দেয়! তার বড়ো ক্ষুধা, সেই ক্ষুধা মেটাতে শকুকে সে বিয়ে করল, কিন্তু বিয়ের পরেও অতৃপ্ত রয়ে গেল তার কামনা-বাসনা। শকু পূর্ণাঙ্গ নারী হলেও তার কোনো সহবাস ক্ষমতা নেই, শকু পূর্ণ যৌবনা নারী হয়েও এক ধরনের বৃহন্নলা। এই অভিশাপ মাথায় নিয়ে যুবতী ধরমহীনতায় শকু অঝোর ধারায় কাঁদে, রবার্টকে সে সুখ দিতে পারেনি। সেটা তার শারীরিক অক্ষমতা, কিন্তু ওই দুঃখী সর্বস্বান্ত মানুষটাকে সে জানপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। ভালোবাসা কি তাহলে শরীর পেঁচিয়ে বেড়ে ওঠা শিমলতা, মন কি শুখা গাছের ডাল—যেখনে ফুল-ফল এমনকী নতুন পাতাও আসে না!

বনা হাঁটতে হাঁটতে বলল, বাবু, গুটে নিবেদন আচে? ভরসা দিলে কই।

বলো, কী বলতে চাও।—আমি অবাক চোখে তাকালাম।

বনা ঢোক গিলে ফিসফিসিয়ে বলল, মায়াঝিটাকে গুটেবার কুলকাতায় দেখিইতে চাই। তারও বড়ো ইচ্ছা—। তারপর সে আমার হাতটা চেপে ধরল, কাঁপা হাতে, বিড়বিড়িয়ে বলল—কাঁচা বয়স, আগুন বয়স। মায়াঝিটাকে লিয়ে আমার যে সুখ নেই বাবু। রাতভর মোটে দু-চক্ষুর পাতা এক হয় না!



চার

হাওড়াগামী রাতের ট্রেনে মুখোমুখি বসে আছি আমি আর বটু। ওর বড়ো কলকাতা দেখার সখ। আমাকে প্রায়ই বলত, মাখনদাদা, আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে চলো না। শুনেছি, কলকাতা বড়ো আজব শহর। সেখানে পয়সা থাকলে বাঘের দুধও নাকি পাওয়া যায়!

ওর এই আগ্রহটা তীব্র আকার ধারণ করল যখন ভজনের চায়ের দোকান টেপরেকর্ডারে সুসজ্জিত হয়ে নতুন একটা মাত্রা পেল। হিট্ হিন্দি গানের আকর্ষণে খদ্দের জুটত প্রচুর। ছেলে-ছোকরার ভিড় বাড়ল ভজনের দোকানটায়। তারা চা খেতে খেতে গান শুনত ঘাড় নাড়িয়ে, টেবিল ঠুকে তাল দিত। বটু দূরে থেকে তাকিয়ে থাকত হাঁ করে! বুকের ভেতরটা পুড়ে যেত আক্ষেপে। তার যদি অমন একটা টেপ-রেকর্ডার থাকত?

মাসের পয়লা তারিখ আমার পেমেণ্ট ডেট। বিকেলে গিয়েছিলাম বটুর চা-দোকানে। এক কাপ চা খেয়ে সিগ্রেট ধরিয়ে বটুকে বলেছিলাম, কী ব্যাপার, আজ যে বড়ো চুপচাপ? শরীর খারাপ নয়তো?

ফ্যাকাসে হেসে বটু বলেছিল, না-না, সেসব কিছু নয়। ক-দিন থেকে মনটা আমার ভালো নেই। ভজনের চা-দোকানে টেপ বাজে। গান শোনার লোভে সব খদ্দের ওর দোকানে ভিড় জমায়। আমি বসে বসে মক্ষি তাড়াচ্ছি।

ব্যবসা নিয়ে সেই প্রথম দুশ্চিন্তায় বটুকে আমি ডুবে যেতে দেখি। ছেলেটা এইভাবে হেরে যাবে? মানা যায় না! যার চেষ্টা আছে, উদ্যম আছে, সে তো একদিন জেতেই। ভজন কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে ওকে? স্টেশনে আসা-যাওয়ার পথে ভজনের সাজানো গোছানো চায়ের দোকানটা পথচারীর নজর কাড়বেই। সানমাইকা বসানো টেবিল, স্টিলের গ্লাস, তাক্ লাগানো হিরোইনদের বুকের বিজ্ঞাপন দেওয়ালে—সব মিলিয়ে দোকানটা রেল কলোনীতে আধুনিক সংযোজন। এসব আকর্ষণে খদ্দের তো বাড়বেই!

খাপরার ঘরের নীচে বসে বটু হেরে যাওয়ার চোক তোলে। আর হতাশায় ভোগে।

ভজনকে ঠেকাতে গেলে বটুরও একটা টেপ-রেকর্ডার দরকার, নাহলে সে এই প্রতিযোগিতার বাজারে পেরে উঠবে কেন? আমি ওকে ভরসা দিয়ে বললাম, ভাববার কিছু নেই, এবারে যখন কলকাতায় যাবো তুমিও আমার সঙ্গে যেয়ো। কলকাতায় জিনিস-পত্রের দাম সস্তা, ভালো দেখে একটা টেপ কিনে নিলেই হল!

ভজন চায়ের মধ্যে ভাং মেশায়। ব্যবসা চালু করার জন্য তার অসৎ চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। লোকমুখে এসব শুনে মন ভেঙে যায় বটুর। ব্যবসা নিয়ে তার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই। তবে সে যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চায়। তার একটা ভাঙা রেডিও আছে, মাস ছয়েক আগেও ব্যবহারের যোগ্য ছিল ওটা। এখন তার ছিঁড়ে, নব্ ভেঙে জগাখিচুড়ি দশা। মিস্ত্রির কাছে দিয়েও কোনো লাভ হয়নি। মিস্ত্রি ঠাট্টা করে বলেছে, পুকুরে চুবিয়ে দাও, গ্যাগ্-গ্যাগ্ করে বাজবে। দুঃখ পাওয়ার কথায় দুঃখ বাড়ে। তাই, কলকাতা যাওয়ার কথা বলতেই এক পায়েই রাজি হয়ে গেল বটু। দু-একদিন দোকান বন্ধ রাখলেও তার কোনো ক্ষতি নেই, বরং লাভ। একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ক-দিন। আমার কথায় ট্রেনের টিকিট কেটে বটু এখন পুরোদস্তুর একজন যাত্রী।

শীতের দৌরাত্ম্য রাতের প্রশ্রয়ে বেড়ে যায়, শীত সেই অবাধ্য পশু যার ধারালো দাঁত মানুষের মসৃণ ত্বক আঁচড়ায়। শীত যত বাড়ে, রাতের গভীরতাও তত বাড়ে। বটু জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল ট্রেনের কামরায়, ঢুলুনিতে চোখে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। তার গায়ে চাদরের বদলে পাতলা একটি কম্বল। এমনিতে বটু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, তার বেড়ে ওঠা পঁচিশ বছরের শরীরটা উচ্চফলনশীল ধানগাছের চেয়ে দৃষ্টিনন্দন। আচমকা শৈত্যপ্রবাহে কিছুটা দমে গিয়েছে সে, শরীরের আঁটোসাঁটো হাবভাবে সেটাই প্রথমে মনে হয়। বটুর আড়ষ্টতার আর একটা কারণ ছিল যার জন্য সে চোখ নিচু করে চুপসানো মুখে বসেছিল চুপচাপ। কোমরে তার হাজার দেড়েক টাকা বাঁধা। রাতের ট্রেনে বিপদ-আপদের শেষ নেই। ঘুমিয়ে পড়লে অঘটন ঘটে যেতে কতক্ষণ? রাত কাঁপিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছিল ট্রেনটা, শীত এসে ছোবল মারছিল কাচের জানলায়। চরাচর জুড়ে দাঁত ভাঙা ক্রুদ্ধ হাওয়ার তর্জন-গর্জন। বাইরের শস্যক্ষেত্র, মাঠ-ঘাট, পাহাড়-বনভূমি কিছুই আর দেখা যায় না! কামরায় ঘোলাটে আলোয় শুধু একে অন্যের মুখ দেখা যায়! বগিটাতে ভিড় আছে প্রচণ্ড; মানুষের কোলাহল, নিঃশ্বাসের উত্তাপে কামরার বাতাস যেন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। আমি বহু কষ্টে একটা সিট জোগাড় করে কোণার দিকে বসেছি, ইচ্ছে কাচের ওপিঠে অন্ধকারের দ্রুরিত জলছবিকে

গোগ্রাসে গেলা। এত বয়স হল আমার, তবু জানলার ধারে বসার আজন্ম খিদেটা মিটল না। বটু আমার পাশে বসে; ওর চেহারায় একধরনের গ্রাম্যতা, যা ট্রেন কম্পার্টমেণ্টে একেবারেই বেমানান। সবাই ওর দস্যু মাপের বলিষ্ঠ চেহারাটার দিকে নজর ফেলছিল যাওয়া-আসার পথে। ওর খসখসে কম্বলের ছোঁয়ায় বিরক্ত যাত্রী মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল অন্যদিকে।

ট্রেনটি থামল কোনো একটি স্টেশনে, জানলার কাচ তুলে স্টেশনের নামটা পড়তে যাব—তখনই বাঁশি দিয়ে ঝমঝমিয়ে ছেড়ে দিল গাড়িটা। খুব বেশি হলে মিনিটখানেক থেমেছে, এরই ফাঁকে খোলা দরজা দিয়ে উঠে এসেছে বেশ কিছু যাত্রী।

বটু আগ্রহ ভরে শুধোল, কোন্ স্টেশন, মাখনদাদা?

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম, কিছু বলতে গিয়ে আটকে গেল কথা। আমি মন্ত্রমুগ্ধ চোখে দেখলাম, সরু প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে আসছে সুন্দরী এক যুবতী, যার কাজল টানা চোখ দুটো রেল কামরার একমাত্র সুন্দর চোখ। তার টিকোলো নাকে ছোটো মাপের নিমফুল গড়ন নাকছাবি, সাদা পাথরের ফটিক স্বচ্ছ, খাঁজে-খাঁজে রেল কামরার হলুদ আলোর বিচ্ছুরণ। জোড়া জোড়া বিনুনি চুল পিঠের উপর লতানো। দেখে মনে হল অভিজাত বাঙালি ঘরের আদরের দুলালি। কিছুক্ষণ পরেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হল। মেয়েটা তার স্ফুরিত অধর নাড়িয়ে হাঁপানো স্বরে বলল, একটু সরে বসুন না?

বটু বসেছিল আমার পাশে, সরতে গেলে তাকেই সরতে হয়। মেয়েটা আমাদের দু-জনের দিকে কেমন একটা চোখ মেলে তাকিয়ে। সে যে সাহায্য চায় সে চোখের দৃষ্টি তেমন নয়। বটু সংকোচে নিজেকে সরিয়ে নিল কিছুটা। সামান্য একটু ফাঁক পেয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ল মেয়েটা। বসেই কাঁপা হাতে রুমাল বের করে মুখ মুছল অনেকক্ষণ। তারপর কেমন ঘাবড়ে যাওয়া চোখ মেলে দরজার দিকে তাকাল। ট্রেন ছুটেছে হাওয়ার বেগে। শুধু সাঁই-সাঁই শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে যেন কিছু শব্দ নেই। মরা পশুর মতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে চারদিক, হিম ছোঁয়ায় জানালার কাচে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম। ক্লান্তিকর ট্রেন ফিরে ওই সুন্দরী তন্বী যেন গ্রীষ্মের দিনে ফ্রিজে রাখা বিয়ার, আমার ঘুম ছুটে গেছে। তাকিয়ে দেখি বটুও আর ঢুলছে না, সে-ও সজাগ। তবে তার গুটিয়ে থাকা অবস্থা দেখে আমার খুব হাসি পেল। মেয়েদের ব্যাপারে ও বরাবরের ছুঁয়ে দেওয়া শামুক, কোনো উচ্চাশা নেই, আবেগহীন স্থিতু জলের জীবন। ওর এই নিস্পৃহতায় অনেক সময় বিরক্তি লাগে আমার, যেহেতু ওর বয়সটা আগুন ধরানোর বয়স। স্বপ্ন দেখার বয়সে কেউ বুড়োর মতো মুখ লুকিয়ে বসে থাকলে ভালো লাগে?

অস্বস্তি এড়াতে আমি সিগারেট ধরালাম। বটু তখন সংকোচজনিত

লজ্জায় আমার দিকে তাকাল। এত ঘনিষ্ঠভাবে মনে হয় কোনো মেয়ের পাশে বসেনি। বটুর যে সংকোচ তার ছিটেফোঁটা মেয়েটার মধ্যে ছিল না। সুকেশী মেয়েটি তোয়াক্কাহীন, মাঝে মাঝে উসখুসিয়ে সে গেটের দিকে তাকাচ্ছিল। আমি লক্ষ করলাম,—মেয়েটির চোখে মুখে ভয় ও আতঙ্কের সুস্পষ্ট একটা ছাপ। তাড়া খাওয়া মানুষের মতো তার চোখ-মুখ। বারবার উঠে উঠে অমন করে মেয়েটা কী দেখছে? তবে কী ওর সঙ্গে আরও কারোর ওঠার কথা? হতে পারে। আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। অপরিচিত কোনো মেয়ের উপর মনে মনে এত গবেষণা করা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি আবার উঠে দাঁড়াল, শালটা ভালো মতন গায়ে জড়িয়ে অস্থির চোখে সে আবার গেটের দিকে তাকাল। ভয়ে কালিমালিপ্ত মুখ। চাপা উত্তেজনায় সেই দৃষ্টি-কেড়ে-নেওয়া মুখের উপর দুশ্চিন্তার বাদল ছায়া। মেয়েটি উঠেই রিনঝিন চুড়ির শব্দ তুলে আবার বসে পড়ল সিটে। আমি আড়চোখে দেখলাম, অস্থির হয়ে ওঠা মেয়েটির চোখের তারা ভয়ে থিরথির করে কাঁপছে। পানসে হয়ে গেছে সেই মায়াবী চোখের দৃষ্টি।

যার এত উৎকণ্ঠা, দ্বিধাজনিত ভয় সে কেন রাতের ট্রেনে একা একা চলেছে? এ প্রশ্ন আমার মতো অনেকের। যারা তাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখছিল তারাও কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল মেয়েটার ব্যস্ত চটুল ব্যবহারে। বটু পাশে বসেও তাকিয়ে আছে জানলার দিকে। তার কোনো অন্তর্গত প্রতিক্রিয়া নেই। এক খণ্ড পাথরের মতো তার অবস্থান, মেয়েটাকে সে পাত্তাই দিচ্ছে না। এই ফাঁকে মেয়েটি সিটের উপর তার খয়েরি রঙের ভ্যানিটি ব্যাগটা রেখে বাথরুমের দিকে চলে গেল, ফিরে এল পাঁচ-দশ মিনিট পরে; তখন তার সর্বশরীর ভয়ে কেঁপে উঠছে সাপের মুখে ধরা পড়া ব্যাঙের মতো। মেয়েটি আবার ধপাস করে বসে পড়ে রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছল, তারপর জল হাত দিয়ে গায়ের শালটা মাথায় ঘোমটা দেবার মতো তুলে পুরো মুখটাকে ঢাকতে চাইল। কিন্তু শাক নিয়ে যেমন মাছ ঢাকা যায় না, তেমনি সে তার মুখাবয়ব ঢাকতে পারল না শীতবস্ত্রের মোড়কে।

ট্রেনের ঝমাঝম্ আওয়াজ ছাড়া রেল কামরায় কোনো শব্দ নেই। সম্ভবত ওই মেয়েটি একলা ভেবে দু-একজন চ্যাংড়া গোছের ছেলে তার দিকে ডাঙায় আছড়ে পড়া মাছের মতো জুলুজুলু চোখে দেখছিল। সেই ক্ষুধিত, ভিখারি, নির্লজ্জ চোখগুলোকে মোটেও পাত্তা দিল না মেয়েটা। ছবির নারীর মতো সে স্থির নতমুখী। হালকা প্রসাধনের নম্র গন্ধে ভরে যাচ্ছিল রেল কামরা, চোখ বুজে মুগ্ধ আবেশে আরাম খুঁজছিলাম আমি। হঠাৎ কয়েকটা বলিষ্ঠ পায়ের শব্দে আমার বিবশতা কেটে গেল। তাকিয়ে দেখি দু-জন হৃষ্ট-পুষ্ট দেহাতি যুবক মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়ে নিচুস্বরে কী যেন বলছে। চাপা গলায় কথা বললেও সে কথার ছিটেফোঁটা কানে আসছিল

আমাদের। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বটুর পাশে ক্রমশ সরে আসছিল মেয়েটা; তার বিবর্ণ, শুকনো মুখে ভয়ের চাপ-চাপ অন্ধকার। কথা বলার সামান্য ইচ্ছেটুকু ছিল না তার। বিরক্তিতে কঠিন হয়ে উঠছিল তার সুন্দর চোখদুটো। কেমন অসহায় চোখে সে আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুখটা নামিয়ে আনল পায়ের কাছে। ততক্ষণে বিরক্ত সেই ষণ্ডামার্কা দেহাতি যুবকটি মেয়েটার হাতটা ধরে মুচড়ে দিল গায়ের জোরে। 'উঃ' শব্দ করে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতেই বটুর গায়ে ঘেঁষটে গেল মেয়েটার শরীর। বটু পিছিয়ে বসতে গিয়ে ঠেলা মারল আমাকে। আমি দেখলাম মেয়েটার অসহায় চোখের কোণে জলের বাষ্প, ঠোঁট নড়ছিল সম্পূর্ণ অপারগতায়। খৈনি মুখে পুরে দ্বিতীয় লোকটি চড়া মেজাজে বলল, মসকরা ছেড়ে আমাদের সাথে চল; টাইম খুব কম। নাহলে কিন্তু এর নতিজা বুরা হবে। আমি যাব না। কাঁদো কাঁদো স্বরে ক্ষীণ প্রতিবাদ করল মেয়েটা! সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সাহায্যের জন্য সে কারোর দিকে তাকাল না। পুরো ঘটনাটা পারিবারিক এমনটা বোঝাতে চাইল ওরা।

সজোরে হাতটা ধরে টানতেই চুড়ি ভেঙে গিয়ে নরম চামড়া ছড়ে গেল, মৃদু আর্তনাদে সেই লোমশ হাতটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করল মেয়েটা। কিন্তু পারল না। হাঁপিয়ে উঠে আত্মসমর্পণের চোখে তাকাল। কালো, ঝাঁকড়া চুলের লোকটার গায়ে একটা লাল রঙের উলের চাদর। মাথায় লোমশ কাঠবিড়ালি টুপি। তার মদাসক্ত গোল-গোল চোখ দুটো বড়ো ভয়ংকর, সে আদৌ প্রকৃতিস্থ ছিল না। লোকটার ঘোলাটে হাতিপ্রকার ক্ষুদে চোখে মেয়েমানুষের শরীর চাখার নেশা। একে বাধা দিলে নিমেষে কর্কশ, কঠিন হয়ে উঠবে বসন্তখেগো ঘেয়ো মুখটা। এমন নাক-থ্যাবড়া, গোলগাল চেহারার মানুষ স্বভাবে নিষ্ঠুর আর জেদি হয়, এদের কাছে দু-একটা খুন জখম করা ডাল-ভাত খাওয়ার মতো সহজ কাজ। এই বিপজ্জনক লোকটার মুখের দিকে তাকালে হৃৎপিণ্ডটা এক মুহূর্তের জন্য চমকে উঠবে, ভয়ে কেঁপে উঠবে চোখের তারা। তবু আমি একবার ভীতু চোখে সাহস ফুটিয়ে তাকালাম. লোকটা আমার চোখের ভাষা বুঝে দেঁতো হেসে বলল, ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে চন্দনা। আমার ছোটো শালি। মাথায় ছিট আছে, দাদা। কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি,—দেখি যদি ভালো হয়—

লোকটার কথা আমার বিশ্বাস হল। ছোটো একটা হাসি ফিরিয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম বাইরের দিকে। অন্যের পারিবারিক ঝামেলায় নাক গলানো তো ভদ্রলোকের কাজ নয়!

সেই চন্দনা নামের মেয়েটি অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর হাল ছেড়ে দেওয়া শরীরে উঠে দাঁড়াল ইচ্ছার বিরুদ্ধে। রাগত স্বরে বলল, চলুন, কোথায় যেতে হবে চলুন। আমি না মরলে আপনারা তো আমাকে আর ছাড়বেন

না। ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে মুখ নিচু করে গেটের দিকে চলে গেল মেয়েটি। তার হাঁটা-চলায় কোনো স্ফূর্তি নেই, কেমন মনমরা একটা ভাব। একটু আগের সবুজ-সজীবতা কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটা। তার টানা-টানা চোখের কোণে চিকচিক করছিল অশ্রু, তাতে অস্বাভাবিকতার কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল না। অথচ লোক দুটো জোরের সঙ্গে বলে গেল, —চন্দনা পাগল! সত্যিই কি চন্দনা পাগল! আমার একটা ছেলেমানুষি ধারণা—যারা সুন্দর হয়—তারা কখনও পাগল বা ছিটগ্রস্ত হয় না। যাদের চোখে নীলপদ্ম ফোটে তারা কোনোদিন খুনি হয় না। তারা শুধু জ্যোৎস্নার বালিয়াড়ির মতো হাসতে পারে, তারা কখনও অন্যকে আঘাত দিয়ে কাঁদাতে পারে না। যারা ভালোবাসে তারা তো আকাশ-সমুদ্রের সমগোত্রীয়।

এইভাবে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। রাতের ট্রেনের ছোটার কোনো বিরাম নেই। এক জায়গায় বসে পা দুটোয় খিল ধরে যাওয়ার জোগাড়। কতক্ষণ আর বসে বসে সিগারেটের ধোঁয়ায় কলজেটাকে পোড়ানো যায়? বটুকে বললাম, তুমি একটু বসো, আমি বাথরুম থেকে আসছি।

হেঁটে এলাম বাথরুম অব্দি। হঠাৎ দেখি হুড়হুড় করে ঢুকে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া, ট্রেনের দরজাটা হাটখোলা। দরজার হ্যাণ্ডেল দুটো ধরে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে এই তীব্র শীতে হাওয়া খাচ্ছে একটা মেয়ে। পেছন থেকে মুখটা তার দেখা যায় না, ঘন ঘন শ্বাস নেওয়ার শব্দ শোনা যায় শুধু! এই শীতের রাতে কেউ কি দরজা খুলে হাওয়া খায়? আমার প্রশ্নে মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে উষ্ণ চোখে তাকাল, আমি দেখলাম মেয়েটার ফর্সা মুখে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম। আমার চিনতে কোনো অসুবিধা হল না যে এই মেয়েটিই চন্দনা। খুব অবাক হয়ে শুধোলাম, একি, আপনি এখনও যাননি?

কোথায় যাব? কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল চন্দনা, তারপর কাতর গলায় সে বলল, দোহাই, আমাকে একটু একা থাকতে দিন। নাহলে আমি মরে যাব। কথাগুলো বলেই ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে, আমি পাগল নই, বিশ্বাস করুন—আমি পাগল নই! ওরা আমাকে জোর করে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে আমার সর্বনাশ করে ছাড়ল। নাভিমূল থেকে কান্না তুলে পেঁয়াজকলির মতো ঘাড় ভেঙে আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল চন্দনা। আমি আলতো করে ওর মুখটা তুলে ধরলাম। বললাম, কাঁদলে কি এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তখন কেন বলেননি?

চন্দনা জলে ভেজা চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল, কী বলব, বললে যে আমি খুন হয়ে যেতাম!

এই লোকটা আপনার জামাইবাবু নন?

প্রতিবাদে ছটফটিয়ে উঠল চন্দনা, ওই লোকটাকে আজই আমি প্রথম দেখলাম।

কী আশ্চর্য! ভদ্রলোক তো আপনাকে শালিকা বলে পরিচয় দিলেন। তখন আপনি কেন প্রতিবাদ করলেন না?

প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হত না!

তার মানে?

বেসিনের কাছে সরে এসে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিল চন্দনা। তারপর আঁচলে ভেজা মুখটা মুছে নিয়ে সে আমার দিকে অসহায় চোখে তাকাল। আমি দেখলাম,—ওর গোলাপি গালে জোর করে দাঁত বসিয়ে দেওয়ার দাগ। লালচে হয়ে ফুলে আছে গালের মসৃণ চামড়া। ঠোঁট দুটো ভয়ে বাসি মেটের মতো দেখায়। পরনের শাড়িটাও আগের মতো নিখুঁত নেই—, কুঁচকে জায়গায় জল লেগে জায়গায় কেমন ভেজা-ভেজা, স্যাতসেতে। ওর দিকে তাকিয়ে মমতায় আমার মন ভিজে গেল। চন্দনার ভয়জনিত কাঁপুনি তখনও মেলায়নি, তার ছলছলে চোখ দুটো কিছু বলার জন্য উদ্‌গ্রীব।

আমি বুঝতে পেরে বললাম, নির্ভয়ে বলুন, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। সম্ভব হলে আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

এরকম প্রতিশ্রুতি অনেকেই দেয়। রাগে-উত্তেজনায় ফুঁসে উঠল চন্দনা, শেষে শরীর চটকে চলে যায়। ফুলের কাছে এসে মধু না খেয়ে ভ্রমর কোনোদিন ফিরে গিয়েছে, এমন ঘটনা আমার জীবনে ঘটেনি।

আমি ওর ক্ষোভের ধরন দেখে দুঃখ পাই। বলি, চন্দনা, আপনি আমাদের বোনের মতন। আপনার কথাগুলো আমাকে খুবই দুঃখ দিল। জলের মধ্যে সব-ই কি পোকা থাকে, দু-একটা কি মাছ থাকে না? আর একটা কথা। এত তাড়াতাড়ি মানুষের উপর বিশ্বাস হারাবেন না। সংসারে প্রকৃত ভালো মানুষের সংখ্যা কিন্তু কম নেই। আপনার বয়স কম। এই অল্প বয়সে বিশ্বাস হারানো পাপ।

চন্দনা কী বুঝল কে জানে! তর্জনি কামড়ে সে আমার উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দিকে চেয়ে থাকল অনেকক্ষণ। ওর ভাসমান চোখেও তখন অশ্রুবৃষ্টি, শরীর জুড়ে উথাল-পাথাল তুফান। মুখ যদি মানুষের আয়না হয়, সেই আয়নায় তার ভাঙাচোরা মুখের বিদীর্ণ প্রতিচ্ছবি।

বাইরে থেকে ভেজা জলের আর্দ্রতা নিয়ে ঠাণ্ডা আসছিল। গেটটা বন্ধ করে আমি যখন সিটে ফিরে যাব—চন্দনা তখন আমাকে ডাকল, শুনুন। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার কোনো মাথার ঠিক নেই। এইমাত্র দুটো কুকুর আমাকে ছিঁড়ে খেয়েছে। আমি ভালো মতন হাঁটতে পারছি না। এই দেখুন, গোড়ালিতে আমার জমাট বাঁধা রক্ত। এইভাবে প্রতিদিন

আমি শেষ হয়ে যাই। এছাড়া বাঁচার আর কোনো পথ আমার সামনে খোলা নেই। আর আমি বাঁচতেও চাই না, আমার হয়তো বাঁচার কোনো অধিকার নেই। বিড়বিড়িয়ে কথাগুলো বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল চন্দনা, বিশ্বাস করুন, আমার কোনো দোষ নেই, আমি নিরুপায়। পেটের জন্য দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়িতে থাকতে হয় আমাকে। আর সেই মামাই আমাকে জোর করে টেনে আনে এই লাইনে—

আপনার বাবা-মা ?

তারা কেউ বেঁচে নেই। চন্দনা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, বাবা অনেক আগেই দেহ রেখেছেন। মা মারা গিয়েছে বছর দুয়েক হল। তারপর থেকে আমি মামার বাড়িতেই আছি। মামা আমাকে খাওয়া-পড়া দেয়, তার বিনিময়ে রাতের গাড়িতে অন্তত পাঁচ-ছ-জনের কাছে দেহ দিতে হয় আমাকে। টাকা যা হয়, মামাই সব নিয়ে নেয়। এই করে এইভাবে চললে বলুন তো কোন্ মেয়েটা বাঁচে ? চন্দনা হঠাৎ করে আমার হাত দুটো চেপে ধরল, কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, আপনি আমাকে বাঁচান দাদা, আমি আর পারছি না। এভাবে চললে আমি আর বেশিদিন বাঁচব না, অথচ আমার যে খুব বাঁচতে ইচ্ছে করে !

আমি ওকে সাহস দিই, আমার সাহসে ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ভয়ার্ত গলায় ও আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, আপনি আমার মামার সঙ্গে কোনো ভাবেই পারবেন না। হাওড়া বোম্বে লাইনের প্রায় সব সমাজবিরোধী আমার মামাকে চেনে। কাউকে চোখের নিমেষে গায়েব করে দেওয়া মামার পক্ষে কিছুই না।

আমি শান্ত গলায় চন্দনাকে বলি, আপনি, চুপচাপ নিজের সিটে গিয়ে বসুন। আপনার মামা নিশ্চয়ই আপনার খোঁজে আসবেন।

হ্যাঁ, তা তো আসবেই।

রাত তো অনেক বাকি। আপনার মামা নিশ্চয়ই আর দু-একজনকে আপনার কাছে পাঠাবে। তখন আপনি তাদের সঙ্গে ভুল করেও যাবেন না। তারপর, দেখছি কী করতে পারে ওরা।

আমরা কথা শুনে ভয়ে বুজে এল চন্দনার গলা, আপনি ওদের সঙ্গে পারবেন না, এই লাইনের মাতালগুলো বড়ো হিংস্র হয়। আমাকে না পেলে ওরা আপনাকে ছাড়বে না। প্রয়োজন হলে খুন করতেও ওরা পিছপা হবে না। শুধু শুধু একটা খারাপ মেয়ের জন্য আপনি কেন জীবনের ঝুঁকি নিতে যাবেন ?

এটা একটা কর্তব্য, না করলে নিজেকেই অপমান করা হয়।

চন্দনা বিস্ফারিত চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল, তারপর ঘাড় নিচু করে অনুগত মেয়ের মতো চলে গেল নিজের সিটে। বটুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কিছু খুলে বলতেই রাগ গরগরিয়ে উঠল সে, হাতের পেশী ফুলিয়ে

বলল, হারামখোরদের আসতে দাও, তারপর দ্যাখো কী করি। মা কসম, আমি ওদের একটাকেও জিন্দা ছাড়ব না।

সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেনটা থেমে গেল ছোট্ট একটা স্টেশনে, এক মিনিট থেমেই ছেড়ে দিল আবার। আর ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেণ্ডার গোছের একজন লোক খুঁজতে খুঁজতে হাজির হল চন্দনার সামনে। ভয়ে চোখ বুজিয়ে নিল চন্দনা, এমন অসুর চেহারার মানুষ সে এর আগে যেন দেখেনি! লোকটা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসে চন্দনার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, চন্দনা পনছী কে আচে? বলল, তুমার মামু তুমাকে ডাকছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, লোকটার বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে মুখ খুলল চন্দনা, রাগে-ঘেন্নায় ফেটে পড়ে সে বলল, মামাকে বলুন আমি আর যাব না, আমি এখানেই থাকব।

ইখানেই থাকব, হুঁ। সোচ্ সমঝকে বাত বলো! আগের কামরায় একটা বার্থ আচে। সেখানে গেলে শুয়ে শুয়ে পারবে। ঢোক গিলে লোকটা চতুর চোখে হাসল।

চন্দনা না ঘাবড়ে বলল, আমি যাব না, আপনি চলে যান! শুধু শুধু বিরক্ত করে কোনো লাভ হবে না।

পানের পিক্ গিলে নিয়ে কদর্য হাসল লোকটা, যেতে তুমাকে হবেই চিড়িয়া, না গেলে তুমাকে আমি জোর-জবরদোস্তি উঠিয়ে নিয়ে যাব। গদি আঁটা সিট আঁকড়ে দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকল চন্দনা, বাঘের থাবার মতো নখযুক্ত হাতে লোকটা চেপে ধরল তার হাত, চল চল বলচি। নেহি তো—আঃ, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন বলছি। চন্দনার আর্ত চিৎকার কানে যেতেই সিট থেকে উঠে চোখের পলকে সেই বীভৎস লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বটু, নিমেষে কাবু করে ফেলে কপালটা বার দশেক ঠুকে দিল কমপার্টমেণ্টে। কপাল ফেটে ফিন্কি দিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্তের ধারা। পেছনে সজোরে লাথি কষিয়ে হাত ধরে লোকটাকে হিড়হিড়িয়ে বটু টেনে আনল গেটের কাছে। বটুর চেহারায় তখন অসুর নিধনের শক্তি। আমি ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছি না। বটু যে এমন হিংস্র, ক্ষিপ্র হয়ে উঠবে তা আমার ধ্যান-ধারণার বাইরে ছিল।

গেটের কাছে এসে বটু চিৎকার করে বলল, ট্রেন থামলে নেমে যাবি শালা, না হলে তোর রক্তে আমি হাত রাঙাব।

ট্রেন থামল বড়ো একটা স্টেশনে। ঘায়েল মানুষটাকে পায়ের চেটো দিয়ে প্লাটফর্মে সক্রোধে গড়িয়ে দিল বটু।

মা া এলেন তারও অনেক পরে। রোগা খিটখিটে চেহারা, চোয়াল বসা। চোখে গোল ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোকের পরনে ঢোলা পাঞ্জাবি আর ইস্ত্রি করা ধুতি। এক মুখ পান নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে তিনি বললেন,

কাজটা ভালো করিস্‌নি চন্দনা। চল, ঘরে চল্‌। তোর মামি তোকে যোগ্য জবাব দেবে।

মামার কথায় চোখে জল এসে গেল চন্দনার, সে অধৈর্য হয়ে বলল, মামা, চুপ করো। তোমার দুটো পায়ে পড়ি।

পায়ে পড়লে কি পেট ভরে যাবে? কে তোকে বসে বসে খাওয়াবে শুনি? আমার ভাত-কাপড় অত সস্তা নয়! চল্‌, এখানে বসে লোক হাসিয়ে লাভ নেই। খাটবি, খাবি চল্‌।

মামার ডাকে সাড়া দিল না চন্দনা, শিকড় চারানো গাছের মতো বসে থাকল চুপচাপ। মামা চন্দনার হাতটা ধরে টানলেন, যাবি না তাহলে? মুখপুড়ি, তুই যাবি না তোর বাবা যাবে! চল্‌ চল্‌ বলছি।

এবার রুষ্ট চোখে আমি এই ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম, কঠোর গলায়, বললাম, দয়া করে ওর হাতটা আপনি ছেড়ে দিন, না হলে আপনার অবস্থাও লোকটার মতো হবে।

মামা কেমন ভয় পাওয়া চোখে তাকালেন।

আমি বললাম, আপনি বাঙালি। সম্পর্ক জ্ঞান আপনার নিশ্চয়ই আছে। ধরুন চন্দনা যদি আপনার নিজের মেয়ে হত—তাহলে ওকে কি আপনি বেশ্যা বানাতে পারতেন?

মামা নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, কী করব, সবই পেট!

আপনার পেট নিয়ে আপনি পরের স্টেশনে নেমে যান। বিরক্ত করলে তার ফল কিন্তু ভালো হবে না।

চন্দনা! ও কোথায় যাবে?

সেটা চন্দনাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

চন্দনাকে জিজ্ঞেস করতেই সে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল, তারপর চোখ মুছে নিয়ে ফোঁপানি থামিয়ে বলল, হাওড়া স্টেশন আসতে দাও, তারপর যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকেই আমি চলে যাব। আমি আর কারোর গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না।

মামা করুণ গলায় বলল, ভুল বুঝিস না মা, আমার সাথে চল।

চিৎকার করে চন্দনা বলল, আমি যাব না, যাব না, যাব না। জেনে-শুনে আমি আর বাঘের গুহায় কোনোদিনও পা দেব না।

পরের স্টেশনে ভদ্রলোক নেমে গেলেন হার মেনে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে চন্দনা বলল, জানালাটা একটু খুলে দিন। বড্ড গরম লাগছে আমার।

আমি কাচের জানালাটা উঠিয়ে দিলাম উপরে। তবু ফোঁটা-ফোঁটা ঘামে ভিজে যাচ্ছিল চন্দনা। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ওর।



পাঁচ

রাতের গাড়ি কখনও ভয়ংকর রকমের গতি বাড়ায় তখন পুরো ট্রেনটা দুলে ওঠে ঝাঁকা দেওয়া কুল গাছের মতো। খুব দ্রুত বদলে যায় দৃশ্য যা দেখলে মাথা ঘুরে যেতে বাধ্য। পরিশ্রান্ত বটু বসেছিল জানলার ধারে, বাইরে ভয়াল ভীষণ অন্ধকারের ছায়া পড়েছে তার মুখে। ওই তীব্র শীতে ঘেমে উঠছিল তার মুখ, বারবার রুমাল বের করে মুখ মুছছিল সে। আমি সিঁটিয়ে বসেছিলাম বটুর পাশে, একটা অজানা ভয় ছুবলে-ছুবলে বিষ ঢালছিল মনে। আমাদের মুখোমুখি চন্দনা, তার গোটান লজ্জিত অপমানিত শরীরের দিকে ভালো মতন তাকানো যায় না। তার মামা গজ গজ করতে করতে নেমে গিয়েছে কোনো একটা স্টেশনে। আমাদের এক হাত দেখে নেবে বলে সে নীচে নেমে তর্জন-গর্জন করলো। জানালার কাচ তুলে বটুও শাসিয়ে উঠল, নীচে নামলে তুমাকে আর আস্ত রাখব না বুড্ডা। হাড়-গোড় সব ভেঙ্গে হোমিওপ্যাথি পুরিয়া বানিয়ে ছেড়ে দেব। বজ্রগলায় লোকটাকে ধমক দিতেই দৌড়ে পালিয়ে গেল স্টেশনের পিছনের দিকে। আর তখনি গাড়ি ছেড়ে দিল সাপের মতো কোমর হেলিয়ে-দুলিয়ে। খোলা জানালা দিয়ে হুড়হুড়িয়ে ঢুকে এল শীতস্পর্শী হাওয়া—যার দাঁতাল কামড়ে কমপার্টমেণ্টের সবাই একযোগে অস্থির হয়ে বলল, জানলাটা বন্ধ করে দিন, উরে বাপস্ কী শীত!

সবার মুখে কথা ছিল কিন্তু নিশ্চুপ ছিল চন্দনা। ট্রেন কম্পার্টমেণ্টের অস্বচ্ছ আলোয় আমি দেখলাম, সে কাঁদছে, তার দু-চোখ জলে ধোয়া, ঝড়ে কাহিল পদ্মফুলের মতো মুখ করে সে একবার আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল অস্পষ্ট জড়তায়। আমি নরম করে শুধোলাম, কী হয়েছে চন্দনা, তুমি কাঁদছ? মামার জন্য যদি মন খারাপ করে তাহলে পরের স্টেশনে নেমে যাও। তোমার নিজের ব্যাপারে তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা তো বাইরের মানুষ।

আমার কথায় আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে সজনে পাতার মতো থির থির কেঁপে উঠল চন্দনা, শাড়ির কোণায় চোখের জল মুছে গভীর আর্তি ভরা চোখে তাকাল। সে যেন কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারছে না, এমন দোনা-মোনা ভাব।

আমি আবার শুধোলাম, কিছু বলবে?

চন্দনা উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ল। ওর শ্রীময়ী মুখটায় প্রগাঢ় চিন্তার ছাপ। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল ঠোঁট আর ধুঁকো বকের মতো কণ্ঠার হাড়। স্বাভাবিক হতে গিয়ে আদৌ স্বাভাবিক হতে পারছিল না সে। বারবার পতনমুখী একটা লম্বা চুলকে সে আঙুলে জড়িয়ে সাটপাট শুইয়ে দিচ্ছিল মাথায়। নিজেকে ভোলাবার এটা একটা অদ্ভুত খেলা। মানুষ যখন চরম বিপর্যয়ের মুখে, তখনও সে চেষ্টা করে নিজেকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখার। বটু অনেকক্ষণ পরে বলল, কাজটা ভালো হলনি মাখনদাদা, চন্দনা ওর মামার সঙ্গে নেমে গেলেই ভালো করত। একটা সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে কলকাতা শহরে তুমি কোথায় ঘুরবে? এবার শাণিত চোখে বটুর দিকে তাকাল চন্দনা, অভিমানে কেঁপে উঠল ওর ঠোঁট, কান্নার গলায় বলল—,মরে গেলেও আমি আর ওখানে যাব না; তার চেয়ে হাওড়ার ব্রিজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ব তা-ও ভালো, তবু জেনে শুনে আর নরকধামে ফিরে যাব না! তুমি তো এতদিন ওই নরকধামেই ছিলে? আমার প্রশ্নে ব্যথিত চোখ মেলে চন্দনা তাকাল, হ্যাঁ ছিলাম। মেয়েরা কখন বাঘ-ভালুকের সঙ্গে ঘর করে তা নিশ্চয়ই জানেন। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর আমার যাওয়ার মতো কোনো জায়গা ছিল না, যদি থাকত তাহলে ভুল করেও নিজেকে এমনভাবে পোড়াতাম না। আমার মন্দ ভাগ্য নাহলে এমনটা কেন হবে বলুন?

আমি চুপ করে থাকলাম। চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ; মানুষ ঝোঁকের মাথায় কত কী করে বসে, পরে সেই কৃতকর্মের জন্য তাকে জীবনভর আফশোস করতে হয়। বটু যা বলেছে তা ভেবে দেখার মতো কথা। চন্দনা ছোটো নয়, গা-গতরে বেড়ে ওঠা চন্দন গাছ। হাওয়া মারলে যার শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোয় তাকে আমি লুকিয়ে রাখব কোথায়? এমনিতে আমি একটা ছাপোষা কেরানি মানুষ, খরচের হাত তীব্র হওয়ায় নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। মেসে আমি হলাম ভবঘুরে দলের রিং লিডার। প্রবাসে আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে ওই ছ-খাটিয়া পাতা মেসটুকু। ঠাকুর রেঁধে দিলে খাই, নাহলে চিঁড়ে ভিজিয়ে পেট ভরাই। এমন মানুষ একটা পূর্ণ যুবতীর কী দায়িত্ব নিতে পারে, আর দায়িত্ব নিলে সমাজ তা মেনে নেবে কেন? সমাজ হল সেই হাজরমুখো বিষ ফোঁড়া, একবার পুঁজ গলতে শুরু করলে যার রক্ষে নেই! এই গলিতে সমাজ ব্যবস্থায় চন্দনাকে আমি কোথায় নিয়ে গিয়ে লুকোব, তেমন গহন অরণ্য প্রকৃতি কোথায়?

আমার চাকরির জায়গায় তিন চূড়া পাহাড় আছে, শাল শিশম গামার বৃক্ষ আছে, আছে স্বচ্ছতোয়া পাহাড়ি যুবতী নদী যার উপমা কেবল চন্দনাই হতে পারে। কিন্তু কাব্য উপমায় এই পাথর বিশ্বের মন টলে না। তাই বারবার করে মনে হল, একটা ফালতু ঝামেলায় এভাবে জড়িয়ে না পড়লেই ভালো হত, দিব্যি, খোশ মেজাজে বাইরের অন্ধকার দেখতে-দেখতে, সিগারেটে টানের পর টান দিয়ে হাওড়া অব্দি নির্ঝঞ্ঝাটে যাওয়া যেত। হয়তো একেই বলে, কপালের নাম গোপাল! উটকো ঝড়ে খুঁটি নড়বড়ে।

মুখে হাসি ফুটিয়ে আমি শুধোই, আচ্ছা চন্দনা, কলকাতায় তোমার জানা-শোনা কেউ আছে? আমার প্রশ্নে বেশ অবাক হয় মেয়েটি, অপ্রস্তুত গলায় বলে, কেউ নেই। আমাদের আসল বাড়ী মেদিনীপুরের একটি গ্রামে। বাবা যতদিন বেঁচেছিল আমরা ততদিন গ্রামে ছিলাম। বাবা মারা যেতেই মা একটু অন্যরকম হয়ে গেল! জমিজমা সব বিক্রি করে চলে এল খড়্গপুরে। আমার এই মামা বলেছিল, পার্টির লোকদের বলে-কয়ে মাকে একটা সরকারি কাজে ঢুকিয়ে দেবে। মায়ের টাকাগুলো সর্বস্বান্ত করে মামা একেবারে বদলে গেল। আমি দেখেছি, দুটো ভাতের জন্য মামা প্রচণ্ড মারধোর করত মাকে। মা রাতের অন্ধকারে ছাদে উঠে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদত। একদিন এই মামাই মাকে জোর করে কৌশল্যার খারাপ বস্তিতে ঘর ঠিক করে রেখে এল। তারপর থেকে মা আমার কেমন হয়ে যায়! তার ওই সুন্দর চোখের নীচে কালি পড়ে, শরীর ভেঙে যায়। তখন তার প্রায়ই জ্বর হত। একদিন দুপুরবেলায় মামা এসে খবর দিল মায়ের টিবি হয়েছে। তারপর, ছ-মাসও হয়নি। আমাকে অনাথ করে মা-ও চলে গেল। এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে চোখের জল মুছে নেয় চন্দনা। আমি বা বটু কেউ-ই ওর মুখের দিকে ভালো মতন তাকাতে পারি না। আশ্চর্য হই এই ভেবে—পৃথিবীতে এমন একটা ঘটনা-ঘটলে কী এমন ক্ষতি হত!

ট্রেন এসে থেমেছে বড়ো একটি স্টেশনে, আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছে অন্ধকারের রাজ্য থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কয়েক একর জমি। বটু জানালার কাচ তুলে দিল উপরে, তারপর গায়ের কম্বলটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে আমাকে শুধোল, চা খাবে মাখন দাদা? শীতে একেবারে জমে গিয়েছি, চা খেলে শরীরটা একটু চাঙ্গা হয়।

হকারকে ডেকে তিন কাপ চা নিল বটু। দামটা চন্দনাই মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল, আমি বললাম, টাকাটা ঢুকিয়ে রাখো! তোমার এখন টাকার দরকার। চন্দনা কষ্ট পাওয়া মুখ করে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, দুঃখ পেয়ো না! আমরা এত বড়ো দু-জন থাকতে তুমি কেন চায়ের দাম দেবে? আর দিলে কি সেটা ভালো দেখায়?

জানলা ডিঙিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে আসছিল হিম। আমি বটুকে

বললাম, জানলাটা বন্ধ করে দাও। জানলা বন্ধ করে দিল বটু। চন্দনা ভয়-বিহ্বল চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে, ওর ভয়ের কারণ আমার কাছে কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না।

চন্দনা উশখুশিয়ে বলল, গাড়িটা ছাড়ছে না তো ? কী হল আবার ?

বড়ো স্টেশন বলেই হয়তো দশ মিনিটের স্টপেজ। আমি চন্দনাকে বোঝালাম। তবু আশ্বস্ত হতে পারল না চন্দনা। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে সে মুখের ঘাম মুছল, অস্থির হয়ে উঠে বলল, কাচের জানলাটা তুলে দিয়ে শাটারটা ফেলে দিন।

কেন, বেশ তো আলো আসছে !

এই আলো আমার চোখে বড়ো বিঁধছে। আমার খুব ভয় করছে। মনে হচ্ছে শয়তানগুলো এখনো যায়নি। ওরা তো চোট খাওয়া বাঘ। প্রতিশোধ না নিয়ে কি যাবে ? এতক্ষণ পরে ওর উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার কাবণ অনুমান করে আমি হা-হা করে হাসলাম। চন্দনার চোখের তারায় ভয়ের কাঁপুনি, সে কেমন শুকনো মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি জানেন না ওরা কেমন ভয়ংকর প্রকৃতির লোক। ওরা পারে না এমন কোনো কাজ বুঝি আর নেই। ওই যে কালো মতন লোকটা যার গোঁফজোড়া পালোয়ানদের মতো—ওর মতন শয়তান মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি। মেন লাইনে সবাই ওকে যমের মতো ভয় করে। ওর একটা ডাকনাম আছে। সবাই ওকে কালাপাহাড় বলে ডাকে। ওর গায়ে নাকি পাহাড়ের মতো শক্তি ! ওই মানুষটাকে দেখলে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যায়। লাইনের পুলিশগুলো পর্যন্ত ওকে ভয় আর সমীহ করে কথা বলে।

তাতে আমাদের কী ? দেখছ তো বটুকে ও ইচ্ছে করলে কালাপাহাড়ের মতো দশটা মানুষকে বগল দাবা করে রাখতে পারে। তুমি ভয় পেয়ো না। আমরা থাকতে কেউ তোমার দিকে খারাপ চোখে তাকাতে পারবে না। তাকালে তার চোখ উপড়ে নেব।

আমার কথায় পুরোপুরি ভরসা পায় না চন্দনা, ওর চোখে মুখে এখনও ভয়ের প্রলেপ। সুন্দর মুখটায় অকারণ কালিমা। গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে মৃত অজগরের মতো, গার্ড সাহেব তিন ব্যাটারি টর্চ হাতে ছুটে যাচ্ছে ইঞ্জিনের দিকে। কিছু একটা অঘটন ঘটেছে বাতাসে, উদ্বিগ্ন মানুষের চলা-ফেরায় এমন ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কয়েকজন ক্রুদ্ধ মানুষ দপদপ পা ফেলে জানলায় টর্চ মারতে মারতে চলে যায়। তাদের পিছনে দু-জন সেপাই, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। উদ্ভ্রান্ত চোখে তারা কাকে যেন খুঁজছিল। এবার ভয়টা আমাকে এসে আঘাত করল, চন্দনার দিকে তাকাতেই দেখি—গায়ের ঘিয়ে রঙের শালটা দিয়ে মাথা-মুখ ঢেকে কেমন গুটিয়ে শুটিয়ে কোণ ঘেঁষে বসে

আছে সে। ভয়ে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে যেন ওর কষ্ট হচ্ছে। আমি আর কালবিলম্ব না করে জানালাটা ফেলে দিলাম। বটুকে বললাম, হাওয়া খারাপ। ওরা মনে হয় আমাদের খুঁজছে। কথাবার্তা ফোঁস-ফোঁসানি শুনে তো তাই মনে হল।

আমার কথায় মোটেও ঘাবড়াল না বটু। সে মোচে তা দিয়ে যেন কিছু হয়নি এমনভাবে তাকাল—চুপচাপ বসে থাকো মাখনদাদা। যাকে খুশি আসতে দাও। তাগত শুধু ওদের গায়েই নেই, আমাদের গায়েও আছে।

আমাদের কথা শুনে আর্তনাদের মতো অস্ফুটে ডুকরে উঠল চন্দনা, কী হবে, ওরা যদি আমাকে আবার ধরে নিয়ে যায়? আমি জানি—ওরা আমাকেই খুঁজছে। এত সহজে ওরা আমাকে রেহাই দেবে না।

'ডরো মত্'। বটু ধমকে উঠল চন্দনাকে, 'দুটো মানুষের চারটে হাত। চারটে হাতই মরদের হাত। এই হাতের ফান্দায় শের আসলেও ঘাড় ঘুঁটে খতম করে দেব দু-দুটা জান থাকতে এত ডরলে চলে?'

ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়—চন্দনার উদাস চাহনিতে এমন ইঙ্গিত। গাড়িটা নট নড়নচড়ন। ঘড়িতে তখন রাত দুটো বেজে ত্রিশ মিনিট। বটু আমাকে অস্থির হয়ে শুধোল, হাওড়া আর কতদূর?

আমি বললাম, অনেকটা পথ। গাড়ি দু-ঘণ্টা লেটে চলছে। গাড়ি হাওড়ায় পৌঁছোতে সকাল হয়ে যাবে।

বটু কী যেন ভাবল, তারপর চন্দনাকে বলল, তুমি বড্ড থক্কে গিয়েচ। এই আমার কম্বলটা নাও। ভালো মতন গায়ে জড়িয়ে একটু আরাম করো। আমরা দু-জন জেগেই আছি, তোমার কোনো ভয় নেই।

চন্দনা কম্বলটা নিল না, না নিয়ে সে ভালোই করেছে! এই একটা কম্বল ভিন্ন বটুর গায়ে দেবার কোনো শীতবস্ত্র ছিল না। বটুর এই উদারতা আমাকে মুগ্ধ করল। প্রথম দিকে ওর চোখে রাগের যে ঘোর দেখেছিলাম, এখন তা উধাও। চন্দনার কাছে বটু ক্রমশ সহজ হয়ে উঠেছে। আর চন্দনাও অপরিচিতের গণ্ডি পেরিয়ে পোষ মানা পাখির মত কলকলিয়ে উঠেছে নির্দ্বিধায়। আমাদের আশে-পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও ভয়ে কিছুটা তটস্থ। গৃহজীবি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হলে বিরক্তির ভাঁজ পড়ে কপালে। আমি অনেককেই বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিতে দেখলাম। হয়তো আমি একা থাকলে অনেকেই প্রতিবাদে সোচ্চার হত, কিন্তু বটুর শরীর-স্বাস্থ্য এবং তার দৈহিক জোরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে অনেকেই মুখে খিল গুঁজে আছেন। বটু একেবারে নির্বিকার। গাড়িটা গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকায় মাঝে-মাঝে সে খুব অস্থির হয়ে উঠছিল। চন্দনার মুখে কথা নেই, বিপদের আঁচ পেয়ে জড়োসড়ো ভঙ্গিমায় যতদূর সম্ভব আড়াল করতে চাইছিল নিজেকে।

এক সময় হল্লাটা এগিয়ে এল আমাদের কামরায়। ভারী বুটের শব্দ কামরার রুদ্ধ বাতাসে আছড়ে পড়ল ঘনঘন। ভয়ে স্বর ফুটল না চন্দনার, সে কেমন ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, ওরা মনে হয় আসছে।

চুপ করো। বটু থামিয়ে দিল চন্দনাকে। গায়ের কম্বলটা জোর করে ওর গায়ে চাপিয়ে দিয়ে ইশারা করে বলল, এটা দিয়ে পুরা মুখটা ঢেকে নাও। কেউ তুমার নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেবে না। তারপর, দেখছি, কী হয়—

নিরুপায় চন্দনা হয়তো বাঁচার জন্যই শালের উপর দিয়ে কম্বলটা জড়িয়ে নিল গায়ে। শুধু চোখ দুটো ছাড়া তার মুখটা আর দেখা যায় না। আর ওই চোখ দেখে বোঝা যায় না, সে ছেলে না মেয়ে।

সঙ্গে দুটো সিপাই নিয়ে তিনটে মারমুখী লোক ঘুমন্ত যাত্রীগুলোকে দেখতে-দেখতে চলে গেল বাথরুম অব্দি। সেপাইটা খইনি মুখে পুরে বলল, এই কামরাতে কই দেখলাম না। মনে হচ্ছে, মাল সটকে গিয়েচে। রেণ্ডিগুলো ধড়িবাজ হয়।

কালো মতন ষণ্ডামার্কা লোকটা নিরাশ চোখে যাত্রীদের দিকে তাকাল। তার মুখের কাছটা ঘুষির আঘাতে থেঁতলান। ভুরুর কাছটা ফোলা, সেখান থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছিল।

ঘন একটা শ্বাস নিয়ে বলল, হতেই পারে না। ফুলকলিয়ারে আমি এই কামরায় দেখেচি। সেপাই সাব, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি আর একবার চক্কর দিয়ে আসি। শালি পালাবে কোথায়? ধরতে পারলে ওর সোন্দর মুখটা আমি অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেব। আর ওই হারামির বাচ্চাটাকেও ঠ্যাং ভেঙে বস্তায় পুরে সুবর্ণরেখার জলে ফেলে দেব।

গাড়ি তখন গড়াতে শুরু করেছে, লোহায় লোহায় তুমুল ঘর্ষণের শব্দ: যেন হাই তুলে একটা দানব গা ঝাড়া দিল হঠাৎ। স্বস্তির শ্বাস ফেললাম আমি। বটু শীতে কুঁকড়ে গিয়ে আমার কাছ ঘেঁষে বসেছে, বিপদকে সামলাবার জন্য সে মনে মনে প্রস্তুত।

ষণ্ডা চেহারার লোকটা আমাদের রোতে এসে থমকে দাঁড়াল, বটুর মুখে টর্চ ফেলে সে চেঁচিয়ে উঠল, মিল গিয়া, মিল গিয়া। সেপাই সাব জলদি আইয়ে…

বটু দু-চোখে হাত ঢেকে উঠে দাঁড়াল। বাঘের গলার হুংকার ছেড়ে বলল, বাত্তি বুতাও। নেহি তো—বলেই হাতের মুঠি পাকিয়ে সিংহ বিক্রমে তেড়ে গেল সে।

ততক্ষণে সেপাই দুটো এসে হাজির। আমি বটুর জামাটা ধরলাম খিঁচ দিয়ে। ফিসফিসিয়ে বললাম, ওরা পাঁচজন। ওদের সঙ্গে আমরা কী পারব?

বউদু রাগে-উত্তেজনায় গরগরিয়ে বলল, পাঁচজন কেন, পানশো আদমি এলেও ওদের আমি ছেড়ে দেব না। হারামিগুলো ভেবেছেটা কী। ট্রেন কামরায় মেয়েমানুষ কী এতই সস্তা। কই আসুক, বুকের ছাতি থাকলে চন্দনার হাত ধরুক।

আমি বউদুকে শান্ত করতে পারলাম না, বউদু পেট্রোল ট্যাঙ্কারে দেশলাই কাঠি ছুঁড়ে দেওয়া দাউ দাউ আগুন, এত সহজে ওকে সংযত করা মুশকিল। তাই ওকে পিছনে ঠেলে দিয়ে ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে গেলাম সামনে। সেপাই দুটো আমাকে দেখে ভোজবাড়ির উল্লাসে মেতে গেল সহসা। আমার জামাটা খামচে ধরে শুধোল, ও লেড়কি কীধার ?

আমি যেন কিছু জানি না। এমনভাবে বললাম, কোন্ লেড়কি।

সেপাইটা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, মশকরা রাখো। জলদি, জলদি বলো কোথায় সে। না হলে ডাণ্ডার ঘায়ে হাড়গোড় সব চুরচুর করে দেব।

আমি সক্রোধে বললাম, আগে জামাটা ছাড়ুন। তারপর, কে কার কী করতে পারে দেখা যাবে।

জামাটা ওরা ছাড়ল না, জোর করে ছাড়াতে গিয়ে বোতাম ছিঁড়ে ঠিকরে পড়ল কামরায়। আমি কিছুটা দূরে সরে এসে বললাম, মেয়েটাকে নিয়ে কী করতে চান আপনারা ?

সেই ষণ্ডামার্কা লোকটা গলা বাড়িয়ে বলল, রেণ্ডিটাকে আজ পুরা রাতের জন্য টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি আমি। আওরতটার উপর আমার হক আছে। ওর মামা আমার কাছ থেকে একশ পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে। কই সে কোথায় ? —বলেই লোকটা এগিয়ে যাচ্ছিল জানলার দিকে। বউদু আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলনা, জামার হাতা গুটিয়ে চোখের পলকে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই কালাপাহাড়ের উপর। মোক্ষম দুই ঘাই দিয়ে লোকটাকে শুইয়ে দিল কামরায়। তারপর বুক ফুলিয়ে সে সামনে দাঁড়াল পুলিশ দুটোর। আমি লক্ষ্য করলাম সাপ দেখা ইঁদুর ছানার মতো ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছে রাইফেলধারী সেপাই দুটো। এই সুযোগে বুক পকেট থেকে আমি একটা সাদা কাগজ বের করে লাল চোখে সেপাই দুটোকে শুধোলাম, তোমাদের নাম্বার কত বলো ?

নাম্বার দিয়ে তোমার কী কাজ ?

কী কাজ তা পরে জানতে পারবে।

ওদের কোনো সুযোগ না দিয়ে পকেট থেকে আমি আমার আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে দেখালাম। ভয় পাইয়ে দিয়ে বললাল, আমি সি বি আই অফিসার। হাওড়ায় আমার পোস্টিং। তোমাদের ডিউটি নিশ্চয়ই হাওড়া অব্দি।

ওষুধে কাজ হল। শুকনো মুখ করে সিপাই দুটো একে অন্যের দিকে তাকাল। আমি বটুকে দেখিয়ে বললাম, উনি হলেন ভিজিলেন্সের সিনিয়ার গ্রেড অফিসার। আমরা গিয়েছিলাম ইন্সপেকশন করতে সেকশনে। মিস্টার মালহোত্রা আমার ফ্রেন্ড। তাকে নিশ্চয়ই চেনো। মিস্টার মালহোত্রা মেন লাইনের জাঁদরেল ও সি। আমার মুখে তাঁর নাম শুনে সেপাই দুটো কাচুমাচু চোখে তাকাল। হাত জোড় করে বলল, স্যার, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি।

ওই লোকটার কাছ থেকে কত টাকা ঘুষ নিয়েছ? মিথ্যে বলবে না, মিথ্যে বললে আমি তোমাদের দু-জনকে সাসপেন্ড করিয়ে ছাড়ব।

রোগা সেপাইটা এবার অমার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, কাকুতি-মিনতি করে বলল, স্যার, মাত্র পঞ্চাশ টাকা।

কেন নিয়েছ? সরকার তোমাদের পেমেণ্ট দেয় না?

লোক দুটো কান্না-কান্না গলায় বলল, খুব অন্যায় হয়েছে স্যার। এমন ভুল জীবনে আর দ্বিতীয়বার হবে না। এবারটির মতো আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন।

কাগজটা ছিঁড়ে সেপাই দুটোর সামনে ফেলে দিলাম বাইরে, ওরা আশ্বস্ত হয়ে সেই ষণ্ডামার্কা লোকটাকে মারতে মারতে নিয়ে গেল গেটের কাছে। এই ফাঁকে কখন যে হাওড়া এসে গিয়েছে টের পাইনি, টের পেলাম দিনের প্রথম সূর্যের মুখ দেখে।

ট্রেন থেকে নেমে এলাম আমরা। বটু মুখ ফাঁক করে দম নিয়ে বলল, যাক বাঁচা গেল! তবে, এই সফরের কথা আমার জিন্দেগি ভর ইয়াদ থাকবে। রাতটা যে কীভাবে গড়িয়ে গেল তা আর টের পেলাম না। এখন একটু চা পেলে চাঙ্গা হত শরীরটা।

চায়ের কথা নয় আমি ভাবছিলাম চন্দনার কথা। প্ল্যাটফর্মে আমি আর বটু যখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, চন্দনা আমাদের এক পাশে সহায়-সম্বলহীন একলা ফুল গাছের মতো স্থির। ওকে দেখে যে কোনো মানুষেরই মায়া জন্মাবে। দিনের আলোয় ওর সরল, নিষ্পাপ লাবণ্যমণ্ডিত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরটায় মেঘ ডেকে উঠল অবেলায়। চন্দনা অনাদরে বেড়ে ওঠা কমনীয় তরুলতা, ওর সৌরভমণ্ডিত রূপই ওর মস্ত শত্রু—একথা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করি। ওর টানা ভুরুর নীচে কাজল মাখানো চোখ দুটি যাদুকরি মায়ায় উদ্ভাসিত, সকালের আলোয় তা শিশির চুম্বিত ঘাসের চেয়েও উজ্জ্বল। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বয়সটা অনুমান করার চেষ্টা করি। কিন্তু ওর তীব্র শরীরখণ্ড দেখে আমি ওর বয়স আন্দাজ করতে পারি না। ফুলের কি কোনো বয়স থাকে? চন্দনা পাখি না ফুল, না নিজেই একটা সম্পূর্ণ আকাশ তা আমি

হলফ করে বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারব, ষণ্ডামার্কা লোকটা প্রায় উন্মাদ হয়ে যাবার একমাত্র কারণ হল চন্দনার স্ফূর্ত দেহজৌলুস। সাধারণ কমদামি একটা শাড়িতেও চন্দনা যে অসাধারণ তা যাত্রীদের চোরা চোখের চাহনিতেই বোঝা যায়। বটু অনেকক্ষণ পরে চন্দনার গুটিয়ে থাকা শরীরের দিকে দৃষ্টি ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল চন্দনা। কষ্টের ছায়া ফুটে উঠল তার মুখে। কথা না বলে চোখ নামিয়ে নিয়ে শুকনো ঢোক গিলে আমার দিকে তাকাল বটু। বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে মাখনদাদা। চলো, চা দোকানে যাই। মুখ ধুয়ে কুছ নাস্তাপানি করতে হবে। আমার ভুখ লেগেছে।

হাওড়া স্টেশনের সোরগোল জোয়ার আসা সমুদ্রের কথা মনে করিয়ে দেয়, বাতাস এক কোণ থেকে আর এক কোণে গুমরে ফেরে। মানুষের নিঃশ্বাসের ঝড় যদি শুনতে হয় তাহলে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান বুঝি আর দ্বিতীয়টি নেই। বটুকে একজন যাত্রী ঠেলা মেরে কিছুটা হেলিয়ে দিয়ে চলে গেল। বটু কিছুটা বিরক্ত। বিস্ময়ের ঘোর তখনও ওর চোখ থেকে মুছে যায়নি। কংক্রিটে পা ছুঁইয়ে ও যেন কিছুটা আত্মমগ্ন, উদাসীন। চন্দনার প্রতিক্রিয়ার বাহ্যিক কোনো প্রকাশ নেই। হাওড়া স্টেশনে ওকে একদিন অন্তর আসতেই হত। ওর মামা হাওড়া অব্দি এসে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বাজার-হাট করে নিয়ে আবার ফিরে যেত। মহিলাদের ওয়েটিং রুমে ক্লান্ত, বিষণ্ণ শরীর নিয়ে ঝিমোত চন্দনা। বিকেলে মামা ফিরে এলে গঙ্গার ধারের হোটেল থেকে ভাত খেয়ে আবার রাতের ট্রেনে ফিরে আসত। এই একঘেয়ে জীবনে কোনো বৈচিত্র্য ছিল না, শুধু পাপগন্ধী অবক্ষয়ে ধীরে ধীরে মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলছিল সে। মুক্তির স্বপ্ন ছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সিংহের গুহা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ সাধ্য ছিল না। এক এক সময় তার মনে হত মামা একটা অক্টোপাস যার বন্ধন থেকে সে কিছুতে নিষ্কৃতি পাবে না। নিষ্কৃতির ভাবনা তাকে রেহাই দিত না। মামার চিল নজর এড়িয়ে সে মুক্ত আকাশ কোনোদিন দেখতে পারেনি, অথচ আকাশ দেখার প্রবল সখ তার। যখনই মাথা চাড়া দিয়ে সে প্রতিবাদ করেছে তখনই চুলের মুঠি ধরে মামি তাকে আছড়ে ফেলে দিয়েছে মেঝেয়। মার-ধোর করতেও বাকি রাখেনি। সারাদিন বন্ধ করে রেখেছে ঘরে। গালিগালাজে অতিষ্ঠ করে দিয়েছে বিদীর্ণ হৃদয়। বন্ধ ঘরে আছাড় দেওয়া পদ্ম পাপড়ির মতো নিজেকে এলোমেলো করে সে বুক উজাড় করে কেঁদেছে। কখনও বা আত্মহত্যার বাসনা জেগেছে মনে। হয়তো এই সুপ্ত বাসনাটাই একদিন স্থায়িত্ব লাভ করত তার জীবনে। যে জীবনের প্রতি তার বিরূপতা সেই পূতিগন্ধময় জীবনকে তো ভালোবেসে পুজো করা যায় না। তাই মানসিক টানাপোড়েন প্রতিনিয়ত তছনছ করত চন্দনাকে। মানুষের ভিড়ে হারিয়ে

যাবার প্রবল বাসনা হত। এসব গোপন ইচ্ছের কথা কী করে টের পেয়ে যেত মামা। তখন খাতির যত্ন বেড়ে যেত। উপার্জনের টাকাটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলত, যা সিনেমা দেখে আয়, হোটেলে গিয়ে মাংস ভাত খেয়ে আয়। কী করব বল, আমার অভাবের সংসার। যে কারখানায় কাজ করতাম সেখানে তিন বছর ধরে লক-আউট। তিনটে বছর বসে থাকলে এতগুলো পেট চলে কী করে? চন্দনা টাকা উপার্জনের মেশিন। সে যে রক্তমাংসে গড়া বাবা-মা মরা একটা অনাথ মেয়ে—একথা মামা হয়তো অস্বীকার করত। এসব ভাবতে-ভাবতে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে নিল চন্দনা। আমি দেখলাম ওর গোলাপি মুখে আবার সেই কষ্টের মেঘটা ছড়িয়ে পড়েছে, কেমন পাংশু আর মলিন দেখাচ্ছে ওর মনটা। আমি ওর লুকোনো যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পারি। কিন্তু যে ব্যথা ক্ষত সৃষ্টি করে তাকে আমি কী করে নিরাময়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাব? তেমন মনের জোর, সাহস—শক্তি, আর্থিক সচ্ছলতা আমার নেই।

একটা সিগারেট ধরিয়ে গল্‌গলিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আমি যেন এসব কিছু ভুলে থাকতে চাই। আমাদের দু-জনের মাঝে একটা সুন্দরী মেয়ের অস্তিত্ব শত চেষ্টাতেও ভোলা যায় না। চন্দনা নির্বাক তবু আমার মনে হচ্ছে ও যেন কথা বলার জন্য উদ্‌গ্রীব। মেয়েদের যেটুকু লজ্জা না থাকলে নয় তার কিছু অধিক লজ্জাকে নারীসৌন্দর্যের অলংকার হিসেবে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে চন্দনা। ওর কথাবার্তা মার্জিত, স্পষ্ট এবং অযৌক্তিক নয়। যতটুকু বলার ততটুকুই সে বলে। দেহপশারিণী হয়েও সে যেন স্কুলের গণ্ডি পেরোনো কোনো এক গ্রাম্য যুবতী। বাচালতার তিলমাত্র স্থান নেই ওর জিভে। ওর চোখের তারায় যে ব্যথিত আর্তি আছে যে কোনো মানুষের ভিতর থেকে সহানুভূতি বার করে আনার পক্ষে যথেষ্ট।

আমি ব্যাগটা তুলে নিয়ে বটুকে বললাম, চলো, রোদ উঠে যাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে আমরা চা খাব।

বটুকে যাওয়ার কথা বলাতে চন্দনা কেমন শুকনো চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি ওকে যাওয়ার কথা বলিনি, ও কিছুটা চিন্তিত। ওর মুখ দেখে এমনটা আঁচ করে আমি হাসি-হাসি মুখে বললাম, আর ভাবতে হবে না, চলো। যা কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার বাইরে গিয়ে নেওয়া যাবে।

চন্দনার সঙ্গে একটা বড়ো মাপের ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া আর কোনো কিছুই ছিল না। আমার হাতে একটা ফোমের ব্যাগ—শীতকাল বলেই অতিরিক্ত সোয়েটার-চাদর ওর মধ্যে ঢোকানো। বটু এসেছে খালি হাতে!

আমরা যখন হাওড়া স্টেশনের বাইরে এলাম তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি চন্দনা। কেমন চুপচাপ ওর মুখ। সুন্দর সাবলীল মুখের

দ্যুতিময় ঝিলিক যেন কে কেড়ে নিয়েছে জোর করে। চন্দনা শীতের পাতা ঝরা গাছ, মলিন ও উদ্‌ভ্রান্ত। আমি ওকে চাঙ্গা করার জন্য বললাম, এত ভেবো না তো! তুমি তো সাঁতার না জেনে জলে ডুবে যাওনি। তুমি বুদ্ধিমতী। আজ থেকে নিজের ভাগ্য তোমাকে নিজের হাতে গড়ে নিতে হবে। ভয় পেয়ো না, পৃথিবীটা এখনও জানোয়ারে ভর্তি হয়ে যায়নি, কিছু খাওয়া যাক। তারপর, কোথাও নিরিবিলিতে বসে আমরা তোমার সব কথা শুনব।

চন্দনা অসহায় চোখে তাকিয়ে বলল, আমার আর কোনো কথা নেই! আমার পাপজীবনের শেষ কথাটুকু কাল রাতেই বলে দিয়েছি। আর আমি ওই পাপ নিয়ে নাড়া ঘাঁটা করতে চাই না। এতে আমার কষ্ট বাড়ে, আমি শেষ হয়ে যাই, সাহস হারিয়ে ফেলি। আপনারা আমাকে হাঙ্গরের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছেন। শুধু তাই নয়, এতটা সময় আগলে রেখেছেন। আপনাদের এই ঋণ আমি মানুষ জীবনে কোনোদিন শোধ করতে পারব না। আমার একটা ধারণা ছিল—যারা আমাকে ভালোবাসে, খাতির করে তারা প্রত্যেকেই হয়তো মাংসখেকো। আমার সেই ভুল ধারণাটা এখন ভেঙে গিয়েছে। আমার চোখ এখন অনেক পরিষ্কার। আপনারা অনুমতি দিলে —আমি এখনই চলে যাব!

ওর কথায় আমি, বটু দু-জনেই চমকে উঠি। প্রবাহিত গঙ্গার বুক থেকে চোখ ফিরিয়ে বটু বলে, তা হবে না। তুমাকে আমরা একলা ছাড়ব না। আমি শুনেছি কলকাতা শহরেও অনেক হাঙ্গর-কুমিরের বাস। তারা কি তুমাকে একলা পেলে ছেড়ে দেবে?

তাহলে আমি কী করব? মানসিক শক্তি হারিয়ে পাগলের মতো তাকায় চন্দনা, ডুকরে ওঠা গলায় বলে, আপনারা তো আমার জন্য অনেক করলেন, এখন শুধু আর একটা উপকার করে দিন। আমার ভ্যানিটি ব্যাগে মাত্র পাঁচটা টাকা পড়ে আছে। আর কিছু টাকা দিন যাতে আমি বিষ কিনে খেয়ে চিরদিনের জন্য মুছে যেতে পারি। কথাটা শেষ হওয়ার আগেই অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল চন্দনা।

আমি বেশ কড়া স্বরে বললাম, এমন কথা বলে তুমি আমাদের অপমান করছ! চন্দনা পলকের জন্য ভাবল, তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমাপ্রার্থীর গলায় বলল, আমি আপনাদের দুঃখ দিতে চাই না। আমার কথা যদি আপনাদের দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন। এই বলে সে চুপ করে থাকল অনেকক্ষণ, তারপর চোখ নামিয়ে নিস্তেজ স্বরে বলল, এছাড়া তো আমার কোনো পথ খোলা নেই। এই যে কত মানুষ আসছে- যাচ্ছে, তাদের কাছে হাত পাতলে তারা কেউই আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে না। আমি তো ভিখারির মতো দেখতে নই। মানুষ

আজকাল ভিখারি ছাড়া অন্য কাউকে ভিক্ষা দেয় না। আর ঠক-জোচ্চোরি আমার দ্বারা হবে না। আর বিষগাছের গোড়া কাল রাতে আমি নিজের হাতে উপড়ে দিলাম, তা আমি আর নিজের হাতে, পুঁততে চাই না। তাহলে বলুন, আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন্ পথ থাকে আমার?

আত্মহত্যা তোমার সমস্যা সমাধান করবে ভেবেছ? আমার কথায় চন্দনা তির্যক দৃষ্টি মেলে তাকাল, ও যেন আমার কাছ থেকে সমাধানের সহজ কোনো সূত্র আশা করছিল। আমিও গভীর ভাবে ভাবছিলাম, কী করা যায় চন্দনাকে নিয়ে। ওর বয়সটা বিপদ ডেকে আনে, আর এই একটিমাত্র ভয়ে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। চন্দনা যদি বুড়ো থুরথুরো বা মাঝ বয়েসি কোনো ভদ্রমহিলা হোত—তাহলে ওকে আমি আমাদের মেসে নিয়ে গিয়ে উঠোতাম। এমন একটি মেয়েকে পুরুষের মেসে রাঁধুনির কাজে নিয়োগ করা মানে, খাল কেটে কুমির আনা। রূপসী মেয়েরা সর্বকালে যুদ্ধ-অশান্তির জীবাণু বয়ে বেড়ায়। তবু চন্দনাকে তো ভাসিয়ে দেওয়া যায় না, ওর কোনো একটা গতি করা দরকার।

বটু সেই থেকে কী যেন ভাবছে। মেয়েদের উপর ওর প্রথম থেকেই একটা অ্যালার্জি আমি লক্ষ করেছি। কিন্তু, আশ্চর্য, চন্দনার সব কিছু শুনে নারী সম্বন্ধে ওর যে অহেতুক গাত্রদহন তা কিছুটা থিতিয়ে এসেছে মনে হল। আমাদের দীর্ঘদিনের মেলামেশায় আমি বটুকে কোনোদিন পূর্ণ যুবতী মেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে শুনিনি। ওর দোকানে আদিবাসী মেয়েগুলো চা-জল-খাবার খেতে এলে বটু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের বিদেয় করে। ওর মুখে আমি এখনও পর্যন্ত কলোনির কোনো মেয়ের নিন্দা-প্রশংসা শুনিনি। কলোনির চাপা কলটায় মায়ের বয়সী কোনো মেয়ে থাকলেও বটু পারতপক্ষে যায় না। তাতে খদ্দের ফিরে গেলেও তার কিছু যায় আসে না।

সেই বটুকে চন্দনা সম্বন্ধে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহিত হতে দেখে আমার মনে একটা ভাবনা দোলা দিয়ে যায়। আমি কিছুটা আশ্বস্ত হই। সমাধানের সামান্য সূত্র খুঁজে পেয়ে কিছুটা পুলকিত হই।

বটুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলি, তোমাকে একটা কথা বলতাম—যদি কিছু মনে না করো। বটু উৎসাহিত হয়ে বলে, বলো না মাখনদাদা, বলে ফেল।

না, কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা তাই ভাবছি।

কী এমন কথা যা বলতে তুমি এত ভাবছ? আরে বাব্বা, আমরা তো দোস্ত আছি। দোস্তকে এত শরমা চলে? বটু আমাকে খুঁচিয়ে দেয়। কী কথা তা জানবার জন্য ওর ব্যাকুলতা দেখে আমার ভাবনার ছকটা সম্পূর্ণ হয়।

মাথার চুলে হাত দিয়ে কীভাবে কথাটা শুরু করব এ বিষয়ে আমি গভীরভাবে ভাবি। শেষে বলেই ফেলি, বটু, চন্দনাকে তোমার কেমন লাগে?

বহুৎ আচ্ছা। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে বটুর।

আমি বটুর হাসির তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা করি। ভরসা পেয়ে বলি· ওর মতো দুঃখী মেয়ে আমি আর দেখিনি। ওর জন্য কিছু করা দরকার। এভাবে ওকে তো রাস্তায় ছেড়ে যাওয়া যায় না। কলকাতায় কত রকমের মানুষের বসবাস, ওকে নষ্ট করে দেবে।

আমার কথায় বটু দূরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আমি ওকে নাড়া দিয়ে বলি, বটু, শুনছো। তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। সেই কথাটাই ঠিক মতো গুছিয়ে বলতে পারছি না—

তাহলে এখন থাক, পরে বলবে। বটু আমার হাত ধরে টানে, চল ফিরে যাই, মেয়েটা চায়ের দোকানে একলা আছে। ওর কাছে থাকলে ও কিছুটা সাহস পায়।

যে কথা বলার জন্য বটুকে এতদূর ডেকে আনা, তা না বলে আমি যাব না। ফলে, বটুকে জোর করে লঞ্চঘাটায় একটা বেঞ্চিতে নিয়ে গিয়ে বসালাম। বটু জীবনে এই প্রথম গঙ্গা দেখল। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, গঙ্গা মাইজির কুনো পাপ নেই।

আমি ঘাড় নাড়লাম। বললাম, চন্দনাও গঙ্গার মতো। ওর স্পর্শে যে আসবে সেও শুদ্ধ হয়ে উঠবে ক্রমশ।

বটু আমাকে সমর্থন করল, তুমি ঠিক বলেছ মাখনদাদা। মেয়েটা মানুষকে বড়ো টানতে পারে। ওর মধ্যে এমন একটা চিজ আছে যা আর কারোর মধ্যে নেই। গলা কাঁপিয়ে নেশায় আচ্ছন্ন মানুষের মতো কথাগুলো বলে গেল বটু। আমি ওর দেখার চোখের তারিফ করি, সরলতায় মুগ্ধ হই। এক সময় আমি ওর হাত ধরে বলেই ফেলি, বটু, চন্দনার তো কেউ নেই। তোমারও কেউ নেই। তুমি ওকে শাদি করো।

শাদি! আমার হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে বটু বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, খুব আশ্চর্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এমনটা তুমি ভাবতে পারলে, এমনটা তুমি বলতে পারলে? ছিঃ, মাখনদাদা, যাকে আমি নিজের হাতে বাঁচিয়েছি, তাকে আমি এই হাত দিয়ে কী করে সিঁদুর পরাব। আর যে পারুক আমার দ্বারা তা হবে না। তাছাড়া। বটু কাঁপতে-কাঁপতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলে, এ পাপ মাখনদাদা, এ পাপ আমার দ্বারা হবেনা। যে মানুষটা ডুবে আচে—তাকে আমি আরও ডুবিয়ে দিতে পারব না। বটু কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলছে তা আমার মাথায় ঢোকে না।

আমি ভেবেছিলাম, বটু হয়তো আমার প্রস্তাবে মানবিকতার খাতিরে রাজি

হয়ে যাবে। কিন্তু ও ওর সিদ্ধান্তে অনড়, অটুট। আমি ওকে আর বোঝানোর বৃথা চেষ্টা করলাম না। হেরে গেলে তার জের কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগে। আমি সেটুকু সময় না নিয়ে বটুকে বললাম, চলো. রোদ উঠে গিয়েছে।

চা দোকানে ফিরে এসে দেখি চন্দনা নেই। আমাদের ব্যাগটা দোকানদারের কাছে জমা দিয়ে সে কোথায় চলে গিয়েছে।

বড়ো অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে। রক্তের কেউ হারিয়ে গেলে যেমন কষ্ট হয় তেমন কষ্ট পাওয়া মুখ করে আমি বটুর দিকে তাকালাম। বটু কপালে হাত দিয়ে ভেঙে পড়া গলায় বলল, আমি জানতাম ও চলে যাবে। আমার চক্ষে যে ঘেন্না ছিল তা ও সহ্য করতে পারেনি। ছেলেমানুষের মতো আমার হাতটা ধরে ফুঁপিয়ে উঠল, চলো না মাখনদাদা, এত জলদি ও বেশি দূর যেতে পারেনি। ভালোমতন খুঁজলে অভাগীকে ঠিক খুঁজে পাব।

ওর কথার উত্তাপে আমি ঠোঁট কামড়ে বলি, চলো। পৃথিবী গোলাকার, দেখা হলেও হতে পারে!

চন্দনার পক্ষী স্বভাব। আমরা তাকে ধরে রাখতে পারলাম না। না পারার খেদটা উভয়কেই খুবলে খাচ্ছিল তখন। বটু রীতিমতন ভেঙে পড়েছে এবং নিজেকেই সে দোষী সাব্যস্ত করছে। চন্দনার চলে যাওয়ার পেছনে আমি বা বটু-কে কতটা দোষী তা নিয়ে আমি ভাবছিলাম না। আমি ভাবছিলাম—অন্য কথা। যে মেয়েটার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই সে হঠাৎ করে গেল কোথায়? যদি যায় তাহলে তার এই যাওয়া কি নিজেকে রক্ষা করার জন্য নাকি আত্মাহুতি দেবার জন্য? শেষের অনুভূতিটাই আমাকে দোষীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল। চন্দনা যদি আত্মহত্যা করে তাহলে তা আমাদের কাছে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। আমরা চেয়েছিলাম—চন্দনা বেঁচে উঠুক। কিন্তু সে কীভাবে বেঁচে উঠবে তা নিশ্চিত করার আগেই ও আমাদের পথ পরিষ্কার করে পালাল! ও হয়তো ভেবেছিল, আমরা ওর জন্য গভীরভাবে ভাবছি না, আর ভাবলেও সেই ভাবনার কোনো মূল্য নেই। চন্দনা কি নিজেকে বোঝা ভেবেছিল, নাকি আমরাও অজান্তে ওকে বোঝা ভেবেছিলাম! ও চলে যাবার পর এসব কথাই বার বার আমার মনে আসছিল। নীলিমায় আপ্লুত আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার অপরাজিতা নীল আকাশের কথা মনে পড়ল। আর নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার সহসা ওর প্রশান্ত চোখ দুটোর কথা মনে পড়ল। ওর চোখের ভাষা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। হয়তো অনাদর বা অবহেলা করেছি অলক্ষে, যা আমরা বুঝিনি—ও হয়তো বুঝেছে। না হলে যে মেয়েটা বাঁচার স্বপ্ন দেখে সে হঠাৎ করে মৃত্যুর পথটা বেছে নেবে কেন? ওর কাছে যথেষ্ট টাকা-পয়সা

ছিল না, মাত্র পাঁচ টাকায় কলকাতা শহরে কী হয়? পেট ভরে মাছ-ভাতও হয় না। মামার কাছে যদি ফিরে যায় তাহলে তো ট্রেন ভাড়া দরকার। কাছে ট্রেন ভাড়াও ছিল না। তাই আমার মনে হল চন্দনা কোথাও যায়নি, ও ধারে-কাছে কোথাও আছে। ওর কথাবার্তায় যে দৃঢ়তা দেখেছি তাতে সহজে ও আর সেই অর্থ পিশাচ মামার সঙ্গে যোগাযোগ করবে না। স্পষ্টত সে তার মায়ের মৃত্যুর জন্য মামাকে দায়ী করে। মামা যদি ওইভাবে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার মাকে খড়্গপুরে না আনত তাহলে চন্দনার কপালে এমন ঘনঘোর দুর্দশা দেখা দিত না। ওই মামাই তার যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আশা-আকাঙ্খা সব নস্যাৎ করে দিয়েছে। মামাকে সে হয়তো কোনোদিনও ক্ষমা করবে না, তাই মামার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।

লঞ্চঘাটের কাছে এসে আমি বটুর মুখের দিকে তাকালাম। বটু নিরুৎ-সাহিত গলায় বলল, চলো মাখনদাদা, ঘর আপস যাই। কলকাতা ঘোরার শখ আমার শেষ হয়ে গেছে। এখানে আসলে দুঃখ-জ্বালা সব উথলে ওঠে।

আমি বটুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, চন্দনার কী হবে তাহলে! মেয়েটাকে এভাবে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, সেটা কি ভালো দেখায়?

তাহলে কী করতে চাও তুমি?

আমি থানায় যাব।

থানায়? কেন? বটু ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকায়। থানায় যেতে ওর যে আপত্তি তা হাব-ভাবে বুঝিয়ে দেয়। চোখ কুঁচকে ও দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে, আমার চোখে চোখ রাখতেও ওর যে ভয়! আমি বটুর এত ভীতির কারণ বুঝি না। ও যেন মার্ডার কেসের আসামি—ওর ভীতিটাই এমন ধরনের।

বটু শুকনো গলায় বলল, থানা-পুলিশ করে কোনো লাভ নেই। শেষে আমরাই ঝামেলায় ফেঁসে যাব। তার চেয়ে বরং আমরা আশ-পাশটা ঘুরে দেখি। এত জলদি ও কোথায় ভাগবে?

বটুর প্রস্তাব মন্দ নয়। চন্দনার কোনো কিছুই আমরা তেমনভাবে জানি না। ওর পুরো নামটাই আমাদের জানা হয়নি। থানায় ডায়েরি করতে গেলে অন্তত ওর পুরো নামটা জানা দরকার। চেনা হওয়ার আগেই সব সম্পর্কের বেড়া কেটে ও চলে গেল।

বটুকে নিয়ে লঞ্চঘাট থেকে আমি আবার ফিরে এলাম স্টেশনে। সকালের দিকে একের পর এক দূরপাল্লার মেল-একস্‌প্রেস ট্রেন এসে থামে। স্টেশন চত্বর মেলার মতো গমগমে। এত ভিড়ে চন্দনাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আমি একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বটুকে বললাম, চন্দনা যে এভাবে পালিয়ে যাবে আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি। ওর কথা শুনে আমার মনে একবারের জন্যও সন্দেহ হয়নি।

বটু আমার কথাকে সমর্থন করল, তুমি ঠিক বলেছ, ওর বাত-চিত শুনে

আমার কিন্তু একবারের জন্যও মনে হয়নি ও ভেগে যাবে। বরং মনে হচ্ছিল ও আমাদের পিছে লেগে থাকবে। আমরা না ভাগিয়ে দিলে ও কোথাও যাবে না।

আমাদের এই ভাবাটাই ভুল হয়েছিল। চন্দনা খারাপ ঘরের মেয়ে নয়। পরিবেশটাই ওকে খারাপ করে দিয়েছিল।

কথায় কথায় সাবওয়ের ভেতর ঢুকে এলাম আমরা। যাওয়ার সময় এই আলো-আঁধারি সুপথটি ধরে যাইনি। বটু অবাক হয়ে দেখছিল চারপাশে, আমার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল চন্দনাকে। এতক্ষণের দৌড়-ঝাঁপে আমি যে ভেতরে-ভেতরে হাঁপিয়ে পড়েছিলাম তা বেশ কিছুক্ষণ পর টের পেলাম। সকাল বলেই সাবওয়েটা কিছুটা ফাঁকা-ফাঁফা, অনেকটা আমাদের ফাঁকা মনটার মতন। মনে স্বস্তি ছিল না বলেই কোনো কিছু ভালো লাগছিল না। কাউকে এমনভাবে খুঁজে বেড়ানো আমার জীবনে প্রথম নয়। মায়ের মুখে শুনেছিলাম রথ দেখতে গিয়ে আমি নাকি ছেলেবেলায় একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম, মা সেই ভিড়ের মধ্যে আমার নাম ধরে ডাকছিল উচ্চস্বরে। আজ মায়ের উদ্বেগ পরিপূর্ণ সেই সময়টার কথা রীতিমতন অনুভব করতে পারছি। চন্দনা আমার কেউ নয়, ওর সঙ্গে আমার মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়; তবু এই অল্প সময়ের মধ্যে ও একটা তীব্র আঁচড় কেটে দিয়েছে মনে যা ব্লাকবোর্ডে চকের দাগ নয়, সমতল কাচের বুকে হীরের আঁচড়। বটুর মানসিক প্রতিক্রিয়া আমি প্রথম দিকে লক্ষ করছিলাম, এখন ও অনেকটা দায়মুক্ত মানুষ। তবে চন্দনার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার পিছনে সে নিজেকে দায়ী করছে—এমন শব্দের অনুরণন আমি তার মুখ থেকে বহুবার শুনেছি।

সাবওয়ে পেরিয়ে এলাম, চোখের সামনে দিয়ে পেখম তোলা ময়ূরের মতো কত জনকেই চলে যেতে দেখলাম কিন্তু তারা কেউ-ই চন্দনা নয়, চন্দনার বয়েসি বা চন্দনার মতো দেখতে। বেশী তখন কত হবে কে জানে বটু আমাকে হুঁশে ফিরিয়ে আনল, মাখনদাদা, এভাবে খুঁজে হয়রানি হয়ে কোনো লাভ নেই। তারচে চলো হোটেলে ডাল-ভাত খেয়ে আমরা আমাদের কাজ করি।

বটুর একটা টেপ-রেকর্ডার কেনার কথা, সুযোগ এবং সময় হলে সে কলকাতা শহরটাকে ঘুরে-ফিরে দেখবে। আসার আগে আমি কথা দিয়েছিলাম চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব। আমি সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিনি। তবু, বটুর এমন মন্তব্য আমাকে বিস্মিত করে, ওকে খুব স্বার্থপর মনে হয় আমার। কেন জানি না, বটুকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ও কোনো কথা বললেই আমার ভেতরে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। বটু যেন আমার শত্রুপক্ষ। বটু আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে কি না জানি না, আর জানলেও তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

কোনো কিছু বিশেষভাবে ভাবতে গেলেই চন্দনার মুখটা মনের ভেতর ঢেউ তুলে আমাকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

ছেলেবেলায় কোনো কিছু হারিয়ে গেলে আমার দিদি শিখিয়েছিল হারা কার্তিকের নাম নিতে। হারাকার্তিকের নাম স্মরণ করলে হারানো জিনিস নাকি ফেরত পাওয়া যায়। কথাটার সত্যতা কোনোদিনও যাচাই করা হয়নি। আজ এই বিপদের দিনে দিদির কথাটা মনে পড়ল। সামান্য হাসিও পেল, কিন্তু সে হাসি নিদারুণ কষ্টের, এমনকি নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট। হাসির কোনোই রঙ থাকে না তবু আমার মনে হল হলুদ বমি করার মতো হাসিতে আমি যেন নিজেকেই ঠাট্টা করছি।

বটু উসখুস করছিল হাওড়া স্টেশন ছাড়ার জন্য, আমি তাকে নিষেধ করলাম। বটু এবার বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, আমরা বদনসিবওলা, ওকে আর খুঁজে পাব না। চলো, আমরা যে কাজে এসেছি—সে কাজে চলে যাই। তাছাড়া, হাতে সময়ও কম। এভাবে পাগলের মতো ঘুরলে কোনো ফয়দা হবে না।

আমি কঠিন চোখে বটুর দিকে তাকালাম। বটু অপ্রস্তুত গলায় বলল, ধুপ চড়ছে। এভাবে বিনা মতলব ঘুরতে আমার ভালো লাগছে না! কাল রাত থেকে নিদ নেই। তবিয়ত একেবারে চলছে না। কাল রাত থেকে ঘুম নেই—বটুর কথা তাই উড়িয়ে দিতে পারি না। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে বলেই আত্মহত্যা বিলাসী একটা মেয়েকে একলা ছেড়ে যেতেও পারি না। বয়সটা যেহেতু আবেগ-তুফানের, তাই জেদটা প্রকটভাবে চাড়া দিয়ে উঠল আমার মধ্যে।

বটু হাঁপিয়ে উঠে সিমেন্টের বেঞ্চিটাতে বসল। আমি ওর পরিশ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি এখানে বিশ্রাম করো, আমি গঙ্গার ধার-টারগুলো দেখে আসি। বলা যায় না কখন কী অঘটন ঘটে গিয়েছে। বটু ত্রস্ত গলায় বলল, আমি এখানেই থাকব। তুমি আবার আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যেও না। এখানকার পথ-ঘাট আমি কিছু চিনি না। তুমি সময় মতো ফিরে এসো কিন্তু।

প্রত্যেকটা মানুষ আগে তার নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবে। বটুর ছেলেমানুষি কথায় আমার হাসি পেল, সে হাসি গোপন করে আমি সরাসরি চলে এলাম ব্রিজের নীচে যেখানে কয়েকজন শুধু জাঙ্গিয়া আর ল্যাঙ্গোট পরে স্নান করছিল ভিড় ভাট্টা এড়িয়ে। আমি সেখানেও চন্দনার দেখা পেলাম না। চন্দনা কোথায় যেতে পারে এই চিন্তায় আমি যখন হেঁটে আসছি তখন শীতের দুপুরের লাজুক রাঙা সূর্যটা অনেকটা উপর আকাশে উঠে কোমল উষ্ণতা ছড়িয়ে দিল গঙ্গার বুকে। আমিও সেই অযাচিত উষ্ণতা জড়িয়ে নিলাম গায়ে তারপর, সোয়েটারটা খুলে ফেলে, হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম ভিজে মাটিতে। পায়ের তেলো ছুঁয়ে ঠাণ্ডা আমেজটা ধীরে ধীরে উঠে এল বুকে, আমি ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে আবার উঠে এলাম পাড়ে। মেয়েদের

স্নানের ঘাটটা আলাদা, সেখানে কয়েকজন দেহাতি মেয়ে সায়াটা বুকে গিঁট দিয়ে বিশ্রীভাবে সাবান ঘষে নাইছিল। এমন দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখা যায় না, আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে হাসির কলরোল প্রবাহিত গঙ্গার শব্দ ছাপিয়ে আমূল বিদ্ধ করল কানকে। সেখানেও আমি চন্দনাকে খুঁজে পেলাম না। মন বলল, মেয়েটা গেল কোথায়? স্টেশন চত্বরে কারোর আত্মহত্যা বা জীবননাশের কথা শুনিনি। আমার ধারণা জন্মাল, চন্দনা আত্মহত্যা করেনি। ও বেঁচে আছে। ও যেখানেই থাকুক। ওকে আমি খুঁজে বের করবই।

একটা জায়গা কেবল খুঁজতে বাকি ছিল সেটা হল হাওড়ার ব্রিজ। অত লম্বা ব্রিজ দু-বার হেঁটে এলেই হাঁপিয়ে উঠব—এই আশংকায় আমি আর ব্রিজের ধারে যাইনি। কিন্তু জেদ যখন মনটাকে পরাস্ত করেছে, আমি দ্রুত পায়ে ব্রিজের দিকে উঠে গেলাম। হাঁটতে-হাঁটতে পেঁাছে গেলাম শেষে। এখন রোদ ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে, চারদিক ভয়ানক ঝড়ো হাওয়ায় উত্তাল। মনে হচ্ছিল, ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল পুরো শহরটার উপর। সুউচ্চ অট্টালিকাগুলো মেঘের সেই রঙ গায়ে মেখে ভয়াবহ হয়ে উঠছিল যা দেখে অদ্ভুত এক শংকায় আমার ভেতরটা দুলে উঠল। এই প্রকৃতি অনেকটাই বুঝি চন্দনার মতো খামখেয়ালি। যে কোনো মুহূর্তে কেঁদে-ভাসিয়ে পুরো শহরটাকে শীত ঘুমে আপ্লুত করবে। আমি আর সময় ব্যয় না করে সেই সিমেণ্টের বেঞ্চিটার কাছে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। বটু এই শহরে নতুন, সে যদি ভয় পেয়ে অন্য কোথায় চলে যায়! ব্রিজের মাঝামাঝি আসতেই হঠাৎ আমার নজরে গেল নিম্নে প্রবাহিত, নীল জলধারার দিকে। ওই নীল জলরাশি আমাকে চন্দনার অপমানিত নীল মুখটাকে মেলে ধরল চোখের সামনে। অস্ফুটে আমি বলে উঠলাম, চন্দনা! আমার এই বাড়াবাড়ি এখন অনেকটা মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষের পর্যায়ে পড়ে। চন্দনাকে নিয়ে আমার মাত্রাতিরিক্ত চিন্তা এবং পাগলামি অজান্তে আমাকে নিজের প্রতি সন্দিহান করে তোলে। বাঁ-হাতে কপালটা চেপে আমি প্রায় উম্মাদের মতন হেঁটে আসি। গাড়ি ঘোড়ার যান্ত্রিক শব্দে আমি হাঁপিয়ে উঠি; নেশাচ্ছন্ন এলোমেলো পায়ে কোনোমতে হেঁটে আসি ফুটপাথ ধরে। আমার অস্থির চোখ তখনও চন্দনার জন্য হা-পিত্তেশ চেয়ে থাকে।

এইভাবে বেলা বেড়ে যায়, আমি ক্ষুধার্ত এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি। হাঁটা-চলার সামান্য ইচ্ছেটুকু থাকে না। ভাবছি, বটুর কাছে ফিরে গিয়ে এক সঙ্গে হোটেলে ভাত খাব। হাওড়া ব্রিজের ঢালুর মুখে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমার অস্থির চোখ হঠাৎ আবিষ্কার করল চন্দনাকে। সে দাঁড়িয়েছিল ব্রিজের এক কোণে, খুবই অনুজ্জ্বল মুখে সে একজন সন্দেহজনক লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, রোগা প্যাংলা লোকটা

ওর হাতে টাকা গ‍ুঁজে দিল একরকম জোর করে। ইতস্তত চন্দনা টাকাটা ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে সামনের দিকে তাকাল। তখনই চোখাচোখি হল ওর সঙ্গে। ও আমাকে চিনতে পেরে মুখ নামিয়ে নিল দ্রুত, শরীরে কাঁপুনি তুলে ও ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাইল। আমি লম্বা-লম্বা পা ফেলে পিছন থেকে ওর হাতটা টেনে ধরলাম, চন্দনা ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে চাইল আমার হাত। ফুঁসে ওঠা গলায় বলল, আমাকে ছেড়ে দিন।

ওর সঙ্গে সেই রোগা চিমড়ে লোকটি আমার দিকে উষ্ণ চোখে তাকাল, ওর চাহনিটা এতই কঠোর এবং অগ্নি উদ্দীপক যে ওর যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে ও আমাকে ভস্ম করে দিত। লোকটা তার কৃশ হাত দুটো নাড়িয়ে আমাকে কী যেন বোঝাতে চাইল। চন্দনাকে টেনে নিয়ে গেলাম ফুটপাথের এক কোণে, পথ-চলতি লোকেরা আমাদের এই টানা-হিঁচড়া তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করল।

চন্দনা কঁকিয়ে ওঠা গলায় বলল, আপনার দুটো পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন। এ জীবনের উপর আমার আর কোনো ভালোবাসা নেই। অনেক ভেবে দেখলাম এ-পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আমার তো ওই একটিমাত্র যোগ্যতা ছাড়া আর কোনো যোগ্যতা নেই। কাল রাতে যা ঘটেছে তা একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। দিনের আলোয় সেই স্বপ্নের কোনো দামও নেই। তাই ভালো হতে গিয়েও আমি ভালো হতে পারলাম না! তবে নিজে ডুবেছি বলে অন্যকে আমি ডোবাতে চাই না। দয়া করুন, আপনি আমার হাতটা ছেড়ে দিন। কত লোক আমাদের উপহাসের চোখে দেখছেন। আপনার কি সম্মান হারানোর কোনো ভয় নেই?

উত্তেজিত না হয়ে তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো। আমার নির্দেশ শুনে চন্দনা বেপরোয়া তাকাল। আমি ওকে গুরুত্ব না দিয়ে বললাম, নিজেকে নষ্ট করার অধিকার তোমার নেই। নিজেকে নিয়ে ছেলেখেলা অর্থহীন। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো যথেষ্ট বয়স তোমার হয়েছে। তোমার বয়সে সংসার প্রতিপালনের জন্য আমি ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রি করতাম, সন্ধেবেলায় পরিশ্রান্ত হয়ে এসেও আমার রেহাই ছিল না। আমাকে তারপরেও দু-দফা টিউশনি করতে হত। তবু আমি মনের জোর হারাইনি। মনের জোর হারিয়ে ফেললে আমি চোর-ডাকাত-গুণ্ডা বদমাশ হতাম। এবং তেমন সুযোগ আমার সামনে যথেষ্ট ছিল। নিজেকে ধরে রাখতে না পারলে নিজেকে উচ্ছন্নে দেওয়ারও তোমার কোনো অধিকার নেই।

সবার মনের জোর কি আপনার মতো? সবাই যে যার তার নিজের মতো। নিজের ব্যক্তিত্বকে দিয়ে অন্যের ব্যক্তিত্ব এবং পরিস্থিতিকে যাচাই করা ভুল। চন্দনা অশ্রুসজল চোখে নির্নিমেষ আমার দিকে তাকাল, গলায়

কাকুতি ঝরিয়ে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে আমার মতো বাঁচতে দিন। এই জীবনের উপর আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে।

তুমি যেভাবে বাঁচতে চাইছ সেটা ঠিক বাঁচা নয়। দেখ এই ভিখারিটাকে। এই ঠায় রোদে কেমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে দুটো পয়সার জন্য। ও কিন্তু তোমার মতো নোংরা পথে নেমে যায়নি। জীবনটা ওর কাছে একটা যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ও হেরে গেলেও তাতে কোনো আফশোস থাকবে না। মনে রেখো, জীবনে সবাই যে হেরে যায় তা নয়, তবে চেষ্টা যদি ঐকান্তিক আর সৎ হয় তাহলে জীবনের সব স্তরে না হলেও কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সে জয়ী হবেই।

চন্দনা মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো দাঁড়াল। ওর চোখের ধারা চক্‌চকিয়ে উঠল রোদে, কিছু বলতে গিয়ে ভয়ানক রকম কেঁপে উঠল ওর স্ফুরিত অধর। আমি লক্ষ করলাম, ওর হাতে তখনও ভাঁজ করা একটা কুড়ি টাকার নোট। হয়তো টাকাটার জন্যই রোগা-লোকটা দাঁড়িয়েছিল ব্রিজের গায়ে ঠেস দিয়ে। আমি আদেশের স্বরে বললাম, টাকাটা তোমার হাতে শোভা পায় না। তোমার এই হাত অর্থ উপার্জনের জন্য নয়। তোমার ওই হাত দুটো দিয়ে এত দিনের জঞ্জালগুলো সাফ-সুতরো করে আবার নতুন হয়ে ওঠো। ভুলে যাও তোমার দুঃখবহ দিনগুলোর কথা। এতদিন তুমি যা করেছ তা একটা ঘোরের বশে করেছ। কিছু ক্ষেত্রে তোমাকে বাধ্য করানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি তোমার কোনো দোষ দেখিনা। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তুমি যে হাত পেতে টাকাটা নিলে তা তোমার অন্যায় হয়েছে। আমার ইচ্ছে তুমি ওই ভদ্রলোকটির টাকাটা ফিরিয়ে দেবে—

ভেঙে পড়া চন্দনা চোখের জল আর ধরে রাখতে পারল না, ফুঁপিয়ে উঠে অধোনিমীলিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি বুঝতে পারলাম সংকোচে ওর গলা বুজে এসেছে। ওর কুচকুচে চোখের তারাটি জলে ধোয়া, পুরুষ্টু ভুরু ধনুকের মতো বাঁকানো, লালচে চোখের কোণে আত্মসমর্পণের চিহ্ন। চন্দনার হাতটা ছেড়ে দিতেই শাড়ির আঁচলটা মুখের কাছে আলতো তুলে ধরে উদ্‌গত কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। জলে পিচ্ছিল হয়ে উঠল ওর পানপাতা গড়ন গোলাপি আভায় উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল। টিকালো নাকের সাদা পাথর বসানো নাকছাবিটা ঝিলিক দিয়ে উঠল অপূর্ব মহিমায়। কেঁপে-কেঁপে ওঠা ঠোঁটটা শক্ত করে ও আমার দিকে আশ্রয়ের চোখে তাকাল। আমি খুব নিচু স্বরে বললাম, চলো।

রোগা লোকটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল, সহসা আমার উপস্থিতি ও ঠিক মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু দিনের বেলায় হই হুল্লোড় করলে ক্ষতি হবার আশংকায় ও সরে দাঁড়িয়েছে বুদ্ধিমানের মতো। কিন্তু, কুড়িটা টাকার মায়া ও ত্যাগ করতে পারেনি—তাই ঠায় দাঁড়িয়েছিল রোদে। টাকার

মায়ায় না চন্দনার মায়ায় তা অনুমান করা খুবই কঠিন। তবে হাব-ভাব, কথা-বার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল অপেক্ষায় ঘেমে ওঠা মানুষটা চন্দনার পূর্ব পরিচিত। না হলে এত মানুষের ভিড়ে ও কী করে চন্দনাকে চিহ্নিত করল। চন্দনার চেহারার সাবলীলতা বা আভিজাত্যপূর্ণ দৃষ্টি দেখে ওকে কেউই প্রথমে 'খারাপ মেয়ে' বলে ভাবতেই পারবে না। তাই, আমি নিশ্চিত হলাম ওই রোগা খিটখিটে লোকটিকে চন্দনা আগে থেকেই জানত। আমার মনে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা আমি চন্দনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না, তাহলে ওর কাটাঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার সমান হয়।

আমরা সেই রোগা খিটখিটে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা ঠোঁট কামড়ে বিব্রত চোখে তাকাল। পরনে ফুল প্যাণ্ট, ফুলহাতা জামার উপরে একটা নীল রঙের সোয়েটার—আমি খুব খুঁটিয়ে দেখলাম, লোকটার বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে। পায়ের সোলক্ষয়া চপ্পলটা মানুষটার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ঠিক রাগ নয়, আবার ঘৃণাও নয়—এমন একটি চোখে আমি ওর দিকে তাকালাম। মনে হল, এ অঞ্চলের ধারে-কাছে কোথাও ওর ফুটপাথ সুলভ ব্যবসা আছে। লোকটাকে কিছু বলার আগেই ও আমাকে বাঁকা হেসে প্রশ্ন করল, কততে রফা হল? নিশ্চয়ই এক পাত্তির উপরে?

তার মানে? —রাগে ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল আমার।

লোকটা দাঁত বের করে খচ্চড়ের মতো খ্যা-খ্যা করে হাসল, বাইরের মেয়েছেলে নিয়ে মজা লুটবেন আর 'পাত্তি' বোঝেন না? ন্যাকামি রাখুন। আপনার মতো অনেক মালকে আমি পার করে দিয়েছি।

বাস-ট্রামের শব্দ ছাপিয়ে কথাগুলো আমার কানে বোলতার হুল ফুটানোর জ্বালা ধরিয়ে দিল। লোকটা তখনও চোখ কুঁচকে খ্যা-খ্যা করে হাসছে। বাঁ-হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে, ডান হাতটা আমার মুখের সামনে তুলে ধরে বলল, অ জকের মতো ছেড়ে দিলাম। রাত হলে কিন্তু ছাড়তাম না। এখন বিক্রি-বাটার সময় তাই ধান্দা নষ্ট করতে চাই না। —বলেই সে আমার চিবুকটা ধরে নাড়িয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর হাতটা বজ্রমুঠিতে চেপে ধরে মোচড় দিয়ে বললাম, গোঁফে পাক ধরল অথচ এখনও শখ মিটল না! ছি; আপনার মতো ভদ্রলোকদের মুখে থুতু দিতেও লজ্জা হয়।

হাতটা ছেড়ে দিতেই লোকটা সেই লাল হয়ে যাওয়া চামড়ার দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার গলায় বলল, থুতু দিতে হয় তো ওই সুন্দরীর মুখে দিন। আমি না থাকলে ব্রিজের নীচের ছেলেগুলো ওকে গ্যাং রেপ করে ছাড়ত। ভাগ্যিস, আমি ওই সময় গাঁজা খেতে এসেছিলাম। তবু, ওর ভ্যানিটি ব্যাগটা বাঁচাতে পারেনি। হইচই করতেই ওটা ছিনিয়ে নিয়ে হারামিগুলো

পালিয়ে গেল। না হলে আর ওই মাখনের মতো হাতটা ধরতে হত না, একেবারে মর্গেই দেখা হত।

আমি আকাশ থেকে পড়ি। চন্দনার ভ্যানিটি ব্যাগটা কাঁধের উপর ঝোলান না দেখতে পেয়ে কৃতজ্ঞতার চোখে সেই রোগা খিটখিটে লোকটার দিকে তাকাই। চন্দনা কেমন কুঁকড়ে গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওকে শুধোলাম, তোমার শালটা কোথায়?

চন্দনা থতমত খেয়ে বলে, ওটা আমি ভাঁজ করে ব্যাগের মধ্যে রেখে-ছিলাম। যাওয়ার সময় ওরা হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।

তুমি ওদের চিনতে?

না, না কখনও নয়, এই প্রথম ওদের আমি দেখলাম।

তাহলে ওরা কেন তোমার পিছু নিল, তুমি কি ওদের কিছু বলেছিলে?

চন্দনা কিছুটা স্বভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলে, আপনারা চলে যাওয়ার পর দোকানে আমি বসেছিলাম। আমাকে একলা দেখে ওদের একজন আমার পাশে এসে বসল। বলল, এক ভদ্রলোক আমাকে ডাকছে। আমি ভাবলাম, হয়তো আপনিই ডাকছেন। তাই, ভারী ব্যাগটা আর সঙ্গে না নিয়ে ছেলেটার সঙ্গে গেলাম! কিছুটা গিয়েই ওরা আমার হাতটা জোর করে ধরে টেনে নিয়ে গেল ব্রিজের নীচে। আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠতেই এই লোকটাই আমাকে বাঁচাল। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগটার জন্য আমি অনেকক্ষণ কাঁদলাম। ওই ব্যাগটা মাধ্যমিক পাশ করার পর মা আমাকে গোলবাজার থেকে কিনে দিয়েছিল। মায়ের কোনো স্মৃতিই আর আমার কাছে থাকল না! আবার সজল হয়ে উঠল চন্দনার চোখ, আঁচল রগড়ে চোখটা মুছে নিয়ে বলল, আমার হাতে তখন একটা ফুটো কড়িও নেই। চা দোকানে আবার ফিরে গেলেও আপনাদের সাথে দেখা হত না। অনেকটা সময় তখন পেরিয়ে গিয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে এই লোকটায় কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিলাম। লোকটা এক্ষুনি রাজিও হয়ে গেল—

যা করেছ ভালো করেছ, এবার এর টাকাটা ফিরিয়ে দাও। নাক কান ধরো আর কোনদিন এ পথে পা দেবে না। চন্দনা চোখ রগড়ে কাঁদছিল. ওর হাতের কাচের চুড়িগুলোর শব্দ ঝংকার বিঁধে যাচ্ছিল কানে। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কেঁদো না, তোমার মায়ের কেনা ব্যাগটা আমি আর ফিরিয়ে দিতে পারব না, তবে ওই রকম একটা ব্যাগ অবশ্যই আমি তোমাকে কিনে দেব। চলো, আর দেরি করো না। বটু একলা লঞ্চঘাটের কাছে বসে আছে, আমাদের ফিরতে দেরি হলে ও আবার অন্য কোথাও চলে না যায়।

টাকাটা লোকটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমরা আবার জনস্রোতে মিশে

গেলাম। বটুর কাছে ফিরে যাওয়ার আগে আমি চন্দনাকে শুধোলাম, তোমার কি খিদে পেয়েছে ?

চন্দনা অনেকক্ষণ পরে হাসল, ওর হাসির রামধনুতে বুক ভরে গেল আমার। ঘন যানবাহনে পরিপূর্ণ রাজপথটা পেরিয়ে একটা শাড়ির দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। চন্দনা অবাক গলায় শুধোল, কই, বটুদার কাছে যাবেন না ?

আমি বললাম, যাব! কিন্তু তার আগে তোমার জন্য একটা শাড়ি কেনা দরকার। এ মাসে বেশ কিছু টাকা টি-এ পেয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল বই কেনার। কিন্তু ভেবে দেখলাম বই কেনার চেয়ে তোমার কিছু জিনিস কেনা জরুরি।

এ ভাবে এত কষ্টের টাকা নষ্ট করা উচিত নয়। চলুন, আমার তো শাড়ি আছে। দরকার হলে আমি ঠিক চেয়ে নেব।

তুমি ঠিক ততটা আমাদের আপন ভেব না।

আমার কথায় মনক্ষুন্ন হল চন্দনা। আমি ওকে সহজ করার জন্য বললাম, দুঃখ পেয়ো না। কথাটা আমি ইচ্ছের বিরুদ্ধে বলেছি। তুমি আমাদের বিশ্বাস না করলে একটা স্থায়ী অস্তানা ছেড়ে পাগলের মতো আমাদের সঙ্গে আসতে না! বলোতো, কখন একজন মানুষ আর একজন মানুষকে বিশ্বাস করে ?

মৌনী ঠোঁট কেঁপে উঠল চন্দনার, কোনো মতে বলল, এই প্রথম আমি একজন ভালো মানুষের দেখা পেলাম। বলেই সে মাথা নত করে হাত বাড়িয়ে আমার পা দুটো ছুঁলো। ও আমার কোনো বাধা-নিষেধও শুনল না।

লঞ্চঘাটে ফিরে এসে দেখলাম আমার ফোমের ব্যাগটা দু-পায়ের ফাঁকে রেখে বটু রোদের মধ্যে বসে আছে নির্বিকার। বড়ো কষ্ট হল ওকে দেখে। এই বিহারি ছেলেটার মন কালিমালিপ্ত আকাশ নয়, নীল আকাশ। ও আমাকে দেখে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, হাই তুলে আলসেমি তাড়িয়ে বলল, এত লেট হল ? আমি সেই কখন থেকে ভাবছি তোমার আবার কী হল ?

আমি বেশ জোরের সঙ্গে বললাম, যাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছি। এই দেখ, আমাদের চন্দনা আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। এবার নিশ্চয়ই তোমার আর কোনো দুঃখ নেই।

বটু মলিন হাসল। বলল, আমার দুঃখ কোনোদিন ঘুচবে না মাখন-দাদা। ভগবান আমার নসিবে শুধু দুঃখ পাঠিয়েছে। তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন আমি সেই 'বটু চা-দোকানিই' থাকব। ভগবান অঙ্গার দিয়ে আমার নসিবটা লিখেছে। ভাবছি, আজ যখন এত লেটই হল তখন একবার

নাইব। যদি গঙ্গা মাইজির দয়ায় আমার কপালের অঙ্গারের দাগগুলো সাফা হয়ে যায়।

বটুর যখন এত ইচ্ছে—আমি ব্যাগ খুলে বটুকে একটা তোয়ালে দিলাম। বটু তা কোমরে জড়িয়ে নেমে গেল ঘাটে। বটুর দেখাদেখি চন্দনা বলল, ভালো মানুষদের সাথে মিশতে গেলে নিজেকে আগে শুদ্ধ করতে হয়। আমিও যাই পাপ ধুয়ে আসি গঙ্গার জলে। এখানে তো কতবার এসেছি, এমন সুযোগ তো আর হয়নি!

বটু উঠে আসার অনেক পরে ভেজা চুলে উঠে এল চন্দনা। পাড়ে উঠে এসেই ও মিষ্টি করে হাসল। ওর চোখে-মুখে তখন মধ্য দিনের আলো, ভেজা চুলগুলো ঝেড়ে নিয়ে আড়চোখে ও একবার নিজের দিকে তাকাল। আমার কিনে দেওয়া তাঁত শাড়িটা ও খুব সুন্দর করে পরেছে। খুব হাসি-খুশি আর ঝরঝরে দেখাচ্ছিল ওকে। কে-বলবে একটু আগে ওর উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে তুমুল। গঙ্গা কি তাহলে সব পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেয়? প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঘুরছিল। মুখে হাসি ফুটলে কার না আনন্দ হয়? আমি যেন বিরাট একটা জুয়ার বোর্ডে বাজি ধরে জিতে গিয়েছি, তেমন প্রসন্ন চোখে চন্দনার দিকে তাকালাম। দেখি, চন্দনাও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওর চোখে শ্রদ্ধা! ভালোবাসা।

হোটেলের খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই দিনের আলোয় সোনা ঝরানোর রঙ ধরল। আমরা যে কাজে এসেছি তা করার তখনও সুযোগ হয়নি, তবে বটু তা নিয়ে আমাকে একটি বারও প্রশ্ন করে অপ্রস্তুত করেনি। চন্দনাকে ফিরে পেয়ে আমরা উভয়েই স্রোতের মুখের মাছের চেয়েও চঞ্চল হয়ে উঠেছি, চন্দনাও বেশ হাসি-খুশি। নিজস্ব জড়তা, সংকোচ কাটিয়ে উঠে সে এখন রীতিমতন সদাহাস্যময়ী। আমি এবং বটু দু-জনেই ওর প্রতি আকৃষ্ট। ওকে খুশি রাখার জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছিল এবং তা অত্যন্ত মার্জিত পন্থায়। আমি অনুভব করলাম, চন্দনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে কথা বলার স্পৃহাটা বেড়ে গিয়েছে। বটুরও তথৈবচ। আর যাই হোক, চন্দনা আমাদের গ্রীষ্ম খরদাহে ঝিমন্ত প্রায় অসুস্থ মনকে স্ফূর্তিবাজ করে তুলছে। কলোনিতে থাকার সময় আমি নিগূঢ়ভাবে লক্ষ করেছি, বটু মেয়েদের সম্বন্ধে বরাবর উদাসীন। অথচ, নিভৃতে, সবার অলক্ষে সে হয়তো মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে চাইত। কিন্তু কলোনি সমাজে সে সুযোগ ছিল না, ফলে ধীরে-ধীরে একটা ক্ষোভ জমা হচ্ছিল তার মনে। স্বভাবতই, সেই ক্ষোভ বা অনীহা ছিল মেয়েদের উপর। কাল রাত থেকে কী যে হল বটুও বর্ষার ব্যাঙের মতো অবিরাম বাক্যালাপে মগ্ন! যদিও চন্দনাকে আমরা কী চোখে দেখছি—তা এখনও আমাদের কারোর কাছেই স্পষ্ট নয়। বটুকে আমি যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম,

বটু তা সবিনয়ে প্রত্যাখান করেছে। ফলে, ওর মানসিক আবহাওয়া কিছুটা উন্মোচিত। আমি এখনও গভীর সমস্যায় ডুবে আছি। আমার যুবক বয়সের আবেগজর্জরিত মনটা বলছে—চন্দনার জন্য কিছু একটা করা দরকার। আর ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই শীতের সন্ধ্যা পৃথিবীকে গ্রাস করবে। তখন এই আগুনরঙা চন্দনাকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব? হাওড়া স্টেশন রাত্রি যাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নয়। যেখানে নিরাপত্তার অভাব সেখানে একটা দৃষ্টি আকর্ষণকারী যুবতী মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাব? বিভিন্ন কথার ফাঁকে এই চিন্তাটাই আমাকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল। তাই, মাঝে মাঝেই আমি ওদের আলোচনা থেকে হারিয়ে যাচ্ছিলাম। চন্দনা বুদ্ধিমতী। সে আমাকে শুধোল, আপনাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে, কিছু ভাবছেন বুঝি?

আমি হাসি দিয়ে ওর প্রশ্ন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি। ঐকান্তিক ইচ্ছে, চন্দনা যেন না বুঝতে পারে—ও আমাদের কাছে একটা সমস্যা। এমনিতে ও একলা, সহায়-সম্বলহীন। তাই ও মনে মনে যাতে দুঃখ না পায়, সেদিকে যথেষ্ট খেয়াল রেখে আমি ওর সাথে কথাবার্তা বলছি। বটুও দেখলাম, আগের তুলনায় অনেক বেশি মাপা-জোপা। চন্দনাও ওর সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে।

ট্রাম লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি ভাবছিলাম, চন্দনাকে যদি কলোনিতে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই তাহলে কেমন হয়? কিন্তু ভাবামাত্রই আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম। ওখানকার সমালোচনামুখর পরিবেশ চন্দনাকে আরও কোণঠাসা করে ফেলবে। ওর পূর্বের ইতিহাস আমি কারোর কাছে মুখ ফুটে বলতে পারব না। তাহলে সবাই ওকে খারাপ নজরে দেখবে, এবং সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে। এটা কখনওই সহনীয় নয়। আমি যদি নিজস্ব কোয়ার্টারে থাকতাম, তাহলে চন্দনাকে সেই কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে তুলতাম। কিন্তু বর্তমানে আমার কোনো কোয়ার্টার নেই। আর ওই ছোট্ট জায়গায় সহজে ঘরভাড়া পেয়ে যাব—এ বিষয়ে আমার গভীর সংশয় আছে। এসব ভাবতে-ভাবতে বটুর উপর আমার রাগ জন্মাল। আমার প্রস্তাবটা বটু যে অমনভাবে নস্যাৎ করে দেবে—এমনটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল! তাই অতল জলে পড়ে গেলাম আমি। চন্দনার জন্য একটা আশ্রয় যে করেই হোক জোগাড় করতে হবে এবং তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। কার কাছে, কোথায় রাখা যায় চন্দনাকে? মাথার চুল ছিঁড়েও কোনো সদুত্তর পাইনি। এদিকে আমি ছুটি নিয়ে আসিনি, রেস্টে এসেছি। কাজ সেরে আজ রাতের গাড়ি ধরতে পারলে ভালো হয়! তাহলে ভোরের দিকে পৌঁছে গিয়ে দশটায় অফিস ধরা যায়। বটুরও তাহলে ব্যবসা মার খায় না।

ব্যাগ থেকে ডায়রিটা বের করে আমি জানা-শোনা আত্মীয়-স্বজনদের

নামগুলোয় চোখ বুলিয়ে গেলাম। এছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না। কাজের সময় স্মৃতিভ্রষ্ট হচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ সুজিত বোসের ঠিকানাটা চোখে পড়তেই আমি আশার আলো দেখতে পেলাম। সুজিত আমার ছেলেবেলার বন্ধু, শুধু বন্ধু নয়, আমরা ছিলাম এক আত্মা এক প্রাণ। ওর বাবা ছিলেন, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের খালাসি-হেল্পার। তাঁর ইচ্ছে ছিল, সুজিত বড়ো হয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবে। তাই, উপার্জনের অর্ধেকটাই সুজিতের পিছনে ব্যয় করতে দ্বিধা করতেন না। হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার দিন ওর বাবা পোস্ট থেকে পড়ে গিয়ে মুখে রক্ত উঠে মারা গেলেন। ফার্স্ট ডিভিশনে সায়েন্স নিয়ে পাশ করা সত্ত্বেও সুজিতের আর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হল না! জয়েণ্ট এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে শিবপুর আর যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়েছিল সে। কিন্তু সংসার যার ঘাড়ে সে কী করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে? সুজিতের আর পড়া হল না। ও এখন পি অ্যাণ্ড টির টেকনিশিয়ান, থাকে খিদিরপুরের সাহামন লেনে। কলকাতায় চাকরির পরীক্ষা দিতে আসার সময় আমি ওর বাসায় অনেকদিন থেকেছি। ওর ছোটো বোন পায়েল চন্দনার বয়েসি। ওর দুষ্টুমি ভরা হাসি মুখটা আমি এখনও মনে করতে পারি। চন্দনাকে ওখানে নিয়ে গেলে কেমন হয়? মাসিমাকে বলে-কয়ে চন্দনার একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাসে মাসে যা খরচ লাগে আমি তা পাঠিয়ে দেব। এমন একটা সিদ্ধান্তে এসে আমরা বাসে উঠলাম। বাসে ওঠার আগে বটুকে সংক্ষেপে সব কিছু বলে নিলাম। বটু দেখলাম খুশি। সে উৎসাহিত হয়ে বলল, খরচ যা লাগে আধা আমি তোমাকে দেব। এটা তো শুধু তোমার একার দায়িত্ব নয়! ক্যালকাটা হাসপাতালের সামনে নেমে ট্রাম লাইন ধরে হাঁটছিলাম আমি, বটু আর চন্দনা। তখন দিনের আলো ফুরিয়ে এসে তলানিটুকুতে ঠেকেছে। রাস্তার দু-পাশে জ্বলে উঠেছে ফ্লুরোসেণ্ট ল্যাম্প, সেই আলোয় ট্রাম লাইনের ঘাসগুলোকেও দেখতে পাই আমরা। পাশাপাশি হাঁটছিলাম কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই। চন্দনা হয়তো কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে, ও থমথমে মুখে আমাদের দিকে তাকাল। বিষণ্ণতায় ভরে উঠছিল ওর মুখ। চোখের উপর হেলে পড়া চুলগুলো সরিয়ে কেমন মনমরা চোখে তাকাল। নিষ্প্রভ, শুকনো খড়খড়ে ঠোঁটের কোণটা কামড়ে অলস গতিতে হাঁটছিল সে।

আমি ওকে বললাম, চন্দনা, কথা বলছ না কেন? তোমার কি মন খারাপ?

চন্দনা মলিন হাসল, আপনারা এখন কোথায় যাচ্ছেন? কালকাতার এদিকটায় আমি কোনোদিন আসিনি।

আমরা সাহামন লেনে যাব। ওখানে সুজিত থাকে। ও আমার গ্রামের বন্ধু। খুব ভালো ছেলে। আমরা একই স্কুল থেকে একই বছরে হায়ার

সেকেন্ডারি পাশ করেছি। ও খুব মেরিটোরিয়াস। হায়ার সেকেন্ডারিতে দুটো লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিল।

আমার কথা শুনে ও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ওর টানা, গভীর চোখ দুটো আবার ছলছলিয়ে উঠল অতীত ভাবনায়। বর্ণময়, স্বপ্নিল স্কুল জীবনের কথা মনে পড়তেই বিষণ্ণ স্বরে বলল, জানেন তো আমিও ফার্স্ট ডিভিশনে মাধ্যমিক পাশ করেছিলাম। ফিজিক্যাল সায়েন্স আর ম্যাথামেটিক্সে লেটার নাম্বার পেয়েছিলাম। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল আমাকে ডাক্তারি পড়ানোর। আমাদের গ্রামে ভালো ডাক্তার নেই। বাবা বলত, চন্দনা, তুই ডাক্তার হয়ে গ্রামের লোকদের সেবা করবি। আজকাল শহুরে ডাক্তাররা গ্রামে আসতে চায় না। বাবার সেই ইচ্ছা আমি পূরণ করতে পারিনি। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দনা আফশোসের চোখে আমার দিকে তাকাল, আক্ষেপে ওর শুকনো ঠোঁটটা ভয়ানক রকম কাঁপছিল, ডাক্তারি পড়তে পারিনি, যদি একটা নার্সও হতাম তাহলেও এত আফশোস হত না। আসলে আমার কপালটা বড়ো খারাপ। যখনই সুখের মুখ দেখেছি তখনই দুঃখ এসে আমাকে ফালাফালা করে দিয়েছে। আমি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিনি! মা ছিল। সে যদি বেঁচে থাকত—তাহলে আমি আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতাম। আমার তো নাম্বার খারাপ ছিল না, আমি হয়তো নার্সিংয়ে চান্স পেয়ে যেতাম।

তুমি কোনোদিন চেষ্টা করেছিলে?

আমার প্রশ্নে চন্দনা কিছুক্ষণ ভাবল—চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। চোখের সামনে মাকে দিনের পর দিন ক্ষয়ে যেতে দেখছি, মামা-মামির অত্যাচারে মা উন্মাদিনী। দুটো ভাতের জন্য খিদেয় কতবার আমি মাকে অঝোর ধারায় কাঁদতে দেখেছি। মা বলত, তুই এখান থেকে পালিয়ে যা চন্দনা। এখানে থাকলে ওরা তোকে আমার মতো শেষ করে ফেলবে। এখনও সময় আছে—তুই পালিয়ে যা। যদি বাঁচতে চাস তো পালিয়ে যা। কিন্তু মাকে ছেড়ে আমি কোথায় পালাব? তাই একদিন খড়্গপুর স্টেশন থেকে নার্সিংয়ের ফর্ম কিনে ফিল-আপ করে পাঠালাম। ইন্টারভিউ-ও পেলাম কিন্তু তা মামার ঠিকানায়। মামা আমাকে ধমকাল, মেয়ে হয়ে তুই চাকরি করতে যাবি, কেন আমরা কি মরে গিয়েছি! মামা আমাকে ইন্টারভিউ দিতে দিল না। একদিন আমার মার্কশিট অ্যাডমিট কার্ডটা চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিল। আমি কত চেয়েছি, মামা ওগুলো আমাকে ফিরিয়ে দেয়নি। একদিন জোর করতেই, মামা আমার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে দিল। বলল, মেয়েমানুষ তুই, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড করিয়ে তুই কি মহারানি হবি। যেমন আছিস তেমন থাক। বেশি ওড়ার

চেষ্টা করলে ডানা ভেঙে ঘরে তালা আটকে রেখে দেব।

চন্দনার মামার মতো কদর্য প্রকৃতির লোক বাস্তবে যে থাকতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। ওই গৃহপালিত মানুষটি ছেলে-মেয়ের বাবা হওয়া সত্ত্বেও এত নিষ্ঠুর হল কী করে? হলই বা দূর সম্পর্কের ভাগ্নি, তার উপরে কি মানুষ হিসাবে কোনো কর্তব্য নেই? একদলা ঘৃণা আমার গলার কাছে আটকে গেল।

—আমার বন্ধু সুজিত তোমার মামার মতো নয়। ওর বাবা ছিলেন মাটির মানুষ। একলার আয়ে কত সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতেন ছোট্ট সংসারটা। কিন্তু জানই তো, ভালো মানুষ বেশি দিন থাকে না। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার দিন অ্যাকসিডেন্টে ওর বাবা মারা গেলেন। কাছা পরে খালি পায়ে পরীক্ষা দিল সুজিত। তবুও হাই ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ওর আর পড়া হল না—ওকে চাকরি নিতে হল। মা আর বোনকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে ওকে কলকাতায় চলে আসতে হল। ওর বোনটাও দারুণ মিষ্টি মেয়ে। ওর নাম পায়েল। ওর এত ঘন কালো চুল ছিল যা চোখে দেখার মতো, আমাদের গ্রামে কারোরই এমন কেশের বাহার আমি দেখিনি। আমি ওকে 'সুকেশী' বলে ডাকতাম। ও রাগে ছুটে এসে পিঠে গুমাগুম কিল মেরে পালাত। আজ প্রায় বছরখানেক হল সুজিতের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। চিঠিপত্তরও লিখি না। চলো, আজ তোমাকে ওইখানেই নিয়ে যাব। সুকেশী, মাসিমা আর সুজিতের সঙ্গে আলাপ হলে তোমার খুব ভালো লাগবে। ভালো মানুষের সান্নিধ্য লাভ ভাগ্যের ব্যাপার কি না বলো?

চন্দনা চুপচাপ আমার কথাগুলো শুনছিল, ওর চোখে-মুখে অদ্ভুত এক তন্ময়তা। নিশ্চুপ ও যেন কী ভাবছিল। আমি ওকে শুধোলাম, সুজিতের বাড়ি যেতে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?

চন্দনা সেই একই রকম গভীর অর্থবহ চোখ তুলে তাকাল, আপনারা আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানেই যাব। আমি জানি, আপনারা যা করবেন সবই আমার ভালোর জন্য।

আমি বুঝতে পারছিলাম, আমাদের এতক্ষণের সঙ্গ চন্দনাকে ওর অতীত ভুলতে সাহায্য করেছে। স্বভাবতই বিদায়ের আশংকায় ওর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আমি ওকে বোঝানোর মতো করে বললাম, আমরা তিনজন তো একসঙ্গে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। আমার চাকরি আছে, বটুর চা-দোকান। কালই আমরা কলকাতার কাজ সেরে ফিরে যাব। তুমি সুজিতের বাড়িতে থাকবে। ওখানে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। মাসিমার অমায়িক ব্যবহার, সুকেশীর হাসিঠাট্টা, আ সুজিতের অভিভাবকত্ব তোমাকে সবকিছু ভুলিয়ে দেবে। তুমি আবার নতুন জীবন ফিরে পাবে। আমরা

মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখে যাব। কী বলো?

এবার ছলছলিয়ে উঠল চন্দনার চোখ, ওরা যদি আমাকে না আশ্রয় দেয়, তাহলে? আমি তো নোংরা মেয়ে, সব শুনে কি ওরা আমাকে আশ্রয় দেবে?

চন্দনা নিজের ক্ষত নিয়ে ভাবছিল। ওর অতীত ওকে কিছুতেই নিষ্কৃতি দিচ্ছিল না। তীব্র টানাপোড়নে চন্দনাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তখন!

আমি ওকে সাহস দিয়ে বললাম, মানুষ মাত্রই ভুল করে, পরে যদি সে তার নিজের ভুল শুধরে নেয় তাহলে দোষ কোথায়?

চন্দনা অস্ফুটে বলল, সাপ খোলস ছাড়লেও সাপ থেকে যায়। আমি যদি সাপের মতো নিজেকে শোধরাতে না পারি?

তুমি পারবে বলেই আমরা তোমার হাত ধরেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি তোমার শুঁয়োপোকার জীবন থেকে একদিন প্রজাপতি হয়ে সবার নজর কাড়বে।

আপনি আমাকে এত বিশ্বাস করেন? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল চন্দনা, ওরা যদি আমাকে আশ্রয় না দেয় তাহলে? যদি দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়?

এত বড়ো পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও তোমার একটা জায়গা হবে। আমি, বটু বেঁচে থাকলে তোমাকে আর ও পথে নামতে হবে না।

এবার হার স্বীকার করে লজ্জায় মাথা নামিয়ে নেয় চন্দনা। তার এমন ধরনের প্রশ্ন করা উচিত হয়েছে কিনা ভেবে দেখে না।

বড়ো রাস্তা পেরিয়ে আমরা গলির ভেতরে ঢুকে আসি। প্রতিটা ল্যাম্প পোস্টে বাতি আছে তবু জায়গাটা কেমন আলোকহীন। দু-একটা উদ্ভট মার্কা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল রাস্তায়। দু-পাশে নোংরা আবর্জনার স্তূপ। একটা ছোট্ট ড্রেন বস্তিটার পাশ দিয়ে চলে গেছে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে।

বাতাসে স্যাঁতসেতে ভাব। একটা বেদি বাঁধানো চারা অশ্বত্থের তলায় এসে দাঁড়ালাম। চন্দনা হাতজোড় করে সিঁদুর মাখানো পাথরটাকে প্রণাম করল ভক্তিভরে। তার দেখাদেখি বটুও হাতজড়ো করে বিড়বিড়িয়ে উঠল! আমি একমুখ হেসে বটুকে শুধোলাম, ঠাকুরের কাছে কী বললে? বটু অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল, 'চন্দনাকে শান্তি দাও'—ভগবানের কাছে এই আমি প্রার্থনা করলাম। আর বললাম, ভোলাবাবা, চন্দনার সব দুঃখ-তকলিফ তুমি আমায় দাও।

এই কথা শুনে শিউরে উঠল চন্দনা, কান্না-কান্না মুখ করে সে বলল, কেন বললেন এই কথা। এভাবে কেন নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছেন? যদি সতি সত্যি হয় তাহলে আমি মুখ দেখাব কেমন করে?

বটু গলা ঝেড়ে হাসল, ডরো মাত। ভগমান বয়রা-আন্ধা হয়ে গিয়েছে॥

ও যদি আমার কথা শুনত তাহলে আমাকে আর হাজার আদমির জুঠো কাপ্‌ডিস ধুতে হত না। মুলুক ছেড়ে বেমুলুকে এসে থাকতে হত না। বস্তি এলাকায় হাওয়া-বাতাস দামাল শরীরে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে খেলায় মাততে পারে না। তবু দেখলাম অশ্বত্থ পাতায় তিরি-তিরি কাঁপনি। এই কাঁপুনিটা ধীরে ধীরে আমার বুকেও ছড়িয়ে পড়ল। গলি যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটা গ্রাম্য কায়দায় মনোহারি দোকান। চায়ের দোকানে মজলিস বসিয়েছে উঠতি বয়সের ছোকরারা। তারা চোরা চোখে চন্দনার দিকে তাকিয়ে। সঙ্গে আমরা আছি বলে সাহস করে কটু মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে পারছে না। তবে তারা খুব আগ্রহ ভরে চন্দনাকে দেখছিল। একজন অতি উৎসাহী দর্শনলোভী যুবক সিগারেট কেনার অজুহাতে চা দোকানের বেঞ্চি ছেড়ে কলার ফুলিয়ে উঠে এল সামনে। সিগারেট কিনে, জ্বলন্ত দাঁড়িতে তা ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়াটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তৃষ্ণার্ত শরীরে আবার ঢুকে গেল চা দোকানে। আমি দেখলাম, চন্দনা থরথর করে কাঁপছে। তাঁতশাড়ির আঁচলটা ওর মুখের কাছে ধরা। আর চারা অশ্বত্থের পাতাগুলো নড়ছে, তাতে অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। শীতের হাওয়ায় সুচ বেঁধানো কষ্ট। চন্দনার গায়ে শাল নেই, চাদরও নেই। শীতবস্ত্রহীন শরীরটা কেমন জড়োসড়ো হয়ে উঠছিল মাঝে-মাঝে। দেখে খুব খারাপ লাগল। একটা লেডিজ শাল দেড়শো-দুশোর কম হবে না। আমার শাল কিনে দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না, কিন্তু ইচ্ছে করলেই একটা খদ্দরের ফুলছাপা চাদর আমি কিনে দিতে পারতাম। দোকানে শাড়ি কেনার সময় চাদর কেনার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ছিলাম আর চন্দনাও আমাকে মনে করিয়ে দেয়নি।

আমার গায়ে সোয়েটার এবং চাদর ছিল। স্বার্থপরের মতো দুটোই গায়ে চাপিয়ে নিয়েছি আমি। এখন খারাপ লাগতেই শালটা চন্দনার হাতে ধরিয়ে দিলাম। ও কিছুতেই নেবে না। আমি ওকে ধমকালাম, নাও, না তোমার কষ্ট হবে।

আপনি তাহলে কী গায়ে দেবেন ?

আমার তো সোয়েটার আছে। এমন কিছু শীত নয় যে শাল-সোয়েটার দুটোই গায়ে দিতে হবে।

আমার জোরের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হল চন্দনা। শালটা গায়ে জড়িয়ে নিতেই ওকে সরস্বতীর মতো দেখাল। মনোহারি দোকানটা পাশ কাটিয়ে আমরা একটা টাইমকলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। তখনও সরু সুতোর মতো জল পড়ছিল নলে। মেয়েরা জলের আশায় দাঁড়িয়ে ছিল গোল হয়ে। সুজিতের বাসায় যাওয়ার রাস্তাটা ওই নলের পাশ দিয়ে। পথটা এতই সরু যে দুজন পাশাপাশি যাওয়া যাবে না, তাহলে চামড়া

ছড়ে যাবে দু-পাশের নোনা ধরা দেওয়ালে। নলের পাশেই একটা ইলেকট্রিক থাম। তার মাথার উপরে কোনো বাতি নেই। যার জন্য জায়গাটা একটু অন্ধকার। আমি স্যাঁতসেতে জায়গা পেরিয়ে এসে, চন্দনাকে ডাকলাম, দেখে-শুনে পার হও। পড়ে গেলে একদম নালীর মধ্যে পড়ে যাবে। অন্য জায়গায় হলে আমি চন্দনার হাতটা ধরে নালীটা পার করে দিতাম, কিন্তু এতগুলো উদগ্রীব মহিলার চোখের সামনে আমার খুব সংকোচ বোধ হল। চন্দনা নিজেই শাড়ি গুছিয়ে সতর্কভঙ্গিতে পেরিয়ে এল নালিটা। আমি বললাম, ভেতরে চলে এসো। ওই তো ওই টালির ঘরটা সুজিতের। ভাগ্য ভালো, ঘরে আলো জ্বলছে। একটা বর্গাকার জায়গার চারধারে গোটা দশেক ছোটো-ছোটো টালির ঘর। ঘরগুলো সব অদ্ভুত দেখতে, এমন বিচিত্র ঢঙের ঘর কলকাতা শহরে আছে ভাবলে অবাক হতে হয়। দশটা ঘরে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জনের বাস। জলের জন্য আলাদা কোনো নল নেই, মেন পাইপ থেকে সরু একটা পাইপ এনে তিন-চার জায়গায় ট্যাপ লাগানো হয়েছে। একেবারে উত্তরধারে পরপর তিনখানা বাথরুম। সব মিলিয়ে এই ঘেরা জায়গাটা সব ঋতুতেই স্যাঁতসেতে, আলো-বাতাস সব সময় ঢোকে না। চাকরির শুরু থেকেই সুজিত এখানে ভাড়ায় আছে, ওর নিম্ন আয়ে এছাড়া ভালো ঘর ও আশা করে না।

মাঝখানে যে উঠোন মতো জায়গাটা আছে সেখানে এসে আমরা তিনজনেই থমকে দাঁড়ালাম। এখান থেকে ঘাড় কাত করে আকাশ দেখলে উঁচু-উঁচু বাড়িগুলোর শরীর এড়িয়ে আকাশটাকে দেখা যায়। তাই জায়গাটা স্যাঁতসেতে হলেও চাঁদের আলো পড়ে রাত্রিবেলায়। গরমের সময় আমি দেখেছি—অনেকেই খাটিয়া পেতে খোলা আকাশের নীচে রাতটা কাটিয়ে দেয়।

জায়গাটা যে বটুর একদম পছন্দ নয় তা আমি ওর চোখ-মুখ দেখে অনুমান করলাম। যারা জীবনভর খোলামেলায় বড়ো হয়েছে, তাদের এমন গুমোট, দমবন্ধ করা পরিবেশ কিছুতেই ভালো লাগে না। চন্দনার বেশিটা সময় কেটেছে গ্রামের মাটির ঘরে, সেখানে দেওয়াল চাপা, শ্বাসরোধকারী বাতাস ছিল না। তাই, আমি ওর মানসিক অবস্থাটা যাচাই করার চেষ্টা করলাম, জায়গাটা কেমন লাগছে তোমার?

ভালোই তো! চন্দনার পাতলা ঠোঁটে মলিন হাসির ছোঁয়া, যেখানে মানুষ থাকে তা কি কখনও খারাপ হতে পারে?

ছোটো-ছোটো ঘরগুলোয় লালচে আলোর ছাড়াছাড়ি। শীতকালে দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে একটা কোলা ব্যাঙ কটর কটর করে ডেকে উঠল। তার ডাক থামতেই শাঁখে ফুঁ দিল সাদা শাড়ি পরা এক ভদ্রমহিলা। তিনি শাঁখে ফুঁ দিতে দিতে অবাক চোখে আমাদের দিকে তাকালেন। খাটিয়ায়

পা ঝুলিয়ে বসে ফুল ভল্যুমে বিবিধ ভারতী শুনছিল চন্দনার বয়েসি একটা মেয়ে তার নাকের পাটায় দুটো নাকছাবি, হাত ভর্তি কাচের চুড়ি, পায়ে তোড়া, আর কপালে খয়েরি রঙের ভেলভেটের একটা টিপ। তার কোলের উপর স্টিলের থালায় মুশুরি ডাল, সে পাথর বাছা মনোযোগী চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকাল। প্রায় বছর খানিক এদিকে আমি আসিনি তাই সব নতুন-নতুন লাগছিল। আমার নজরে গেল দেওয়াল ফুঁড়ে একটা নিমগাছ উঠছে আকাশের দিকে। গাছটার স্পর্ধা দেখে অবাক হতে হয়। ওই গাছটার সাথে আমি যেন চন্দনার একটা সম্পর্ক খুঁজে পেলাম। মনে মনে হাসিও পেল। চন্দনা তা খেয়াল করেছিল। শুধোল, হাসছেন কেন?

চট করে কোনো উত্তর আমার মনে এল না। ফাটা দেয়ালের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললাম, ওই গাছটাকে দেখো কেমন বেঁচে আছে!



সাত

শঙ্খ যেখানেই বাজুক না কেন তার শব্দ মাধুর্য বজায় রাখে। পরপর তিনবার শাঁখের আওয়াজ কানে যেতেই চন্দনা অভ্যস্ত কায়দায় হাতটা কপালে ছুঁইয়ে ভাব-গম্ভীর চেহারায় দূরের সেই গাছটার দিকে তাকাল। কলকাতা শহরে গাছের রং-ও সবুজ হয়, শুধু ফারাক, মার্কারির আলোয় ধুলো লাগা পাতাগুলো স্বকীয়তা হারিয়ে ধূসর এবং মলিন। রাতের কলকাতার যানবাহনের শব্দ কমে এলে মৃত্তিকার বুকের স্পন্দন স্থিতু হয়ে যায়। চন্দনাও সেই স্পন্দনহীন, অসহায় সর্বংসহা মৃত্তিকার মতো ঘাড় নিচু করে সুজিতদের বাসাবাড়িতে ঢুকে এল। তিনটে মানুষের পায়ের শব্দে, শরীরের উত্তাপে সুজিতদের ছোট্ট সাজানো-গোছানো ঘরটা যেন শব্দ করে হেসে উঠে অভ্যর্থনা জানাল আমাদের। সুজিত শুয়েছিল ছোট একটা খাটের উপর। ওর গায়ে একটা সুতির চাদর। জামা পরেনি, শুধু গেঞ্জি গায়ে শুয়ে শুয়ে 'আনা কারেনিনা' পড়ছিল। আমাদের কথাবার্তায় ও ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেই অপ্রস্তুত চোখে তাকাল। আমাকে দেখতে পেয়ে বসন্তের কোকিলের মতো শিস দিয়ে উঠল আনন্দে, বাব্বা! আজ যে সূর্য কোন্‌দিকে উঠেছিল কে জানে। তা, এতদিন পরে মনে পড়ল আমাদের? আয়, ঘরে আয়।

আমরা ঘরেই ছিলাম অতএব ঘরে ঢোকার কোনও প্রশ্নই আসে না। সুজিত খাট থেকে লাফিয়ে নেমে আমার কাছে ছুটে এল, তারপর দু-হাত বাড়িয়ে পতঙ্গভুক গাছের মতো আমাকে টেনে নিল বুকে। ওর এই উষ্ণ অভ্যর্থনায় মোহিত হয়ে গেলাম আমি, আমার অসাড় হাত দুটো অনেকক্ষণ ছুঁয়ে থাকল ওকে। বটু এবং চন্দনা দু-জনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে, আমাদের রকম-সকম দেখে ওরা একটু অবাক।

আমি সুজিতকে নাড়া দিয়ে বললাম, আমি কিন্তু এখানে একা আসিনি। ওই দেখ কারা এসেছে।

সুজিত প্রথমে বটুর দিকে তাকাল, তারপর চন্দনার দিকে নজর পড়তেই

সন্দেহজনক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। ও কী অনুমান করেছে—আমি তা জানি—তাই সর্বাগ্রে ওর ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে বললাম, ওর নাম চন্দনা। খুব ভালো মেয়ে। এইটুকু বলেই আমি যে আর কী বলব কথা খুঁজে পেলাম না। অপ্রস্তুত চন্দনার সোজা মাথা ঝুঁকে গেল মেঝের দিকে। লজ্জা-সংকোচে লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। এই তীব্র শীতেও আমি লক্ষ্য করলাম ঘর্মাক্ত, তৈলাক্ত হয়ে উঠছিল ওর মুখটা। কী একটা ছেলেমানুষি করে ফেলায় আমার মধ্যে তখন অনুশোচনা। সুজিত বুদ্ধিমান ছেলে, সে খুব দ্রুততায় ঘটনাটাকে সহজ করে দিল। চন্দনার দিকে তাকিয়ে একমুখ হেসে বলল, আপনারা বসুন। আমি মাকে ডেকে আনি।

চন্দনা শাড়ি গুছিয়ে জড়োসড়ো হয়ে খাটের উপর বসল। বটু তার পাশে। আমি একটা চেয়ার টেনে ওদের মুখোমুখি বসলাম।

আট-বাই-দশ হাত মাপের ঘরটায় একটা খাট পাতার পর যেটুকু জায়গা আছে, তা তিনটে মানুষের থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়। চন্দনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের চারদিকটা দেখছিল। নতুন জায়গা বলেই এক ধরনের আড়ষ্টতায় ও কিছুটা গোটানো। বটু সেই তখন থেকে একটা কথাও বলছে না। সম্ভবত, দীর্ঘ কয়েক বছর পরে সে নিজের দোকান ঘর ছেড়ে অন্যের ঘরে এল। সেই জন্যই হয়তো ও আরও বেশি মৌনী।

আমি কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বটুকে জিজ্ঞাসা করলাম, বল তো বটু, এই ঘরটার ভাড়া কত?

বটু বলল, আইডিয়া নেই।

আমি বললাম, মাত্র ষাট টাকা! কলকাতায় এমন সস্তায় ঘর পাওয়া যায় ভাবতে পার? বটুর যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না আমার কথাটা। আমি বললাম, এখানে আগে একজন ভাড়া থাকতেন। সেই ভদ্রলোকও পি অ্যান্ড টির স্টাফ। সুজিত সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে ঘরটা নিয়েছে। তাই উনি যা ভাড়া দিতেন সুজিতও তাই দেয়। বাড়ির মালিকও তাই মেনে নিয়েছে।

পাশের ঘরের ভাড়াটে তোলা-উনুনে আঁচ ধরিয়ে সেই উঠোন মতো ইট পাতা জায়গায় আঁচটা রেখে পাখার বাতাস করছে ক্রমাগত। শীতের ভারী বাতাসে কুয়াশার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে ধোঁয়া। তার কিছুটা এসে সুজিতদের ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। জানলা বন্ধ বলে ধোঁয়াগুলো বেরোতে পারছে না। একেবারে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ছে চোখে। চন্দনা আঁচলে চোখ ঢেকে বসে আছে কষ্ট-কষ্ট মুখ করে। আমি উঠে গিয়ে জানলাগুলো খুলে দিতেই পিচ-রাস্তার মার্কারির আলো এসে পড়ল ঘরে। নিমেষে ঘরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল আমাদের চোখের সামনে। আমি দেখলাম,—জানলার ওপিঠে মস্ত একটা নালী, তার কালো কুৎসিত জলে ছায়া পড়েছে চাঁদের। নালীটার গা ঘেঁষে একটা পার্ক, এই শীতে তখনও রবারের বল নিয়ে পেটাপেটি

খেলছিল হাফ প্যান্ট পরা ছেলেগুলো। তাদের চেহারায় কোনো আভিজাত্য নেই, বরং দুর্দশার চিহ্ন। ওদের দেখে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় রবারের বল কেনার পয়সা না থাকায় আমি আর সুজিত চুরি করে পেড়ে এনেছিলাম ঘোষেদের বাগান থেকে বাতাবি লেবু। সেই সবুজ বাতাবি লেবু আমাদের খুদে-খুদে পায়ের আঘাতে সবুজ সজীবতা হারিয়ে ক্রমশ গোলাকার থেকে কেমন বিদ্ঘুটে একটা রূপ নিয়েছিল—তা আর এখন সঠিক মনে করতে পারি না। তবে, এটুকু আমার মনে আছে—যখন ক্লান্ত, ঘেমো শরীরে ঘরে ফিরতাম—তখন সারা গায়ে লেগে থাকত লেবু পাতার গন্ধ। মা বলত, লেবুভূত। দিদি আমার বুকে নাক ঘষে বলত, আয় তোকে শরবৎ বানিয়ে খাই।

সুজিত এল মাসিমাকে নিয়ে। প্রায় এক বছর পরে মাসিমাকে দেখে আমার কষ্ট পাওয়াটা বেড়ে গেল। এমনিতে মাসিমা চিরকালের রোগা, অনেকদিন পরে দেখে মনে হল, মাসিমা যেন এই মাঝবয়সে বুড়িয়ে গিয়েছেন শোকে-দুঃখে। পাথর-খোদাই মুখমণ্ডলে চিন্তার বলিরেখা। দুধসাদা রঙ, চেহারায় তামাটে রঙের সমাবেশ। চোখের নীচে মেঘকালো আঁধার। চেহারায় বিষণ্ণ শিথিলতার ছোঁয়া।

আমাকে অনেকদিন পরে দেখে প্রচণ্ড খুশি হলেন মাসিমা, যাখন তুমি এসেছ খুব ভালো হয়েছে! সুজিত প্রায়ই তোমার কথা বলে। কিন্তু তুমি তো যাওয়ার সময় ঠিকানা দিয়ে যাওনি, তাই তোমাকে আর চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনি। তা বলো, কেমন আছ বাবা? মাঝে-মধ্যে চিঠিও তো দিতে পার!

এই অভিযোগটি আমার পরিচিতরা আমার বিরুদ্ধে করে থাকেন। মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া তখন আমার কোনও পথ থাকে না। কুঁড়েমি আর আলসেমিতে আমার প্রবাস জীবন কানায়-কানায় ভরে গিয়েছে। বাড়িতে চিঠি লিখতে গিয়ে কলম কামড়াই। দু-লাইন লেখার পরে কোনো কিছু আর মাথায় আসে না। 'আমি ভালো আছি, তোমরা ভালো থেকো'—এর বেশি আর কলম থেকে বেরোয় না। এই একটি কারণে আমার বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে অসামাজিক বলে, আমি তা মুখ বুজে সহ্য করে নিই।

এবার মাসিমা চন্দনার দিকে হাসি-হাসি মুখ করে তাকালেন। প্রশ্ন করার আগেই চন্দনা গিয়ে মাসিমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ওর এই শিষ্টাচার মুগ্ধ করল আমাকে। মাসিমা ওর ঘন রেশম কালো চুলে স্নেহের হাত ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন, সুখী হও মা। তারপর, আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তা বাবা, মেয়েটিকে তো চিনলাম না? এ কে হয় তোমার?

চন্দনা আমার কে হয় এই প্রশ্নটা আমার কাছে সব চাইতে কঠিন প্রশ্ন।

এই একই প্রশ্ন নিজেকে আমি বহুবার করেছি। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি। একটি অসহায় মেয়েকে তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে আত্মীয় বলে দাবি করা অন্যায়। আর আমি দাবি করলে তা মেনে নেবেই বা কেন? মাসিমা উত্তরের জন্য অপেক্ষমাণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, চন্দনা আমার পরিচিতা। আপাতত এইটুকুই শুনুন, পরে আমি আপনাকে বিস্তারিত বলব।

মাসিমা সন্দিহান চোখে তাকালেন, শুকনো ঢোক গিলে বললেন, তোমাদের খুবই পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নাও। আমি তোমাদের চা তৈরি করে দিচ্ছি।

মাসিমা চলে যেতেই আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এখানে আসার পর থেকেই চন্দনা নিজেকে বড়ো একলা মনে করছিল। বন্ধ ঘরে বটুও হাঁপিয়ে উঠেছিল। ট্যাপ্‌কলের কাছে এসে বটু আমাকে ফিস্‌ফিসান গলায় বলল, আজ রাতটা কী এখানে কাটাবে মাখন দাদা?

আমি বললাম, তাছাড়া আর তো কোনো উপায়ও নেই। সুজিত আর মাসিমাকে আমি আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব বলব। তারপর, ওরা যদি ওকে রাখতে রাজি হয়—তাহলে কাল রাতের ট্রেনে ফিরে যাব। আমারও তো ছুটি নেই, সোমবার ফার্স্ট আওয়ারে জয়েন করার কথা ছিল।

বটু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, কী ঝামেলায় ফেঁসে গেলাম বলো তো?

বটুর এই দীর্ঘশ্বাস চন্দনার উদ্দেশ্যে। ও এত অধৈর্য হয়ে পড়ছে কেন তা আমি সঠিক অনুমান করতে পারলাম না। তবে, বটুকে আমি খারাপ চোখে দেখিনি, তাই কাঁটা গেলার যন্ত্রণা নিয়ে চুপ করে থাকলাম।

বটু আশংকা প্রকাশ করে বলল, দোকানঘর ফাঁকা ছেড়ে এসেছি। তুমি তো জানো—জালাল আমার পিছে লেগে আছে। চোর-চাপাটি হলে আমি একেবারে ফেঁসে যাব। বিদেশ-বিভুঁইয়ে ধান্দা বন্ধ হলে আমি খাব কী?

বটুর এই উদ্বেগ প্রকাশ অমূলক নয়। হাসান মাস্টারমশাই-এর ছেলে ওর পিছনে এঁটুলির মতো লেগে আছে। বটুর শ্রীবৃদ্ধি, বাড়-বাড়ন্ত জালালের কাছে অসহ্য। ও চায় বসে-বসে ঠ্যাং-এর উপর ঠ্যাং তুলে খেতে। খবরদারি করতে।

চা তৈরি হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। সুজিত এসে ডাকতেই আমি আর বটু মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে গেলাম। চন্দনা খাটের উপর পা তুলে বসেছে। আমার শালটা ওর গায়ে। মাসিমা ওকে একটা অরগ্যান্ডি ছাপা শাড়ি দিয়েছেন পরার জন্য। শাড়িটা পরতেই ওকে অনেকটা মোটা-মোটা দেখাচ্ছিল। চোখে-মুখে জল দিয়ে আসার দরুণ কিছুটা চনমনে দেখাচ্ছিল চন্দনাকে। আমি লক্ষ্য করলাম, ওর ভেতরে এখন আর কোনও সংকোচ বা জড়তা নেই। ও খুব সহজ ভঙ্গিতে মাসিমার সঙ্গে কথা বলছে। ওর এই

স্বাভাবিকত্ব দেখে আমার মনে হল, মেয়েরা হল জলের মতো—যেখানে যাবে সেখানেই মানিয়ে নেবে নিজেকে। এই সহজাত গুণের জন্য মেয়েরা হল আকাশ-বাতাস-সমুদ্র।

চা-পর্ব চুকতেই সুজিতকে নিয়ে আমি আর বটু বেরিয়ে এলাম বাইরে। অনেকক্ষণ ধূমপান করা হয়নি, ওই এক বদ নেশায় ভেতরটা উশখুশ করছিল আমার। বাইরে আসতেই সুজিত আমাকে টেনে নিয়ে গেল সিগারেটের দোকানে, হাত ধরে বলল, ব্যাপারটা কী বলত? চন্দনা মেয়েটি কে, ওর সাথে তোর কী সম্পর্ক?

আমি সুজিতকে গতরাতের ঘটনা থেকে শুরু করে সাহামন লেনে আসার আগ পর্যন্ত সব কিছুই খুলে বললাম। সব শুনে সুজিত আর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে বলল, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সব শুনে অবাকই লাগছে! তা, চন্দনাকে নিয়ে তোরা কী করবি ঠিক করেছিস?

সুজিতের প্রশ্নে আমি শক্ত করে ওর হাত দুটো চেপে ধরলাম, নিঃস্ব গলায় বললাম, কিছুই ভাবতে পারছি না, তাই তোর কাছে ছুটে এসেছি। কলকাতা শহরে আমার বন্ধুর অভাব নেই, কিন্তু কারোর কাছে যেতে ভরসা পেলাম না। ওরা যদি চন্দনার কোনও অমর্যাদা করে তাহলে সেটাই হবে আমার পরাজয়। তুই তো জানিস সুজিত, আমি কোনোদিন চাপের কাছে হার মানিনি। চন্দনার ব্যাপারটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চন্দনা আবার তার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে, এবং সেই দুর্লভ কোয়ালিটি ওর মধ্যে আছে। তুই নিশ্চয়ই খেয়াল করে থাকবি ওর চোখ দুটো কেমন গভীর আত্মপ্রত্যয়ী। এমন মেয়েরা সমাজের পক্ষে পচনশীল বস্তু নয়, এরাই একদিন খাড়া দাঁড়িয়ে দশটা অসহায়, নিপীড়িত মেয়েকে বাঁচার পথ করে দেবে। তাই তোর কাছে ছুটে এলাম, তুই চন্দনাকে আশ্রয় দে। ও তোর বাড়িতে কাজের মেয়ের মতো থাকবে। মাসিমার তো শরীর খারাপ। এ সময় চন্দনা থাকলে তোদের বিশেষ উপকার হবে।

সুজিত থম মেরে কিছুক্ষণ ভাবল। আকাশের দিকে মুখ করে মাথার চুল চেপে বলল, এ নিয়ে আমাকে একটু ভাবতে দে। এখানে আমার একার মতামতের কোনও মূল্য নেই। মা আছে, মায়ের অনুমতিটাও বিশেষ দরকার…

তা তো বটেই। আশার সামান্য আলো দেখে উৎসাহিত হয়ে আমি বলি, চন্দনা মেয়ে হিসেবে সুপাত্র। পরিবেশ ওকে নষ্ট করে দিচ্ছিল। এই দুঃসময়ে আমরা যদি এর পাশে না দাঁড়াই তাহলে ও বেচারি কোথায় যাবে বল তো?

সে তো ঠিক, কিন্তু মায়ের পারমিশান ছাড়া তো আমি কিছু করতে পারি না। আর সেটা করাও শোভন নয়।

শীতকালের রাত আটটায় বস্তির রোগা রাস্তাগুলোও ফাঁকা-ফাঁকা। তার উপরে আজ কুয়াশা পড়েছে পুরু হয়ে, কোথায় যেন বৃষ্টি হওয়ায় আর্দ্র বাতাস ছুটে আসছিল গলিতে। সেই শানবাঁধানো অশ্বত্থতলায় বসে আমি সুজিতকে বললাম, আমরা সবাই মিলে মাসিমাকে বোঝাব। আমি জানি বোঝালে মাসিমা অবুঝ হবে না।

আমারও তাই বিশ্বাস। চল এবার ওঠা যাক। যেমন হিম পড়ছে তাতে পুরো মাথাটাই ভিজে যাবে। সুজিতের দেখাদেখি আমি আর বটু উঠে দাঁড়ালাম। কিছুটা হেঁটে এসেই বটু সুজিতের হাতটা ধরে কাতর স্বরে বলল, সুজিতদাদা, মেয়েটা বড়ো দুঃখী গো। খেয়াল রেখো—ও যেন সুখী হয়।

মাসীমা দীর্ঘদিন শহরে থাকলেও তাঁর মনে গ্রামের সেই স্পর্শকাতর মরমি ছোঁয়াটা রয়ে গেছে। সব শুনে তিনি অশ্রুসজল চোখে উঠে গেলেন চন্দনার কাছে, ওর গায়ে-মাথায়-পিঠে আদরের হাত বুলিয়ে অঝোরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অকস্মাৎ। মাসিমাকে সশব্দে কেঁদে উঠতে দেখে বটু চোখে হাত চাপা দিয়ে বাইরের সেই ইট পাতা উঠোনটাতে চলে গেল। মাসিমার ছোঁয়াচে কান্নায় চন্দনা ভেঙে পড়া গলায় বলল, আপনি কাঁদবেন না, আপনি কাঁদলে আমার পক্ষে কি চোখের জল আটকে রাখা সম্ভব? চোখ মুছুন মাসিমা। আপনাদের হাসতে দেখলে আমি আবার নতুন করে হাসতে পারব।

চন্দনার কথায় চোখ মুছে নিলেন মাসিমা। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মাখন, কই তুমি তো একবার পায়েলের কথা শুধোলে না?

আমি আকাশ থেকে পড়ি, নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে হয়। এ সংসারে পায়েল হল সবার চোখের মণি। এসে থেকে আমি একবারও তার নামটা ভুল করেও উচ্চারণ করিনি। অথচ, গ্রামে থাকতে পায়েল প্রতি বছরই ভাইফোঁটা দিত আমাকে, প্যান্টের পিসটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলত, আশীর্বাদ কর আমি যেন একশো বছর বেঁচে থাকি। জান তো মাখনদা, আমার না খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

আমি রগড় করতাম, একশো বছর কেন, তোর আয়ু কমসে কম দেড়শো বছর। থুরথুড়ে বুড়ি হয়ে শন চুলে তুই ঘুরে বেড়াবি। নাতি-নাতনির দল মৌচাকের মতো ঘিরে থাকবে তোকে, 'ঠাম্মা আমাকে একটা লজেন কিনে দাও না—' বলে আব্দার করবে। তুই খুঁট্ থেকে পয়সা খুলে পচা চুনারির দোকান থেকে টিকটিকি লজেন্স কিনে দিবি। হল তো!

আজ পাঁচ বছর পায়েল আমাকে ভাইফোঁটা দেয়নি, আমি পেটের ধান্দায় সাত ঘাটের জল খেয়ে বিহারের পাথুরে ভূমিতে আছড়ে পড়েছি। অখণ্ড অবসর মুহূর্তে ওর কথা আমার মনে হয়েছে, কোনও দীর্ঘকেশী, সুন্দরী

মেয়ে দেখলেই পায়েলের মুখটা সর্বাগ্রে চেউ দিয়ে উঠত। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমি পায়েলকে রাগাবার জন্য বলতাম, তুই যদি মেলায় হারিয়ে যাস তাহলে তোকে খুঁজতে বেশি হয়রান হতে হবে না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, মেলায় তোর মতো কেউ চুলের বস্তা মাথায় করে আনেনি। তোর ওই ভাদ্র মাসের তালের মতো খোঁপা দেখলে যে কোনও বোকারামও বুঝে যাবে ওই তো আমাদের তাল গাছ!

কিছু কথা থাকে যা ভোলা যায় না, যতদিন যায় পুরনো সোনার মতো তার গাম্ভীর্য বাড়ে। পায়েলের প্রসঙ্গ উঠলেই আমি আর অন্য কোনও প্রসঙ্গে নিজেকে নিমগ্ন করতে পারি না। মাসিমা এটা জানতেন তাই তার অভিমান, অনুযোগ আমাকে স্পর্শ করল। আমি কোনও সিদ্ধান্তে না এসে মাসিমার শান্ত, মৌনী, শোককাতর পাথর মুখের দিকে অপলক তাকালাম। মাসিমা সাদা শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন। তাঁর কান্না আমার পৌরুষে, আমার এই আত্মভোলা খামখেয়ালি হৃদয়টাকে আঘাতে-আঘাতে ঘায়েল করল বারংবার। মাসিমার ছোঁয়াচে কান্নায় সুজিতও চোখ মুছে নিয়ে কোমলতা পূর্ণ রক্তিম চোখে নোনাধরা দেওয়ালের দিকে সিক্ত চোখে তাকাল। আমিও নিরুপায় চোখে দেওয়ালের দিকে তাকালাম। দেওয়ালে চ্যাপটা হয়ে ঝুলছিল পায়েল, কাচ বাঁধানো কাঠের ফ্রেমের ভেতর পায়েল সেই দুষ্টুমিভরা হাসিটাই হাসছিল! ওর কপালে চন্দনের ফোঁটা, ফ্রেম ঘিরে শুকনো রজনীগন্ধার মালা সাপের হাড়ের মতো লাগছিল। অকস্মাৎ আমার বুকে ভয়ের শিহরণটা ছড়িয়ে গেল, আমি পরাস্ত মানুষের চোখে তাকিয়ে থাকলাম, এক সময় আমি হেরেও গেলাম। আমার জীবনে কান্নার কোনও মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। আমি কষ্ট পেতাম কিন্তু কান্না আমাকে কখনও বিবশ করেনি। চোখে জল ভরে এলে দৃশ্যমান সব কিছুই আবছা হয়ে পড়ে। কাঁদলে অনেক সময় বুকের যন্ত্রণাটা বেড়ে যায়। আমি অনুভব করলাম, ধারাল নখ দিয়ে কে যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা খামচে ধরেছে। অদৃশ্য রক্তধারায় আমি অস্থির, বিহ্বল। তবু আমি সজল চোখে তাকিয়ে আছি পায়েলের স্থির অনড়, স্পন্দনহীন চোখের দিকে। মাসিমা চোখের জল মুছে স্বাভাবিক হলেন খাবে চল মাখন, রাত অনেক হল। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে-শুয়ে তোমরা গল্প কর।

খাওয়ার ইচ্ছে কারোরই ছিল না। চন্দনা থমথমে মুখে মাথা নিচু করে বসেছিল, কাঁদলে ওর চোখ দুটো ভয়ানক রকমে লাল হয়ে যায়। পুরো মুখটাই করুণ…হয়ে ওঠে।

মাসিমাকে পায়েল সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না বলেই আমি সুজিতের সাথে বাইরে এলাম। সুজিত মুখ ভার করে বলল, আমি

ভেবেছিলাম তুই হয়তো পায়েলের ঘটনাটা জানিস! তাই আর ওই প্রসঙ্গে কোনও কথা তুলিনি। প্রায় মাস ছয়েক হল পায়েলকে আমরা হারিয়েছি।

কী হয়েছিল ওর?

সুজিত দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, ব্লাড ক্যানসার। প্রথমে ডাক্তাররা রোগটা ধরতে পারেনি, যখন ধরতে পারল তখন সব কিছু আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। তবু, চেষ্টা করেছিলাম ভেলোরে অথবা বম্বে নিয়ে যাওয়ার। জমিজমা বিক্রি করে টাকা-পয়সাও যোগাড় করেছিলাম। কিন্তু ও আমাদের সুযোগই দিল না। ওর মৃত্যুর পর মা তো পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। এখন চন্দনাকে পেয়ে মা হয়তো আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। সুজিতের মুখে কথাটা শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম। সুজিত আমাকে অধিক ভরসা দিয়ে বলল, মা যখন ওকে রাখতে চেয়েছে তখন তোরা আর কোনও চিন্তা করবি না। তুই তো মাকে ভাল মতন জানিস, তোকে আর নতুন করে কী বলব। পায়েল মারা যাওয়ার পর থেকে ঘরটা একদম ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। এখন আর ততটা কষ্ট হবে না!

খুব সকালে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি ওই অত সকালে মাসিমা আর চন্দনার স্নান সারা। কাপ হাতে নিয়ে চন্দনা আমাকে বলল, জানেন তো, কাল সারারাত মাসিমা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন। উনি কতবার যে আমাকে 'পায়েল' বলে ভুল করে ডেকেছেন! আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, সারারাত আমিও ঘুমোতে পারিনি।

তোমার অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেল। আমার কথায় চন্দনা তার রাত্রি জাগা ঈষৎ ফোলা-ফোলা চোখ মেলে তাকাল। ওর চোখে-মুখে মৃদু একটা কাঁপুনি, আমি কী আপনার সম্মান রাখতে পারব?

অমন করে বলছ কেন?

আমার খুব ভয় করছে, সেই জন্য।

চলে আসার সময় চন্দনা খুব কাঁদল। বটুর মনটাও খুব খারাপ দেখলাম। সুজিত মন খারাপের গলায় বলল, আবার আসিস কিন্তু। নিয়মিত চিঠি দিস।

আমি চন্দনাকে আমার ঠিকানাটা সাদা কাগজে লিখে দিলাম। কষ্টে আমারও ঠোঁট কাঁপছিল, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, কখনও যদি কষ্ট পাও তাহলে চিঠি লিখো।

চন্দনা আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, বটু কিছুতেই ওর প্রণাম নিল না, চন্দনার হাতটা ধরে বলল, আমার পাপ লাগবে। রোজ তুমি ঠাকুরকে প্রণাম কর। তোমার ভাল হবে।

মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় যেমন ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে, চন্দনাও

তেমন ভাবে কাঁদছিল, আপনি তো চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার সময় আমাকে কিছু বলবেন না ?

আমি পিছন ফিরে তাকালাম, যদি সম্ভব হয় মাসিমাকে তুমি 'মা' বলে ডেকো।

আমরা গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় এলাম। শীতের সকালে কুয়াশা ছিল প্রচুর। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম—সেই কুয়াশার মধ্যে পরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে চন্দনা। যাকে আমরা কেউই চিনি না।



আট

রেল ইয়ার্ডে কয়লা তুলতে গিয়ে শুকুকে বেইজ্জত করে দিল পুলিশে। দোষটা শুকুরই। বত্রিশ ডাব্বার মাল গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল, শান্টিং ইয়ার্ডের পাশে, তখন কটকটে দুপুর,—কাক ডাকছিল কা-কা করে হাইটেনশন তারে। শুকুরা মস্করা করছিল একে অপরের গায়ে টুস্কি মেরে, বুক ফুলিয়ে বেহায়ার ঢঙে হাসছিল। যদিও বরাত খারাপ, মন মতো কয়লা পায়নি দুপুরতক্, তবু কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না মনে, মেজাজখানা অবিকল রামনবমীর মেলায় যাবার মতন। বুড়িটার নাম গুরুবারি, তার গম্ভীর মুখে খিস্তি যেন খই হয়ে ফোটে। ছোকরা পুলিসগুলোও ভয় পায় তার মুখকে। গুরুবারি যখন খৈনি ডলে মুখে পোরে—তা অবিকল ব্যাটাছেলে-গুলোর মতন। হরিণছাপ খৈনি ছাড়া তার এক মুহূর্ত চলে না। খৈনি না পেলে সে আদিবাসী মার্কা বিড়ি খায়। বিড়িতেও মন না ভরলে বাটি-বাটি হাঁড়িয়া রসি তার দিমাগ্টাকে সামান্য একটু টলিয়ে দেয়। এই গুরুবারিই শুকুকে হাঁড়িয়া খাওয়া ধরাল। প্রথম-প্রথম নাক সিট্কাত শুকু, এখন নাকের নিচে টোল খাওয়া বাটি ধরে শুধু ভেজা চানা আর কাঁচা মিরচার চাখা দিয়ে চোঁ-চোঁ করে সাবড়ে দেয়। মন ভালো থাকলে, ট্যাকের জোর থাকলে বনমালীর জন্য ছাঁট-কাট মাংসের চাট্ নিয়ে যায় শালপাতার দোনায়। বাপটা তার এই বয়সেও আস্ত একটা বক্রি চিবিয়ে-চিবিয়ে খেয়ে নেবে! পাথর খেয়ে হজমে দেবে—এমন তার হজম শক্তি। নড়া-চড়ার বালাই নেই, এক পয়সা কামাই-এর মুরোদ নেই, অষ্টপ্রহর শুধু কোঁকায়, তবু খাওয়ার বহর দেখলে লোকে ভাববে,—দিব্যি সুখে-শান্তিতে আছে বনমালী। তার সব সুখ শুকুর জন্য, স্বামী খেদানো মেয়েটা ঘাড়ের উপর পড়েই আরামদায়ক মালিশের মতো কাজ দিচ্ছে এখন। শুকু না থাকলে বুড়োটে হাড় নাড়িয়ে দোরে-দোরে ভিখ্ মাঙতে যেতে হত তাকে। রাম শেঠটা খচ্চরের খচ্চর, তার সাঁড়াশি হাত থেকে রেহাই পাওয়া রীতিমতো বাপের

ভাগ্য। তবু, ওই উদ্মুখ্ বুশটা লোক পাঠিয়েছিল বনাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। ভাগ্যিস, ঘরে ছিল শুকু, নাহলে সেদিন ডানা ছিঁড়ে রাম শেঠের গদীতে হুড়কে দিত জল্লাদ লোকটা। মেয়েটার মুখটা চাঁচাছোলা, শানানো ক্ষুর। চোপে-চোপে কাটে। সেই তড়বড়ে মুখের কাছে দাঁড়াবে—এমন পাথর-চাট্টাল তেজিয়াল কলিজা বস্তি খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। কদমা থেকে খোয়া হয়ে গিয়েছে শুকু—এই অল্প দিনে। এ সবই গুরুবারির শিক্ষা। গুরুবারি তার ভোঁদড় মুখটা কঠিন করে বলে, এক-ঘা দিলে, দু-ঘা দিবি। শালি বললে 'মা-বহিন' তুলবি। গায়ে হাত দিলে চাবড়ে দিবি গালে। ফুলের মতন তুলতুলে হলে চলবেনি। তোর মুণ্ডিতে কুইলা বোরা। গা-গতরে কুইলা গুঁড়া। তবু ড্যামনাগুলান তোর দিকেই তাকাবে। তাকাক। সে যদি পাঁচ নুয়ার ফায়দা উঠায়, তুই উঠাবি পাঁচ সিক্কার। হিসাব বরাবর না হলে এই চাক্কাই তোর জান লিবে। মনে রাখবি,—রেলের চাক্কা যেতে কাটে; আসতে কাটে। হুমড়ে পড়লে বুকের উপর দিয়ে চল্লে যাবে।

দুপুরের যত রঙ ধরে, রঙ-তামাশা তত বাড়ে। হাসির উচ্ছৃংখল ঢেউটা রেলপাত ছুঁয়ে ধিরিক-ধিরিক নাচতে-নাচতে চলে যায়। শুকু উথলে ওঠা আবেগে লাগাম টেনে বলল, মাউসি গো, হা--দিখো,—মালগাড়ি। তার কথা শুনে গুরুবারি ভার দেহ নড়িয়ে থপ্‌থপিয়ে চলে গেল সেখানে, ফিরে এল খড়খড়ে ঠোঁটে হাসি ভরিয়ে। নিকি বুড়ো আঙুলের নখে চিপকে দিয়ে বলল, চ, খাড়ায় থাকলে চলবেনি। পুরা মাল আচে ডিব্বাতে। আমি লোকজন দেখি, তোরা গিয়ে ঝপ্‌ঝপ্ বোরা ভরে ফেল। খুচরো ট্যাকা থাকলে দে। গাল দিলে শালাদের হাতে আমি গুঁইজে দিব। খৈনি চাইলে খৈনি দিব। যা, আর লেট করিসনে।

ওরা রোজই যায়, বুক কাঁপে না। শাড়িটা গাছপেড়ে করে পরে নিয়ে ডিব্বার উপর চড়ে বসলেই হল। তবে, তাগদের চেয়েও বুকের জোরটাই আসল। প্রথম-প্রথম বুক ধড়কাত শুকুর, খাবি খেত কলজেটা। গুরুবারির ধমক, চোখ রাঙানিতে এখন সে সব সহজ হয়ে ভয় ভাবটা উবে গিয়েছে। ভয় করলে পেট বাঁচে না, পেট কারোর চোখ রাঙানির ধার ধারে না। পেট পুলিশের লাঠি, খিস্তি-খেউড় কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করে না। সে তার আপন নিয়মে চলে, আপন মেজাজে টং। এই সোমত্ত, ভরা নদী শরীর নিয়ে এ-দোর-সে-দোর ঘুরলে ভাত কাপড়ের অভাব হবে না, তবে শরীরটা তার মায়ের মতো ছিবড়ে হয়ে যাবে দু-দিনে। গুরুবারি তাই পথ দেখাল। গম্ভীর মুখ তুলে বিজ্ঞের গলায় বলেছিল, ছাড়া গরুর মতন না ঘুরে চল দেখি আমার সাথে। আরে বিটিয়া, তুর গতর যখন আচে তখন আর ভয় কী! দাঁতগুলানরে রোজ 'পাউস' দিয়ে মাজবি। এই দাঁতগুলাই

তুরে বাঁচাবে।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা মনে পড়লে এখনও শিউরে ওঠে সে, থরথরানি কাঁপুনিটা বুকের খোদল থেকে কিছুতেই আর মেলায় না। ঘেমে-নেয়ে একসা হয়ে যায়। চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গিয়ে টান ধরে গলা-বুক-পিঠে। খলবলানো রক্তে হিম সাপটা ছোবল মারে হরদম! শুকিয়ে ছোট হয়ে আসে জিভ। টাগরা শুকিয়ে অবিকল যেন পোড়া শুকুই মাছ।

গুরুবারি তার এই নাজেহাল অবস্থা দেখে হেসে বাঁচে না, বুকের লাল মুখ ঘামাচি খুঁজলে বলে, হিম্মোৎ রাখ বিটিয়া। ডরলি কী মরলি! বলেই সে ফজলি আমের মতো ঝোলা-ঝোলা বুকে দোলা দিয়ে খিলখিল করে হাসে, তাতেও মন না ভরলে প্রথম লাইনে আসার সরস অভিজ্ঞতার কথা শোনায়, তুর মতোন আমিও একদিন ছুকরি ছিলাম। ডর, লাজ-লজ্জা, মান-সম্মান সব ছিল এই বুকটাতে। ধীরে-ধীরে সব হেরিয়ে গেল। তুর মউসা মরল পুলিসের গুলিতে, তার স্বভাব-চরিত্রি ভালো ছেলোনি! বড়ো রুপিয়াখোর মানুষ। তারে ঠারে-ঠারে মানা করলেও শুনতোনি। গেল, এক ফুঁয়ে সে গেল। গাঁ থিকে ভাগায় দিল-আমাকে। লোক বলল, আমি নাকি ডাইন মাগি! ছ্যাঃ ওই সব ভেড়ুয়া লোকগুলোর মুখে এখন আমি ছ্যাপ ফেলি। তারা এখন আমার কাচে সুদে টাকা হাওলাত চায়। দিই না, ভাগাই দিই, ছ্যা-ছ্যা করে। তা যা বলচিলাম, বিটিয়া। পরথম-পরথম আমারও জানটা ধড়কাত। কিন্তু কী করব, বাঁচতে তো হিবে। কোনও রাস্তা চক্ষের ছিমুতে খোলা নেই। ওই যে বল্লাম—পেট হল গিয়ে সবচে বড়, পয়লা নাম্বারের দুষমন। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বস্তির মেয়ে-ছেলেগুলার সাথে গেলাম গুঁড়া কুইলা ভরতে। খাঁ-খাঁ দুপ্পুর। ইয়ার্ডে কাক-পক্ষী নেই। মনের সুখে বোরাখানিক ভরে যেই পুলিয়াটার কাছে দিয়ে নেমে আসচি—অমনি হনুমুখো এট্টা সিপাই বুক চিতায়ে আমার সম্মুখে খাড়া হল। গাল দিয়ে বলল, তোর বাপের কুইলা যে ঘর লিয়ে যাবি। রাখ, নাহলে উদোম করে সাঁটাব। তার লালপারা চোখ, শয়তানের মতো মুঁচ, জহিরিলা সাপের মতন খাকি পুশাক দিখে ভয়ে আমার দু-জাং ছরছর করে ভিজে গেল। হারামিটা খাড়ায়-খাড়ায় দেখল, পরে গোসা কমতে ঝোড়ে-র দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে শুধালো, লোতুন এয়েচো বুঝি? তা বেশ, তা বেশ! বিটিয়া, তুরে আমি কী পাঠ পড়াব—সেদিন থিকে নিশাটা আমায় চেপে ধরল। আর কুনোদিন হারিনি। বোরা-বোরা কুইলা এনেচি, লোহা এনেচি,—কেউ আমারে কিছু বলেনি। এখন তো পাক ধরেচে লুমায়, কোন্ শালার বেটা শালা আমায় কী বলবে? -বললে, দাঁত ভেনগে দিব, মাড়ি উপড়ে লিবো।

সাহস না থাকলে একটা ছুঁচোও লাথ মেরে চলে যাবে, যে লাইনের যে

ধর্ম'। শুকু নীচে, মাল গাড়ির উপরে তার সহেলি। কয়লার চাঁই ফেলছে দু-হাত দিয়ে। আশ-পাশে কেউ নেই। কয়লা পড়েই ছিটিয়ে যাচ্ছে রেল-লাইনের ধারে-ধারে। বস্তার মুখ ফাঁক করে ব্যস্ত হাতে সে যখন কয়লা ভরছিল তখনই রাক্ষসের মতো অতর্কিতে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাকি পোশাকের একজন, চুলের মুঠি ধরে শুইয়ে দিল খোয়ায়, অবশেষে বুকের উপর চড়ে বসে লাঠিটা গলার উপর লম্বালম্বি চেপে ধরে গাল দিল 'মা-বাপ' তুলে। গুরুবারি ছুটে না এলে তার যে কী হাল হত তা একমাত্র ভগবানই জানে। হাঁড়িয়া ঠেকের ইঁটের উপর বসে ভয়ে, উত্তেজনায় গলগলিয়ে ঘেমে যাচ্ছিল শুকু, সেই প্রথম দিনের মতো ভয়টা হিমসাপ হয়ে ক্রমাগত ছোবল মারছিল কলিজায়। গুরুবারি খুঁট খুলে চার ভাঁজ করা একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে ধরিয়ে দিল আদিবাসী মেয়েটার হাতে, তারপর ময়লা আঁচলে মুখের ঘাম রগড়ে বলল, দে, বিটিয়া দে। আজ আমাদের কারোরই মন-মেজাজ ভালো নেই।

হাঁড়িয়া খাওয়ার আগে শুকু মুখ ধুয়ে এল চাপা কলে, খরখরে গলাটা ভিজিয়ে এল ঠান্ডা জলে, তবু তার হাঁকু-পাকু ভাবটা গেল না। গুরুবারি অভয় দিয়ে বলল, মুছে ফেল মন থিকে, ওসব যত আঁকড়ে ধরবি—সুখ পাবিনে। লাইনে এসব হয়েই থাকে। মেয়েমানুষ তো লদীর মতন, কেউ যদি আঁজলা ভরে জল খায়—তুই কী তারে ফেরায় দিবি? আয়, দু-বাটি হাঁড়িয়া পিয়ে লে, আগের মেজাজটা ফিরে পাবি।

শালপাতার দোনায় ছোলা সিজানো, দুটো হারা মরিচ আর নুনগুঁড়া। এ সবই চাখা দিয়ে খাচ্ছিল গুরুবারি। মুখ ভার করে দূরের দিকে থমথমে চোখে তাকিয়ে ছিল শুকু, সেই থেকে তার ঠোঁটটা শুকনো, মুখ ফ্যাকাসে যেন রক্ত নেই! গুরুবারি তাকে সহজ করার জন্য গায়ে খোঁচা মেরে বলল, পিয়ে লে বিটি, ঘর যেতি হবে। আজকের দানটা তো ফক্কা! ঠিক আচে, ভালো-মন্দ মিশিয়ে দিন গড়িয়ে গেলেই হল। আমি অত্তো ভাবিনে, ভাবলে খুপড়িটা উড়ে যেত কবে।

খুপড়ি শব্দটা কানে যেতেই শুকু পাতলা ঠোঁট নাড়িয়ে হাসল, হাত বাড়িয়ে মুখের কাছে তুলে আনল ঝকঝকে তকতকে অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটা, তারপর আলতো চুমুক দিয়ে এক মুঠ সিজানো ছোলা মুখে পুরে দিল চাখনি হিসাবে। গুরুবারি আড় চোখে তাকিয়ে হাসল, তার শূন্য বাটি আবার ভরে দিল হাঁড়িয়াওয়ালি। দু-বাটির পর থেকেই ধীরে ধীরে বুকের কাছটাতে মেঘ জমছিল শুকুর, ঝিমঝিম করছিল চিন্তাক্লিষ্ট মাথাটা। আগে হাঁড়িয়া ভরপেট খেলেও এমন হত না, এখন হয়। অস্বস্তিতে বুকের চারপাশে চাড় বেঁধে থাকে, গলার ভেতরে পুড়ে-পুড়ে নামার মতো জ্বালা-জ্বালা করে সব সময়। লোক যে বলে হাঁড়িয়া খেলে শীতল হয় শরীর, এটা যেন

এখন শুধু কথার কথা। হাঁড়িয়াতে আগের সুখ পায় না শুকু, ঝাঁঝালো ঢেকুর ওঠার মতো বুকটা জ্বলে-পুড়ে যায় সব সময়। ইচ্ছে না থাকলেও আসতে হয় তাকে, নাহলে গুরুবারি মাসি যে রাগ-ঝাল করবে। দু-বাটি নিঃশেষ করার পরও অতিরিক্ত আর এক বাটির জন্য যখন পীড়াপীড়ি করছিল গুরুবারি তখনই পাকা সড়কে রিকশা দাঁড় করিয়ে ঘেরা চট মাথার উপরে তুলে হাঁড়িয়া ঠেকে ঢুকে এল রবার্ট। তার খালি গা, পুরুষালি বুকটা পাথর চাট্টানের চেয়েও দঢ়ৃ। রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে শরীর, তবু দীর্ঘদেহী রবার্ট এখনও শুকুর নজরে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। নিজের অজান্তে ভেঙে তছনছ হয়ে গেল শুকু, হাঁড়িয়ার বাটিটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে সে গুরুবারির দিকে উসখুশানো চোখে তাকাল, চলো গো মউসি, ঘরে মোর কত্তো কাজ বাকি।

গুরুবারি সেয়ানা মেয়েছেলে, জোর করে ঢেকুর তুলে হাসল, যাব রে বিটিয়া, যাব। মরদরে দিখে শরমে গেলি বুঝি? তারপর, থেমে নিজেকে শোনানোর মতো করে বলল, শরমের কী আচে? যে তুরে ছেড়ে দিয়েচে, তারে দিখে তুর লাজ কী? নিজের হাত নিজে সাফা রাখ, কেউ তুর হাতে হাত দিবে ফির। দুনিয়ায় মেয়েমানুষ যেমন কম নেই, বিটা ছেলেও কম নেই।

রবার্ট গামছায় ঘাম মুছে গুরুবারির দিকে কটাক্ষ হেনে তাকাল, তারপর হাঁড়িয়াওয়ালিকে বলল, চার বাটি দাও। আচ কামাই হয়নি, হাত ফাঁকা। উধার রাখব।

খুশি হল না হাঁড়িয়াওয়ালি, তবু অনাগ্রহে এগিয়ে দিল ভেজা সপসপে বাটিটা, চাটের পয়সা সে নগদ চায়। রবার্ট বলল, লাগবেনি চাট, এমনিই মেরে দিব। কিন্তু মুখে যা বলা সহজ কাজে তা করা কঠিন। এত দিনের অভ্যাস বিনা চাটে কেমন বেসুরে, বিস্বাদ লাগে। শর্ট প্যান্টের পকেট হাতরে খুঁজে পেতে সে বের করে আনে একটা সিক্কা। তারপর, হারানো মেজাজ ফিরে পেয়ে বলল, দাও দেখি এট্টা পাঁপড় সেঁকে। আজ চানাসিজা খাব না, দাঁতের ফাঁকে ঘুসে যায়। বলেই আনতাবড়ি হাসল। তার সেই হাসি বিষপোকা হয়ে কামড়ে দিল শুকুকে। মানুষটার দারু-হাঁড়িয়া খাওয়া বারণ, পেটে বেদনা উঠলে ধড় কাটা মুরগার মতন ছটফটায় খাটিয়ায়। ডাক্তার বলেছে,—ওসব ছাইপাঁশ খেলে মরবে। লিভারের বারোটা বেজেছে, এখনও যদি সাবধান না হও ভগবানও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না! তবু যদি হুঁশ ফিরত মানুষটার। জোয়ান মরদ, মনে ভয়-ডর না থাকলে কে তাকে বোঝাবে, শেখাবে? কার এত দায় পড়েছে? সিঁথির সিঁদুর বাসি হলেও সিঁদুর, শাঁখায় ময়লা জমলেও শাঁখার ধর্ম হারায় না। ঝড়ো, বেখেয়ালি মানুষটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট

কেঁপে উঠল শঙ্কুর, চোখের কোণ ভিজে যাওয়াতে বড়ো অসহায় বোধ করল নিজেকে। খেতে-পরতে না দিক, ঘরে না তুলুক,—তবু মানুষটা যেন সুস্থ থাকুক কায়মনোবাক্যে শঙ্কু ভগবানের কাছে এটাই শুধু মিনতি করে। তার ফোঁপরা কপাল, সৃষ্টিকর্তা সব দিয়েও কোথায় তাকে যেন অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছে, অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া এ আর কী হতে পারে! বিয়ের প্রথম রাতেই রবার্ট ধরে ফেলেছিল তার গোপন রোগটা। বিছনার এক পাশে সরে গিয়ে উন্মত্ত পশুর মতো হাঁপাতে-হাঁপাতে বলেছিল, বল শঙ্কু, কবে থিকে তোর এমন রোগ?

শঙ্কু তখন নতুন ঘরে অনাদরে থরথর করে কাঁপছে, চোখ ভিজিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু, কোনোমতে কান্নায় বুজে আসা গলায় সে বলেছিল, ছোটোবেলা থিকে। শরমে মুই কাউকে কইনি, এই পরথম তুমাকে কইলি।

পরের দিন ভোর হতেই রবার্ট তাকে নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে। ডাক্তার ঘণ্টা দুয়েক পরীক্ষা করে বললেন, হবে না রবার্ট। একে কোনও বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখাও। মাংসের এক্সেসিভ গ্রোথ। শুধু ইউরিন পাশ করার মতো ছিদ্র আছে। অপারেশন না করলে তোমার স্ত্রী কোনোদিন মা হতে পারবে না। আর তুমিও যৌন সুখ থেকে চির জীবনের মতো বঞ্চিত হবে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল রবার্টের, ধার-দেনা করে সে তাকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল চাইবাসায়। সেখানেও সেই একই জবাব। শঙ্কুর হৃদয় ভাঙল, কেঁদে-কেঁদে শুকিয়ে গেল চোখ। মাথায় হাত দিয়ে রবার্ট বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বেহেড মাতাল হয়ে ফিরে এল সাঁঝে। গাল দিয়ে চুলের মুঠি ঝাঁকিয়ে বলল, হিজরে, বিয়ের আগে কেন তুই বললিনে, কেন আমার জীবনটাকে এভাবে তুই ঝাঁঝরা করে দিলি? এখনও সময় আচে. পেলিয়ে যা! আমি ফির বিয়ে-সাদি করব। আমার ফাঁকা ঘর। জীবন ভর দুঃখ সইলাম। আর আমি দুঃখ সইতে পারব না।

রাতের অন্ধকারে শরীরে মারধোরের চিহ্ন নিয়ে ঘরে ফিরে এল শঙ্কু, তাকে অসময়ে কবাটের কাছে কাঁদতে দেখে আঁতকে উঠেছিল বনমালী। তারপর কত জল বিলজয় নদী দিয়ে গড়িয়ে গেল, শঙ্কু মরমে মরে গেল, কত হাজার গণ্ডা কবিরাজ ফেল মেরে গেল, শঙ্কু আগে যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল! রবার্টকে সে কোনোদিন দোষ দেয় না, ভুল যা হয়েছে—সব তার নিজের। অজ্ঞতা, গ্রাম্যতা, বালিকা সংকোচ, অশিক্ষা সব মিলিয়ে শঙ্কুর এই অভিশপ্ত দেহ। একে সে কী ভাবে আগলে রাখবে? সে তো বৃহন্নলা নয়, সে পূর্ণ যৌবনা যুবতী। প্রতি মাসে রক্তক্ষরণের সময় তার যে কষ্ট হয়, এমন শাশ্বত কষ্ট প্রতিটা মা-বোনই তো

পেয়ে থাকে। প্রফুল্ল লতার মতো তার দেহ, কমনীয়, দৃষ্টি আকর্ষণকারী মুখাবয়ব, এমন তো বহু তপস্যায় মেয়েরা পেয়ে থাকে। তার কবোষ্ণ শরীরের মজ্জাগতমও নিখাদ, মায়াময়। তার শান্ত দীঘল, গভীর অর্থবাহী চোখের দৃষ্টিতে যে কোনও পুরুষের বুক বিদীর্ণ হতে বাধ্য। তবু কেন, কেন সে হেরে যাবে? অনেকদিন পরে পুরনো কথাগুলো তাকে যেন কাঁটাবনে ঢুকিয়ে ছুটিয়ে-ছুটিয়ে মারে। সে হাঁপ ধরা চোখে সরাসরি রবার্টের মুখের দিকে তাকাল। অদ্ভুত এক মায়ায় ভরে থাকে তার দুচোখ। ঘাড়ের দু-পাশে ঘন কালো চুলগুলো হাওয়ায় ছটফটিয়ে ওড়ে। বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে ওঠে টিকাল নাকে, পেলব মসৃণ মুখমণ্ডলে। শুচিস্নাত রমণীয় দৃষ্টিতে রবার্টের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল সে, প্রথম রাতের অপ্রতিরোধ্য স্মৃতি তাকে যেন পাগল করে তুলল।

রবার্টও স্থাণুবৎ তাকিয়েছিল শঙ্কুর লাবণ্য উপচে পড়া মুখের দিকে। শাখা-প্রশাখাহীন গাছের মতো সে একা-একাই বেড়ে উঠেছে এত দিন। সবাই ভেবেছিল—রবার্ট আবার বিয়ে করবে, নতুন করে সংসার পাতবে। তার কুঁড়েঘর ভরে উঠবে সুখের হাসিতে। কিন্তু রবার্ট সে পথের ছায়া মাড়ায়নি। কু-সঙ্গ তার প্রিয়সঙ্গ হলেও দ্বিতীয় বিবাহে তার ঘোরতর আপত্তি। সে বেশ্যাবাড়ি যায়, খারাপ মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করে, মদে চুর হয়ে পথের কিনারে পড়ে থাকে তবু বিবাহ শব্দটির উপর তার ঘোরতর বিতৃষ্ণা। নেশায় টলোমলো হয়ে উঠছিল রবার্টের চোখ দুটো, তবু যতদূর সম্ভব শান্ত দৃষ্টিতে সে শঙ্কুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল নির্নিমেষে। এমনভাবে সে তো কোনোদিন শঙ্কুকে দেখেনি। এতদিন তাহলে কী সে অন্ধ ছিল? মাথার চুল খামচে ধরে অনুশোচনায়, আত্মপীড়নে ডুবে গেল রবার্ট। বুকের ভেতরটা মৃদু-মৃদু কম্পনে অস্থির, উন্মনা হল সহসা। চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও হেরে গেল সে। শূন্য হাঁড়িয়ার বাটিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, আরও দাও, আচ গলাতক খাব।

কথাটা শুনে কেঁপে গেল শঙ্কু, গুরুবারির পিছন-পিছন সে পাকা সড়কে এসে দাঁড়াল।

দু-জনের পথ দু-দিকে।

গুরুবারি চলে যাওয়ার পরেও বুকের কাছে হাত চেপে নিমের ছায়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল শঙ্কু। উচ্ছন্নে যাওয়া মানুষটাকে টেনে তোলার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল তার মনটা। কোনও এক অজ্ঞাত মায়ার বুকটা তার আজ ভরে উঠেছে কানায়-কানায়। যা সে কোনওদিন করেনি, আজ সে তাই করবে। স্টেশনের সামনে রবার্টের সঙ্গে তার দেখা হয় প্রতিদিন, কিন্তু কথা হয় না। ইচ্ছে করেই কথা বলে না শঙ্কু। এঁটোপাতার মতো যে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে আস্তাকুঁড়ে তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কী?

শাঁখা-সিঁদুরের মায়ায় সে কেন হেরে যাবে ওই জল্লাদ প্রকৃতির মানুষটার কাছে। সেই অভিশপ্ত রাতের স্মৃতি তাকে এখনও তাড়া করে, সেই নিদারুণ অপমান এখনও ভুলতে পারেনি শুকু। ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে সে তাকিয়ে থাকে হাঁড়িয়া ঠেকের দিকে! দূর থেকে সে দেখল—আবার শূন্য বাটিটা হাঁড়িয়াওলার দিকে সাগ্রহে এগিয়ে দিচ্ছে রবার্ট। কেমন নেশাচ্ছন্ন গলায় টেনে-টেনে বলছে, দাও, আরও দাও। আচ আমার মন ভালো নেই। হাঁড়িয়া খেয়েই পেটের গর্ত ভরাব।

নিজেকে আর নিজের ভিতরে ধরে রাখতে পারল না শুকু, পুরনো অধিকারে ছুটে গিয়ে হাঁড়িয়ার বাটিটা সক্রোধে কেড়ে নিল সে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, নিজেকে মারতে চাও কেনে, মুই কী করেচি, কী মোর অপরাধ? তাজ্জব হয়ে গেল রবার্ট, মুখে ভাষা নেই! অপলক তাকিয়ে থাকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা শুকুর দিকে। এই মিথ্যে অভিমান এখন কি সাজে? মনে মনে একবার ভাবল ররার্ট। তারপর, আপন মনে হেসে উঠল সে। সেই শব্দহীন হাসিতে আরো ভেঙে পড়ল অভিমানী শুকু, ডাক্তার কী কইচে মনে নাই? অতো ভুল মন তুমার? ছিঃ-ছি, মুই কার হাত ধরেচি গো? শুকুর বিলাপ গায়ে সয়ে নিল রবার্ট, হার মানা চোখে তাকিয়ে সে বলল, এখানে যাত্রা করে কী হবে, চল—সড়কে চল। কুথাও গিয়ে বসি। তোর যেমন অনেক কথা আচে, আমারও কম কথা নেই। চ, আচ এট্টা ফয়সাল্লা হয়ে যাবে।

শুকু বেরিয়ে এল, রবার্ট তার পেছনে।

শিশম গাছের ছায়ায় রিক্‌শা দাঁড় করিয়ে রবার্ট সিটটা নামিয়ে আনল নিচে। শুকুকে বলল, বস্‌ ওটাতে বস্‌।

শুকু বসল না, গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। রবার্ট বলল, তোকে রোজ দেখি কয়লা বোরা নিয়ে ঘুরঘুর করতে। স্টেশনের রিক্‌শাওলাগুলান তোকে দেখে হাসে। আমাকে টিপ্পুনি কেটে বলে—ওই দ্যাখ রবার্ট, তোর 'দিল কা রানি' যাচ্চে। আমি শুনি, দেখি। কী করব? সবই আমার পোড়া অদৃষ্ট!

শুকু কথা বলতে গিয়ে টের পেল তার ঠোঁট দুটো বেজায় কাঁপছে, করকর করছে চোখের জমিন। এমন তো তার কোনোদিন হত না, আজ কেন হয়? কেন ভিজে যায় চোখের দু-কোণ, মন, অন্তস্থল, এই নশ্বর শরীর? রবার্ট তাকে শুধোল, তুই কী বাবুর ঘরের কামধান্দা ছেড়ে দিলি? কেনে ছাড়লি, সিখানে তো তুই ভাল ছিলিস, তোর তো খাওয়া-পরার কোনো অসুবিধা ছিলনি।

সব শুনে বুক ভাসিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শুকু, বাতাসে ভাসা শুকনো পাতার দিকে অসহায়, বিপর্যস্ত চোখে তাকাল, তা ছেলাম গো, কিন্তুক

সেই বাঁধা সুখ মোর ভাগ্যে সইলনি। শুধু নিজের পেট ভরলে তো হিবেনি। বাপের কথাতো ভাবতে হিবে? সে বেচারি গা-গতরে ঘা নিয়ে ভিখ মাঙতে পারেনি। তার দু-বেলা খায়-খরচ সব মোকে দিতে হয়। সে মোকে জনম দিচে, চক্ষুতে আলো দিচে, তার উপর মোর তো গুটে দায়িত্ব আচে? মেসবাড়িতে কাজ করলে মোর তো শুধু একার পেটটা ভরে। বাপোর পেট খালি রইবে, ঝিয়ের পেট ভরা রইবে---তা তো হয় না। তাই, সবদিক বুঝি-শুনি কাজটা ছাড়ি দিলি। অখন বেশ আচি, শুধু অলাউঠিয়া পুলিসমেনে ঝামেলা করে, হাত ধরি খিঁচি লিয়ে যায়, মা-বাপো তুলি গাল দেয়। তখন মুখ বুজি রই, গাল শুনি-শুনি কান দুটা মোর পচি গেলা!

একটা বিড়ি ধরিয়ে রবার্ট ঘনিষ্ঠ চোখে শকুর দিকে তাকাল, বেদনাক্লিষ্ট চোখের তারায় প্রগাঢ় মায়া-মমতার বিচ্ছুরণ, নিখাদ মমত্ববোধে তার হৃদয় কানায়-কানায় ভরে ওঠে। কথা বলতে গিয়ে সে টের পায় তার কণ্ঠনালী অবরুদ্ধ হয়ে আসছে অসংযত আবেগে। দুটো জীবনই যেন খরায় ঝলসানো চারাগাছ, কোনোক্রমে ধুকধুকিয়ে বেঁচে আছে। অথচ, সুখ চেয়েছিল তারা, ঘর বাঁধতে চেয়েছিল তারা। এই সামান্য চাওয়ায় এতবড়ো ধোঁকা মিশে ছিল তা আগে জানতে পারেনি! হাওয়ার বিরুদ্ধে যাওয়া মানুষের এক জন্মের তপস্যা নয়, পাল তোলা নৌকোর মতোই মানুষের জীবন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে। রবার্ট সুখ চেয়েছিল, পায়নি। পারিবারিক শান্তি চেয়েছিল, পায়নি। মায়ের ভালবাসা, পিতার স্নেহ-আদর কোনও কিছুই তার কপালে জোটেনি! জ্ঞান পড়ার পর থেকে নিজের হাত দুটোই তার জীবিকার আশ্রয়, কেউ দয়াবশত তার মুখে দুটো দানা তুলে দেয়নি। কর্কশ, নির্দয় এবড়ো-খেবড়ো পাথরভূমির মতো বেড়ে ওঠা তার এই দেহস্বপ্ন দেখছিল---শকুকে নিয়ে ঘর বাঁধবে, কুঁড়েঘর ভেঙে নিজের মেহনতে তুলবে চালাঘর, সামনে একফালি উঠোনে হামা দেবে তার ঔরসজাত সন্তান। ঠা-ঠা রোদে রিক্সা চালিয়ে ঘর ফিরলে কাচ-গেলাসে জল এনে দেবে শকু, চৌপায়ায় বসে রাজরানীর মতো হাসি-হাসি, গৃহসুখী মুখে ঘাম মুছিয়ে দেবে আঁচলে! কোথা থেকে কী যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল! আখ মাড়াই কলের ছিবড়ে খোসার মতো রসকষহীন এই জীবনের প্রতি এখন যে ঘেন্নাটা বেড়ে উঠছে দিন-দিন তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায় রবার্ট। যে অশুভ ক্ষণে তার জন্ম হয়েছিল সেই অশুভ ক্ষণটি এখনও তার বুকে দাপিয়ে বেড়ায়। আজ শকুর নিস্তরঙ্গ, লাবণ্যময়ী, প্রতিমাসদৃশ মুখের দিকে তাকিয়ে তার আবার নতুন করে বেঁচে উঠতে সাধ যায়। আবেগ থরো-থরো স্বরে সে ডেকে উঠল, শকু, এ শকু। তাকা, দেখ। আমার

বুকের ভেতরটায় কেমন ঝড় উঠেচে। আমি জানি, এ ঝড় ঠেকিয়ে রাখার তাগদ আমার নেই। মরব, খুব চট্‌জলদি মরব। যা কামাই, তা তো সব নিশা করে ফুটিয়ে দিই। তুই বল শুকু, এত নিশা করলে কোন্‌ মানুষটা বাঁচে? শুকু কেঁপে ওঠা গলায় বস্‌ল, মোকে ভুলি গেচো, তা ভালা কথা। ফের শাদি কর। আমি তুমায় যে সুখ দিতে পারিনি,- -সে তুমায় দিবে। আমি খালি তুমার শাঁখা-সিঁদুর-নোয়া-পলা জীবনভর বয়ে বেড়াব। জানব —তুমি সুখে আচ; তোমার ছানাপুনা হিচে—সিটাই মোর কাচে বড়ো গো। মানুষ এক জীবনে সব কিছু পায় না, সে আবার ঘুরে-ফিরে জন্মায়। যা এ জন্মে পাইনি, তা পরের জন্মে পাবা। ভগবানের কাছে মিনতি করি, পরো জনমে মুই যেন তোমার চরণের দাসী হই গো। অশ্রুসিক্ত নয়নে কমলকলির মতো আধো-আধো মুখ করে চেয়ে থাকল শুকু।

রবার্ট এগিয়ে এল তার কাছে, হাতে ধরে বলল, মনে দুঃখ লিসনে, এ সবই উপরওলার খেলা। তুই চাঁদ, আমি সূর্য। এক আসমানেই থাকব, কিন্তুক কেউ কারোর দেখা পাব না।

এ ঘটনার সাতদিন পরের ঘটনা।

একদিন শুকুর সাথে আমার দেখা হয়ে গেল হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ঝোপড় পট্টিটার সামনে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে যেন বাঘের মুখে পড়ে গেছে —ভাবখানা এমন। সন্ধে নেমে আসছিল রেল শহরের মাথায়, স্ট্রিট লাইটের আলোয় পোকা ওড়া অস্বচ্ছলতায় আমি গভীর সন্দেহঘন দৃষ্টি মেলে শুকুর আপাদমস্তক দেখলাম। অনেকদিন পরে শুকুকে দেখে ভালো লাগল। যদিও মাইল খানিকের মধ্যে থাকি, তবু ওর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে উঠে না। বনমালী সুস্থ থাকলে ভিক্ষা করতে আসে মেসে, ও বেসুরে একটা ওড়িয়া গান গায় যার প্রথম লাইনটা: 'চোখাচরা তু' মোর মনো বুঝুলু নাই, মুই চির দুঃখী ভিখ্‌ মাঙি কী খাই!' তার আর্তিভরা, বেদনামাখা কণ্ঠস্বর আমাকে প্রায়শ উন্মনা করে দেয়। অভাবের শেকড় সর্বত্রগামী,—এই বোধে হৃদয় ভরে উঠলে আমি একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রামধন ঠাকুরকে দুটো চাল কিংবা বাসি রুটি দেওয়ার কথা বলে এক ভীষণ অপারগতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য খাটিয়ায় দেহ এলিয়ে চোখ বুজে নিঃসাড় পড়ে থাকি। বনা গান গায়, তার ঈষৎ নুব্জ ছায়াটা দীর্ঘ হয়, শেষে দলা পাকানো একরাশ অন্ধকারের মতো মনে হয় সেই ছায়া। বনার মুখে শুকুর যে খবর পাই না—তা নয়। কিন্তু বনা যা গোপন করেছে—আসন্ন সন্ধায় সেই রহস্যময় সত্য আমার চোখে ধরা পড়ে, আমি শুকুকে নিবিড় চোখে যত দেখি তত মুগ্ধ হই। মনে মনে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই শুকুর প্রতি তার অশেষ করুণার জন্য। শুকুর

স্ফীতকায় সন্তানসম্ভবা সুডৌল উদরটার দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে ভাবি—যাক, এবার তাহলে মেয়েটার একটা গতি হল। মাসখানেক আগের দেখা সেই রোগা, প্যাংলা রক্তহীন শুকুর সঙ্গে এখনকার শুকুর কত ফারাক! শীতের শুরুতে পাতা ঝরে যাওয়া বৃক্ষ এখন বসন্তের শুরুতে নবপত্রে পল্লবিত হয়ে উঠেছে শীতের জরা-ব্যাধি মলিনতাকে দূরে সরিয়ে। কণ্টকাকীর্ণ অভাবী দৃষ্টিতে এখন বর্ণোজ্জ্বল দ্যুতি। হাসি-হাসি মুখ করে আমার দিকে বিশেষ এক দৃষ্টি ফেলে চেয়েছিল শুকু, তখনই অবাধ্য ঠোঁট নড়ে উঠল অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে, কই রে শুকু, সুখবরটা কেন যথাসময়ে পেলাম না? তোর বাবা প্রতি সপ্তাহে দু-তিনবার যায় অথচ আসল সংবাদটাই দিতে বেমালুম ভুলে গেছে। এই হয়, যাক রবার্টের ঘরে কবে গেলি? সে এখন নিশ্চয়ই তোকে মারধোর করে না? শুকু বিস্ফারিত চোখ মেলে আমার সপ্রশ্ন মুখের দিকে তাকাল, তারপর বিষণ্ণতায় চোখ ভরিয়ে বলল, বাবু তুমরা জ্ঞানমান মানুষ, তুমরা যা কইবো সব মানিই যাবে। বাবু মুখে কুনো খাজনা বসেনি, যত দুষ তো চাষা-হ্যাবড়ার। আমি খুব অবাক হয়ে শুধোলাম, কী বলছিস তুই? রবার্টের সাথে তোর কী এখনও ভাব-ভালবাসা নেই?

না গো বাবু, বেস্‌তো করি—তুমি চুপ কর। ওর নাম আর মুখে ধরোনি। শুকু কঠোর গলায় কথাগুলো বলে সংকোচে মুখ নিচু করে দাঁড়াল। পাতলা অন্ধকারে, তার গর্ভস্থ পেট নড়ছিল হঠাৎ উত্তেজনায়। ধুঁকতে-ধুঁকতে সে আবার ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল। আমি চাষাড়ে, অশিক্ষিত, বিবেক বিবেচনাহীন মানুষের গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, তুই মা হতে চলেছিস, এ কথা কী মিথ্যে?

খিলখিলিয়ে হেসে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল শুকু, কেমন সবেগ তাচ্ছিল্যের সাথে মুখের উপর হেলে পড়া চুলগুলো ঘাড়ের কাছে ঠেলে দিয়ে ভারাক্রান্ত গলায় বলল, বাবু তেমন কপাল কি মোর হিবে? ডাক্তারবাবু কইচে, মুই কুনোদিন মা হিতে পারবনি! মুই নদী কিন্তুক মোর জলটা বড়ো নুনিয়া, নুনকাটা গো! তুমার পিয়াস লাগলে, ছাতি ফাটি গেলে—এক আঁজলা পি লিতে পারবনি। তুমি মরব, মুই খাড়িই খাড়িই দেখবা। এর চাইতে মোর মরি যাওয়া ঢের ভালো। মোর নারী জনম বেথা গো! ডুকরে কেঁদে উঠল শুকু। তার মর্মস্পর্শী কান্নায় আমার মন ভরল না; আঘাত দিয়ে বললাম, চোখের সামনে যা দেখি তা কী মিথ্যে, বানানো? হতে পারে না! তুই আমার কাছে শুধু শুধু গোপন করছিস কেন?

বিদ্যুৎপৃষ্ট মানুষ অমন ঘাবড়ে যায় না, শুকু গলগলিয়ে ঘেমে কান্না-কান্না মুখ তুলে, অসহায় চোখে আমার দিকে তাকাল, তারপর গায়ে পেঁচানো

শাড়িটা ওই আবছা অন্ধকারে ঘূর্ণায়মান নাচের মুদ্রায় খুলে ফেলল কোমর পর্যন্ত, আমি সবিস্ময়ে দেখলাম—ওর মেদহীন কাঁঠালীচাঁপা পেটের সাথে আশ্চর্য কায়দায় বাঁধা আছে মদভর্তি ঢাউস একটা ব্লাডার। ব্লাডারটা খুলে ফেলে নিঃসংকোচে আমার হাতে ধরিয়ে দিল শুকু, হা দেখ বাবু, মোর গর্ভের সন্তান! প্রাণ ভরিকি দেখ। কথা শেষ হল না তার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়ল শুকু। আমি তাকে যত শান্ত হতে বলি, সে আরও অবুঝ কান্নায় ভেঙে পড়ে। এক সময় নিজের ইচ্ছায় থেমে গেল সে। চোখের কষ আঁচলে ঘষটে নিয়ে বলল, কুইলা তুলতে আর যাইনে বাবু, সেখানে বড়ো জ্বালা। গুরুবারি মউসি মোকে ঠেলে দেয় হ্যাটাবাঘের মুখে। ঠাট্টা করি কয়, বিটিয়া, তুর তো কুনো ডর নাই। তোর পাথর-চাট্টান গতর, বীজ ফেললেও ট্যাঁক্ গজাবেনি। যা, তুই গিয়ে বাবু-ভাইদের টুকে সংগ দে। সেই ফাঁকে কাজ হাসিল করে নিব আমরা। উপরওলা তুরে রূপ দিয়েচে কিন্তুক বেবুশ্যে হওয়ার গুণ দেয়নি। পেট দিয়েচে, এসব না করলে তারে তুই পালবি কী করে? আমি যা বলি শুন্ বিটিয়া, তুর কুনোদিন ভাত-কাপড়ের অভাব হিবেনি। কাঁহাতক আর শুনা যায় বাবু, মুই হেঁপ্সে উঠেচি। তাই, সে ধান্দার মুখে লাথ্ মেরে এ ধান্দায় নেমেচি। জানি না বাবু, শেষতক্ আমার কী হিবে।

আমি হাঁপিয়ে উঠছিলাম কথা শুনে, শুকু নির্বিকার চোখে তাকিয়ে কাপড়-চোপড় ঠিক করে নিয়ে কষ্টের হাসি হাসল, তারপর সে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন সে কিছু বলতে চায় আমাকে।

আমি শুধোলাম, কিছু বলবি, শুকু?

শুকু ঘাড় নাড়ল আলতোভাবে, আমাকে বলা ঠিক হবে কিনা এমন সংশয়ের গভীর খাদান থেকে উঠে এসে আড়ষ্ট স্বরে বলল, বাবু, মোর মরদটার অসুক। কিছু খাইতে পারেনি। পেট শুলোয়। দিনভর খালি কোঁকায়। মোকে খপর পেঠিয়েচে। খালি হাতে তো যাওয়া যায় না। তুমার কাচে বিশটা টাকা হিবে বাবু?

শুকুর মিনতিভরা চোখদুটো দেখে আমার খুব মায়া হল; তবু ওকে পরীক্ষা করার জন্য বললাম—রবার্ট তো তোকে দেখে না, তাড়িয়ে দিয়েছে তবু তার উপর তোর এত টান কেন?

শুকু কেমন রুগ্ণ একটা হাসি ছড়িয়ে দিল তার ঠোঁটে, মনমরা স্বরে বলল, তুমি যা কও, ঠিক কও বাবু। কিন্তুক সে তো আমার সোয়ামি। তার খারাপ কিছু শুনলে বুক আমার টাটিয়ে উঠে গো। হাজার শত্রু হিলেও তার কাচে মোকে যাইতে হিবে। হা দিখো বাবু, এই শাঁখা-সিন্দুর সব তার দেওয়া। মায়ামানুষ ঘর না পাইলে তার যত দুঃখ হয়—তার চাইতে ঢের দুঃখ বেশি হয় যখন সিন্দুর পুঁছি যায়, শাঁখা ভাঙি যায়।

আমি শঙ্কুর মুখের দিকে অপলক তাকালাম, জলে ভেজা বাঁশপাতার মতো টানা-টানা চোখ দুটোর দিকে আমি বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না ; একটা কুড়ি টাকার নোট ওকে দিয়ে বললাম—এটা আর ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আমি সময় পেলে রবার্টকে একবার দেখে আসব। ও আমাদের অনেক উপকার করেছে। মাস কাবারি বাজার তো ওর রিক্শায় করে আনতাম। যাক, তুই ওকে মদ-হাঁড়িয়া খেতে বারণ করিস। ডাক্তার যখন নিষেধ করেছেন, তাঁর কথা শোনা উচিত। নাহলে—

শঙ্কু কাচুমাচু মুখে বলল, সে মোর কথা শুনেনি বাবু। তবু তুমি যখন বলচ তা মুই তার কানে পেঁচে দিবা। শুনা-না-শুনা সব তার উপর। তবে কী জানো বাবু, অখনকার দিনে হাঁড়িয়া চাউল থিকে শুরু করি রেণু অব্দি সব খারাপ থাকে। রেণুতে নাকি আজকাল ভালা নেশা হয়নি তাই, হাঁড়িয়া ঠেকের মালিকরা মুঠা-মুঠা ইউরিয়া মেশায় পচা ভাতের সাথে। সেই ইউরিয়া পচাতানুজল পেটে ঢুকি লাড়ি-ভুঁড়ি সব পচিই দেয়। পরথ্‌ম-পরথম্‌ বোঝা যায়নি, যত দিন যায় তত বোঝা যায়। রিক্শা টানা গতর, ওসব ছাইপাঁশ খাইলে টিকবে কেনে, যা হবার ছিল তাই হয়েছে !

রেলপুলিসের কাছে ব্লাডার ভর্তি মদ পেঁছে এসে শঙ্কু গিয়েছিল রবার্টের ঘরে। ভাড়া রিক্শাটা দাঁড়িয়ে ছিল আমগাছের নীচে। সিটের উপর কুঁকড়ে কুকুরকুণ্ডুলি হয়ে শুয়েছিল রবার্ট। শঙ্কুকে দেখে সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে বলল, ক-দিন থিকে ভাবছিলাম—তুই আসবি। তা এয়েচিস, ভালো করেচিস। তারপর এক লাফ দিয়ে সে নেমে এল রিক্শা থেকে, কুঁজো হয়ে ঘরে ঢুকে বের করে আনল দড়ির খাটিয়াটা ! শঙ্কুকে বলল, বস্‌। চা খাবি ? ঘরে চিনি-চাপাতা সব আচে। দাঁড়া, আমি ইস্টোব ধরিয়ে বানিয়ে আনি।

নিজের ঘর, তবু সংকোচে ডুবে যাচ্ছিল শঙ্কু। কোনও মতে চোখ রগড়ে নিয়ে, দুটো কমলালেবু আর আঙুরের ঠোঙাটা নামিয়ে রাখল খাটিয়াতে। মন কেমন করা গলায় শুধোল, আচ কেমন আচো গো ? তার কাঁপা-কাঁপা প্রশ্ন শুনে হাসল রবার্ট, শঙ্কুর পাশে বসে হাসতে হাসতে বলল, আমি মরব না, যম আমাকে এত জল্‌দি খাবে না। নিশায় আমার শরীল বিষ হয়ে গিয়েচে, যমরাজ কামুড় মারবে কুথায় ? —বলেই সে শঙ্কুর চোখে চোখ ফেলে স্বতঃস্ফূর্ত গলায় বলল, সেদিন এট্টা কাঁকড়াবিছা গোড়ালি দিয়ে উঠে গিয়ে দাপনার কাছটাতে কেমড়ে দিল। প্যাণ্ট পরা ছিল। পিঁপড়ের কামুড়ের মতোন জ্বলে যেতে ভাবলাম, পোকায়-টোকায় কেটেচে হয়তো। পোকা ভেবে হাতে করে দলে মেরে ফেললাম। পরে চান করার সময় প্যাণ্ট খুলে দেখি পোকা নয়,—মরে আচে এট্টা কাঁকড়াবিছা।

তাহলে ভেবে দ্যাখ শরীলটা কেমন আমার বিষে বোঝাই। কাঁকড়াবিছার কামড়ও আমার কাচে পিঁপড়ার কামড়ের মতোন মনে হয়! রবার্ট ফুর্তিতে থাকা মানুষের মতোন গলা ছেড়ে হা-হা করে হাসল, তারপর শকুকে চুপচাপ দেখে ফিরে গেল অন্য প্রসঙ্গে, আমার জন্যি ভাবিসনে, ডাক্তার বলেচে, আমার পেটের ভেতরটা নাকি কুমড়ার মতোন পইচে গেছে। কেটে বাদ দিতে হবে লাড়ি-ভুঁড়, নাহলে সারবেনি।

লেবু ছাড়িয়ে একটা-একটা কোয়া রবার্টের হাতে দিচ্ছিল শকু. লেবুর পরিচিত মিষ্টি গন্ধটা ঘর ছাড়িয়ে ভেসে গিয়েছিল অনেক দূর। রবার্ট এক দৃষ্টিতে শকুর দিকে তাকিয়ে রগড় করে বলল, তুর ঠোঁট দুটা লেবুর কোয়ার মতোন, একেবারে টুসটুসিয়া রসে বোঝাই। সব মেয়েছেলের ঠোঁট এমন হয় না। তা, তুই কেনে খামোখা আনতে গেলি এসব? তোরই বলে সন্‌সার চলে না!

শকু দুঃখ পেল, সব দিন তো আনি না, তেমন অত্তার জোর কী মোর আচে; হা, মেসবাবুর সাথে দেখা হিলা, তার কাচ থিকে বিশ টাকা উধাম লিচি। বাবু কইলা, আর ঘুরোন দিতে হবে নাই।

সব ভেন্‌গে ফেলেচিস? শুধাল রবার্ট। তার সেই অস্থির চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠল শকু, আমতা-আমতা করে বলল, দশ টাকা অখনো আচে।

দে না টাকাটা? হাত পাতল রবার্ট। শকু সন্দেহ নিয়ে তাকাল, টাকা নিয়ে কী করবা? মুহূর্তে রাগে ধক্‌ধকিয়ে উঠল তার চোখ, আগুন উগরে বলল, মরতে বসেচো, তবু তোমার শেক্ষা হল না। ছ্যা ছ্যা, মুই কার জন্যি ছুটি আইলিগো। অমন মাতাল মানুষের ঘরে না আইলেই ভালা হিতা! টাকার খুঁট থেকে খুলে ঘৃণাভরে রবার্টের দিকে এগিয়ে দিল সে, কটাক্ষ করে বলল, যাও, গিলি আস। হাঁড়িয়া-মদ না খাইলে তুমার তো নিদ্ হিবেনি। আপন খেয়ালে ঝাঁকা দেওয়া শিউলিডালের মতো কেঁপে উদ্‌গত কান্নায় ভেঙে পড়ল শকু। অপমানিত, অপ্রস্তুত রবার্ট বলল, টাকাটা আমি দারু-হাঁড়িয়া গেলার জন্যি চাইনি। আচ ধ্যাঙ্গড় বস্তিতে শুয়োর মারচে, মালটা একেবারে বিলাতি। দশটা টাকা পেলে আধা সের মান্‌সো আনতাম। ক-দিন থিকে ভালো-মন্দ কিচু খাইনি।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পেল শকু, চোখের জল মুছে নিয়ে বলল, খপ্‌খপ্ যাবা, খপ্‌খপ্ আসবা। আমি তুমার ঘরদুয়ারগুলা গুছিই দিই। যা হি আচে, গোড় ফেলতেও ঘেন্না লাগে!

রবার্ট কী ভেবে যেন বলল, আচ তুই আমার দুয়ারে থাক। রাঁধা-বাড়া করে দিবি। হোটেলে খেয়ে-খেয়ে ক্ষিদে ভাবটা মরে গেচে। কতদিন যে মেয়েছেলের হাতের রান্না খাইনি!

শঙ্কুর গালে টুস্‌কি মেরে রবার্ট চলে গেল লাফাতে লাফাতে। ফাঁকা ঘরে দুঃখিনীর মতো গালে হাত দিয়ে বসে রইল শঙ্কু। সব কিছু যেন ঝাপসা ঠেকছিল তার কাছে। ভাবনারা জড়ো হচ্ছিল মনে মনে। আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখছিল সে। ধীরে-ধীরে ঝড়ো হাওয়ায় ভরে উঠছিল বুকের বাগান। শরীর জুড়ে অস্থির এক দুলুনি। বিয়ের রাতে এমনটা তার হয়েছিল। এখন এই জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতে সেই একই ভাবনা মনের দরজায় করাঘাত করতেই ভয় পেয়ে মুহুর্মুহু চমকে উঠল শঙ্কু। দীর্ঘাঙ্গীর গলা চুইয়ে ঘামের ধারা বুকের খাড়ি পথে এসে ঠেকেছে। চারদিকে অসহ্য ভ্যাপ্‌সা গরম। ঘাড়-বুক-পিঠ গলার ঘাম মুছে ধীর পায়ে বাইরে এল শঙ্কু। আকাশ জুড়ে খড়িফোটা চালকুমড়ো বরণের একটা চাঁদ বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায় ভরিয়ে দিয়েছে চরাচর। তার বাপ বলে, কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গি গেলে জোড়া লাগেনি বিটি। সন্‌সার, মন, ধরম—এই তিন হল কাঁচা হাঁড়ির মতোন। বাপের কথাগুলো মনে করে শঙ্কুর চোখ ভরে এল জল।



নয়

সুখ পাখিটার পালকের রঙ নীল, মাথার উপর আকাশের রঙ নীল, যে যন্ত্রণা বুকের খোদলে সে-ও এক অপরাজিতা নীল। শকু হাঁপিয়ে উঠে দৌড়ে এল ঘরে। ভাঙা আয়নায় সে নিজেকে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যে সুখ বুক ঠেলে উঠে আসার কথা তা পেল না ঠিকই, কিন্তু অনেকদিন পরে সে নিজেকে সুখী ভাবল ; কোনও এক অজ্ঞাত সুখের শিহরণে তার ভেতরে মেঘ-বিদ্যুৎ-এর খেলা চলল অনেকক্ষণ. সুখী-পরিতৃপ্ত শ্বাস ছেড়ে সে ভাবতে শুরু করল এই অগোছালো, ছন্নছাড়া, এলোমেলো ঘরটা তার নিজের। রবার্ট তাকে তাড়িয়ে দিলেও নদীর চোরা স্রোতের মতো এক অপ্রতিরোধ্য টান বা আকর্ষণ সে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে - যা মিথ্যে নয়, বস্তির সম্মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা শিশমগাছটার মতো অস্তিত্বময় সত্যি। মদের বোতল, সিগারেটের খালি প্যাকেট, পুরনো খবরের কাগজ, পোড়া বিড়ি-সিগারেটের টুকরোয় ঘরের মেঝে একবারে গা ঘিন-ঘিনে নোংরা। পা ফেলতে গেলেও যেন ঘেন্না হয়! শকু খুঁজে পেতে একটা ঝাঁটা এনে কোমরে আঁচল গুঁজে খুব যত্ন নিয়ে ঘরটাকে পরিষ্কার করে ঘাম মুছল কপালের। রবার্টের ময়লা জামা-প্যাণ্টগুলো ঝুলছিল এখানে-সেখানে, মনে মনে ভাবল, কাল পোয়াটাক সোডা এনে প্যাণ্ট-জামাগুলো সাফা করে দেবে সে।

এমনিতে সুপুরুষ রবার্ট, গায়ের রং উজ্জ্বল ফর্সা না হলেও নজর কাড়া তামাটে বরণ, একভাবে দেখলে চোখের তারা কেঁপে ওঠে শকুর। মনে হয়, ওই পুরুষটার ঘাম বুকে ভেজা সপ্‌সপে গেঞ্জির মতো লেপটে গিয়ে পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দিতে। সে খুব ছেলেবেলা থেকে স্বপ্ন দেখত, তার কোনও স্বপ্ন আজ অব্দি সত্যি হয় নি। সব হাতের মুঠোয় এসে ছড়ছড়ানো চ্যাংমাছের মতো পালিয়ে গেছে কাদায়। দুঃখের সেই পাঁক থেকে কিছুতেই নিজেকে আর উঠিয়ে আনতে পারেনি শকু। মাঝেমাঝে নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে তার কান্না পায়, বুক শুকিয়ে আসে, জিভটা কে

যেন ভেতর পানে টেনে ধরে। তখন গলগলানো ঘামের ধারায় সে ভিজে যায়, শরীর থেকে আপনা-আপনি সৃষ্টি হয় তপ্ত নিঃশ্বাস. হাই ওঠা জড়তায় সে বুঝতে পারে পেট ভরা থাকলেও এই শরীর আকুপাকু করে খুঁজছে বিপরীত উষ্ণতা, রবার্ট যা তাকে শুধুমাত্র একদিনের জন্য দিয়েছিল—তেমন পুরুষালি দেহ-উত্তাপ। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ফটোর কাছে দাঁড়িয়ে বিড়বিড়িয়ে ওঠে শুকুর ঠোঁট, সে কাতর হয়ে বলল, হে ঠাকুর, হে ভগবান, তুমার দুটা গোড়তল ধরি, আমার পুরনা রোগটা ভালা করি দাও। সব মেয়েমানুষ তো ঘর সনসার চায়, মরদের পাথর-চাট্টান বুক চায়। মোকে তুমি সব দিইকি কেনে কাড়ি নিলো গো ঠাকুর! মুই তো কুনো দুষ করিনি। মুই তো শিবলিঙ্গে জল দিচি বছর-বছর যেমন সব মায়াঝি দেয়। বুকের গভীর থেকে ফোঁপানিটা উঠে আসতেই গলাটা জড়িয়ে গেল শুকুর। যিশুর কাঁচ বাঁধানো ফটোর কাছে একটা ধূপ জেবলে দিয়ে বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাইরে এল সে। জ্যোৎস্নায় থই-থই করছিল চরাচর, পদ্মপুকুরের পাশ থেকে উঠে আসছিল জল সোহাগে গদগদ শীতল বাতাস। কিছুদূরের চারা আমড়া গাছটাকে তার মনে হল সবুজ শাড়ি পরা বাবুঘরের বিটি। হাওয়ায় চুল উড়ল ফরফরিয়ে, আঁচল উড়ল লাজবতী লতার মতন। তার চিহড়লতা মুখটা সুখ ভাবনায় ঘেমে তেলঘাম প্রতিমার মতো চকচকিয়ে উঠল নিমেষে। যতদূর নজর যায় ততদূর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল সে। বালাজি মন্দিরের কাছে সে রবার্টকে আসতে দেখে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল টানা বর্ষায় সংগীতপ্রিয় ব্যাঙের মতন। বরার্ট এসেই রঙলাগা থলিটা ধরিয়ে দিল তার হাতে, খুশিতে চনমনিয়ে বলল, দেরি হয়ে গেল! ফেরার পথে লাট্টু সিংয়ের সঙ্গে দেখা হল। তার বউ মালতী তারে খুন্তি ছুঁড়ে মেরেচে। কপালটা হা-হয়ে কেটে গিয়েচে চার কড়া। মেসবাবুরা দেখলাম,—তারে রিকসায় করে রেল হাসপাতালে নিয়ে গেল। ছিঃ-ছিঃ, দজ্জাল বউ থাকার চাইতে না থাকাই ভাল।

কোনও মন্তব্য না করে মুখ ঘুরিয়ে নিল শুকু। লাট্টু সিং মানুষটাকে তার মোটেই পছন্দ হয় না। ওই মানুষটার খপ্পরে পড়ে রবার্টের আজ এই শোচনীয় অবস্থা। বিয়ের আগে শুকু দেখেছে—লাট্টু সিং স্টেশনে এসে এটা-সেটা, সাত-সতের কথার প্রলোভনে ভুলিয়ে রবার্টকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রেল লাইনের ধারের মদ-ভাঁটিটায়। সে রবার্টের মেহনতের পয়সাগুলোই ধসিয়ে দিত, নিজের বেলায় সে আঁটিসুটি, পরের বেলায় চিমটি কাটি স্বভাব। লাট্টু সিংয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই মুখটা ভার হয়ে গেল শুকুর, কে যেন দুধ থেকে মাখন তোলার মতো তার এতক্ষণের তিলে তিলে সঞ্চিত আনন্দ-আবেগ উচ্ছ্বাস সব নিংড়ে নিল জোর করে, ফ্যাকাসে-মলিন-বিবর্ণ মুখ তুলে সে রবার্টের দিকে তাকাল, তারপর জ্বালা ধরা গলায় বলল, ট

মানুষটা তুমার ভালা চায় না গো, তার চক্ষু দুটায় বড় ক্ষুধা। সি মোকে কেমন ধারা চোখ মেলি দ্যাখে। মোর ডর লাগে, কলিজা কাঁপি যায়। ভুল করিকি মুই তার কাচে যাই না। করাত কলের পাশ দিয়ে মুই আর হাঁটা-চলা করি না। তবু বটুদাদার চা-দুকানে দেখা হিলে সি মোকে জোর করি চা টোস্টো খাওয়ায়। কয়, শুকুরে, তুর মরদটার লজর লাই, লজর থাকলে সে ঠিক তুরে বুকে করে আগলে রাখত, অমনধারা মর্দা মানুষের মতন ঘুরতে দিতানি তোকে। তা, তুরে আমি অন্য চক্ষুতে দেখি। সুবিধা-অসুবিধা জানিইবু। মুই তোর পাশে আচি। মোর জীবন পরের সিবায় কাটি গেলা। পরের ভালা হিলে মোর ভালা। দম ধরে থাকল রবার্ট, রাগের ফোঁসানিটা তবু ছিটকে এল বাইরে, শ্লা, মুরগাখোর, তার জিভ আমি উপড়ে লিব। দাঁড়া, শালার সঙ্গে দেখা হোক, তার চক্ষু দুটা আমি আঙুল ঢুকিয়ে মাছের চক্ষুর মতো গেলে দেব। রবার্ট গজগজিয়ে উঠল রাগে, তারপর ভোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, মালতী ভাবি, খুন্তিটা ওর বুকে ঢুকিয়ে দিলেই ভাল হত। পাপ ঝরে গেলে দুনিয়া বাঁচে।

আসার সময় চপ-সিঙাড়া এনেছিল রবার্ট, খবরের কাগজে মোড়ানো চপ-সিঙাড়া এখন একেবারে কুয়োর জলের মতন ঠাণ্ডা। তেলেভাজার ঠোঙাটা শুকুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে রবার্ট বলল, ঘরে মুড়ি আচে, ভাল করে পেঁয়াজ-তেল-মিরচা দিয়ে মাখ্। ক্ষিদেয় পেট চটকাচ্চে, না খেলে আবার পাক দেবে গা-টা। তুইও তো কিছু খাস্‌নি, কী-রে, অমনধারা যে দেঁড়িয়ে থাকলি ?

ভুজা খেলে মোর অম্বল হয়; চুয়া ঢেকুর ওঠে, বুক জ্বলি যায়। মুই খাবানি! শুকু তাড়াহুড়ো করে বলল, মোকে ঘর যাইতে হিবে, নাহলে বুড়ো বাপোটা ভাববে।

শুকুর ঘর যাওয়ার কথা শুনে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে কেমন উদাস হয়ে গেল রবার্ট, অত্তো মানসো আনলাম, কে খাবে তাহলে? তুই না খেলি পরে—আমিও খাব না, যা! রাঁধতে হবে না, কুকুরের মুখে ঢেলে দিয়ে আয়। আমি জানি রে, ঘর পুড়ে খাক হয়ে গেলে লোতুন করে ছাওয়া যায়, বানানো যায়,—কিন্তুক মন পুড়ে গেলে তা ধূপবাতির মতো পুড়েই যায়, শুধু ছাই পড়ে থাকে। সেই ছাই মানুষের কোনও কাজে আসে না। শুধুই বিবায়।

কী বুঝে শুকু বলল, ছেপ ফেলে চাটতে নেই গো, তাতে জিভের ধর্ম চালি যায়। মানুষের একবার ধর্ম চলি গেলে তা-সে দ্বিতীয়বার আর ফিরে পায় না। তুমি যা ভালা বুঝো করো। আমার ধর্ম তো তুমি লিয়েচো, তুমাকে মুই আর ডরাই না।

রাতে চট বিছিয়ে শুয়োরের কষা মাংস আর গরম ভাত খেল ওরা। রবার্ট শুকুর রান্নার তারিফ করে বলল, মন ভরে গেল রে, কতদিন যে অমন তৃপ্তি করে খাইনি!

এঁটো হাতে শুকু অস্থির চোখে তাকাল, বুজে আসা গলায় সে কোনও মতে বলল, অনেক রাত হিলা গো, এবার মুই ফিরবা। বাপোর শরীলটা ততো ভালা নেই। ক-দিন হিলা খালি রস কাটচে, ফাটায় হাঁটা-চলা করতে পারেনি। খু-উ-ব কষ্ট পায়, সি কষ্ট চক্ষেতে সওয়া যায়নি।

চার্চের পাদ্রিরা এসে মাঝে মাঝে বিনে পয়সায় ওষুধ দিয়ে যায় বনমালীকে। সাদা পোশাকের দিদিমণিগুলোও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সংবাদ নেয়। চিকিৎসা বলতে এই টুকুই ভরসা। বনমালী হা-পিত্তেশ চোখে কবে চার্চের গাড়ি আসবে সেই অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকে। শুকু সব জেনে-বুঝে চুপ করে থাকে। বনমালীর ঘাগুলো থেকে রক্ত পুঁজ ঝরলে সে বড়জোর খ্রিশ্চান হাসপাতালের বিনামূল্যে দেওয়া মলমটা টিপে-টিপে যত্ন নিয়ে লাগিয়ে দেয় ঘায়ে।

এঁটো হাত ধুয়ে এসে একটা বিড়ি ধরাল রবার্ট। শুকু বসনগুলো ধুয়ে জলহাতে রবার্টের সামনে দাঁড়াল। ফাঁকা ঘরে তার বুক কাঁপছিল দুরু-দুরু। লজ্জায় রবার্টের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না সে। দূরের আদিবাসী গ্রাম থেকে ভেসে আসছিল মিঠে-মিঠে মাদলের বোল। জ্যোৎস্নায় খুনসুটি করছিল রাত্রিমথ, ঝিঁঝির সুরেলা ডাক আড়বাঁশির সুর হয়ে আছড়ে পড়ছিল কানে। লজ্জা আড়ষ্ট চোখ মেলে রবার্টের দিকে তাকাল শুকু, অনর্গল ঘামের ধারায় ভিজে গিয়ে সে কেমন জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল। রবার্ট পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে শুকুর প্রতি মনোযোগী হল, এক আদিম নেশায় তার চোখের পাতা নেচে উঠতেই হাত বাড়িয়ে নিজের কাছে টেনে আনল শুকুকে। শুকুর মুখে কথা নেই, রবার্টের গরম নিঃশ্বাসে সে পুড়ছিল, আর সেই অক্ষমতাজনিত পুরনো ভয়টা দুরারোগ্য ব্যাধির আকার ধারণ করে বড় দুর্বল করে তুলল তাকে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও রবার্টের দৈহিক আবেদনে সে সাড়া দিতে পারল না, আরষ্ট শরীর নিয়ে দূরে সরে থাকল। রবার্ট আলতো করে মেয়েলি হাতটা তুলে নিল তার লোমশ বুকে, অস্থির হয়ে বলল, খুঁত সব মানুষেরই থাকে, তা বলে তুই কেনে মড়ার মতো বসে থাকবি? আয়, কাছে আয়। কথদিন তুরে লেড়ে-ঘেঁটে দেখিনি। মনটা, শরীলটা, বুকটা বড় তড়্পায়। নষ্ট হয়ে যাওয়া সহজ। তবু, আমি নষ্ট হয়নি। রিক্সা টেনে শরীলটা যখন আরাম চায় তখন ভেতরে যে পশুটা থাকে সে বড় গরজায়। তার কুনো দোষ নাই। যে বয়সের যা ধর্ম! কথদিন তুই শুখা পেটে থাকবি? পিত্তি চটকে গেলে তখন শুধু তিতাজল উঠে মুখে।

শঙ্কু এবারও কোনও কিছু বলল না, রবার্ট অসহ্য হয়ে উঠল মনে মনে। শঙ্কুর হাতটা মুখের কাছে চেপে ধরে চুমা দিল বারবার। এবার 'উঃ, আঃ' করে অব্যক্ত যন্ত্রণায় মোড়া মেরে উঠল শঙ্কু, রবার্ট তার পা দিয়ে চেপে ধরল শঙ্কুর ঈষৎ কাঁপা-কাঁপা পা দুটো। শঙ্কু অস্ফুটে বলল, অমন করোনি গো, মুই মরি যাবা। তুমি তো জানো, মোর খুঁতে বোঝাই শরীল, এই জড় শরীলে তুমার দেহের তাপ কমবেনি। মুই তুমারে কইটি, তুমি ঘুরে আর সুটে শাদী কর। তুমি সুখী হলে মুইও খুশি হবা।

রবার্ট শুধোল, এ তোর ভেতরের কথা?

শঙ্কু আবার কেঁপে উঠল, অসহায়-ব্যথিত দৃষ্টি মেলে সে তার মনের ভাব বোঝাবার চেষ্টা করল। অবুঝ রবার্ট তার কোনও কথাই শুনল না, শঙ্কুর ঘাড়ের উপর দিয়ে দুহাত বাড়িয়ে জোর করে টেনে আনল বুকের কাছে, তারপর ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, তোর দুঃখটা আমি বুঝি। মানুষের স্বভাবই হল—দুঃখের মধ্য দিয়ে সুখ খোঁজা। কেঁচুয়ার হাড় নেই তবু সে মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে ঘর বাঁধে। আমি মানুষ, আমি কেন তোরে সারিই তুলতে পারব না?

ঘরের একমাত্র ডিবরি নিভে যায়, জ্যোৎস্না আর জোনাকি এসে লুটোপুটি খেলে আঙিনায়। দড়ির খাটিয়ায় সম্পূর্ণ বিবসনা শঙ্কু কাদামাছের মতন পাক মোড়া মারে ঘন ঘন। কাম জ্বরে ফুলে ওঠে তার ঠোঁট, আধো-আধো স্বরে বলে, ছুঁয়ো না, মোকে ছুঁয়োনা। মোর শরীলে বিষ নাই গো। বিষে বিষক্ষয় না হলে কারো যে সুখ হবে না!

রবার্ট হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল শঙ্কুর দরাজ, উন্মুক্ত, ঘুঘু নরম দুই বুকের উপর। শঙ্কু তাকে দু-হাত দিয়ে বাধা দিতে গিয়েও পারল না। রবার্ট অক্লান্ত কৌরবের মতো এক তরফা যুদ্ধ করল সেই ফুল্ললিত জ্যোৎস্না মাখামাখি শরীরে, শেষে চাঁদ ডুবে গেলে পরাজিত সৈনিকের মতো ঘাড় নীচু করে নেমে এল খাটিয়া থেকে। গায়ে অবাঞ্ছিত ঘাম মুছে নিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে ধক্ ধকানো চোখে তাকাল শঙ্কুর দিকে। চটেরবালিশে মুখ ঠুসে ফুলে-ফুলে কাঁদছিল অভিশপ্ত মেয়েটা। তার কান্নায় মন ভিজল না রবার্টের, মেজাজ চড়িয়ে বলল, তু একটা মাকাল ফল, তোর না আচে সুয়াদ না আচে বেরান। যা উঠ্, ঢঙ করে আর কাঁদিস না। আচ রাতের ঘুমটা আমার বরবাদ হল। যেটুকু শান্তি ছিল তা-ও আমি হারালাম।

শঙ্কুর ফোঁপানি তখনও থামেনি মুখ ঘুরিয়ে বলল, কেনে ছুঁলে, কেনে ছুঁলে, তখন তো কইলি মোর বিষ নাই, ফণা নাই, তেজ নাই। মোর কতা তো তুমি শুনলোনি! অখন মোকে দুষ দিইকি কী হিবে?

তোর কুনো দুষ নাই; যা তু আমার সম্মুখ থিকে তফাৎ যা। আমার কাচে আর আসিস না। তাচ্ছিল্যটা শানানো তীরের ফলা হয়ে গিঁথে গেল

শঙ্কুর বুকে। ক্রোধে, অভিমানে আঁচের চেয়েও লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখটা। তবু নিজেকে সে সামলে নিয়ে নিশ্চল চোখে তাকাল।

ডিবরি ধরিয়ে তাকের উপর থেকে মদের বোতলটা পেড়ে আনল রবার্ট। ছিপি খুলে কাঁচের গেলাসে ঢেলে ফেলল মদটা। জল মেশাল না, গ্লাসটা ঝাঁকুনি দিয়ে শঙ্কুর দিকে তাকিয়ে ঢকঢক করে নিঃশেষ করল গ্লাসটা। তারপর, মুখ মুছে নিয়ে বলল, মদে যা শান্তি পাই, তোর ওই শিমুল ফুল শরীলে তার এক ফোঁটাও পাই না। আমি কী করব, আমি তো ভাল হতে চেয়েছিলাম। পারলাম না।—চুলের মুঠি চেপে অতর্কিতে ডুকরে উঠল রবার্ট, চলে যা, তু আমার ছিমু থেকে চলে যা। আমি তোর মুখ দেখতে চাই না।

শঙ্কু কোনমতে শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে টলতে-টলতে বেরিয়ে এল বাইরে, রবার্ট তার পিছু-পিছু এল কিছুটা, তারপর গলা ফাটিয়ে ডাকল, শঙ্কুরে, এ শঙ্কু—অমন ধারা পাগলের মতো কুথা চল্লি? দাঁড়া, বলচি—শঙ্কু দাঁড়াল না, হনহনিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

পরেরদিন সকালে শিশমগাছের মাঝের ডালে বিয়ের শাড়িটা পরে গলায় ফাঁস নিয়ে মরে কাঠ হয়ে ঝুলে থাকল শঙ্কু। তার বুড়া বাপ ঘা শরীর নিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদল। পাড়া-পড়শীরা সান্ত্বনা দিল তাকে, গলার কাঁটা নেমেচে গো, তুমি ইবার চুপ যাও। সে বেচারি না মরলে সুখ পেতোনি। সে সুখে থাকুক, বাপ হয়ে তুমি কি এটা চাও না!

বনমালী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, সে মোর বেটার মতন ছেলো গো, কামাই করে খাওয়াত। সে তো মরলা, মোকেও মারি গেলা! অখন ঘাট খরচের পয়সা নেই, বাসি মুড়দার আগলে মুই যে চক্ষুতে আন্ধার দেখি।

*　　　*　　　*

সকালবেলায় অফিসের কাজে বড় জামদা যেতে হয়েছিল আমাকে। ফিরে এলাম বিকেল লাগার মুখে। আমাদের মেস-ম্যানেজার পরিমল হাসি-হাসি মুখ করে একটা খাম এগিয়ে দিল আমাকে, রসিকতা করে বলল, প্রেমপত্র বুঝি, এত যে ভারী?

আমি ওকে শান্ত করার জন্য হাতের লেখাটা ভাল মতন দেখে নিয়ে বললাম, তোর আইডিয়াটা ঠিক নয়। এটা সন্দীপের চিঠি। জানিস তো, সন্দীপ এখন আর-জি করের ডাক্তার। নতুনদের মধ্যে বেশ নাম করেছে, এখনও পেশাদার চটক আসেনি ওর ব্যবহারে। ছেলেটা ভাল, এখনও চিঠি লেখে মাঝে মাঝে। পরিমল যতটুকু শোনার ততটুকু শুনেই উঠে গেল

বাইরে। আমি চিঠিটা খুলে গা এলিয়ে দিলাম চেয়ারে।

সেবার কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল শিয়ালদা স্টেশনে। তখন ছ-নাম্বারে লালগোলা দাঁড়িয়ে, ও ব্যস্ত হয়ে বলল, যাবি না, মাখন? লেট করলে ট্রেনটা তুই ফেল করবি।

পাশাপাশি বসে কত সুখ-দুঃখের গল্প হল। কথায়-কথায় শকুর প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিলাম আমি। সব শুনে ও কেমন নিরুৎসাহ গলায় বলেছিল, পেশেন্টাকে আগে দেখতে চাই, না দেখে কোনও রিমার্কস পাস করা ঠিক নয়। তবে কেসটা কম্পলিকেটেড। পেসেন্ট পার্টির কি সামর্থ্য হবে কলকাতায় এসে ট্রিটমেণ্ট করানোর?

আমি বলেছিলাম, ওরা খুব গরিব, ফ্রি-বেড পেলে ভাল হয়। তুই দেখ না—একটু চেষ্টা করে, যদি মেয়েটা আবার নতুন করে বাঁচতে পারে?

সন্দীপ বেঁচে ওঠার কথাই লিখেছে।

আগামী সতেরো তারিখে শকুন্তলাকে নিয়ে তুই একবার কলকাতায় আয়। সিনিয়র ফিজিশিয়ানের সঙ্গে কনসাল্ট করেছি। উনি বলেছেন, কেসটা ইন্টারেস্টিং! মাইনর একটা অপারেশান করলে শকুন্তলা হয়তো স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। ভাববার কিছু নেই। একটা ফ্রি-বেডেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বারবার করে সন্দীপের চিঠি পড়ে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ক্লান্ত হলাম না। খুশিতে ভরে উঠেছিল মনটা। বনমালী আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করে বলেছিল, মেয়েটার একটা গতি করে দিন বাবু, আপনারা ছাড়া ওর যে আর কেউ নেই।

রামধন ঠাকুর আমাকে খুব পরিশ্রান্ত দেখে শুধোল, বাবু, এক কাপ চা করে দিই?

আমার ভেতরে আটকা পড়া-খুশির জোয়ার, তাকে আমি হালকা করতে চাই। তাই রামধনকে বললাম,—দরকার নেই ঠাকুর, আমি বটুর দোকানে চা খেয়ে নেব। কেউ যদি আমাকে খুঁজতে আসে তাহলে বোলো,—আমি একটু বাইরে গিয়েছি, ফিরতে সন্ধে হবে।

বটুর দোকানে চা খাওয়া আর হল না, চা খেতে গেলে যতটুকু সময় নষ্ট হবে সেটুকু সময়ও আমি যেন নষ্ট করতে চাই না। এক অবুঝ ছেলেমানুষি আমার উপর যেন ভর করেছে। বনমালী আর শকুর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত যেন শান্তি নেই। বস্তিতে যেতে গেলে স্টেশন হয়ে ঘুরে গেলে তাড়াতাড়ি হয়। স্টেশন হয়ে যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য ছিল, যদি রবার্টের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! রবার্টকেও এই সুসংবাদটা দেওয়া দরকার। সে বেচারিও তাহলে খুব খুশি হবে!

রিক্সা স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে রবার্টকে আমি দেখতে পেলাম না। ইস্পাত

এসে থেমেছে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ঘোষিকার ঝ্যাল্‌ঝেলে গলা হাওয়ায় ভাসছে। প্যাসেঞ্জার ধরার আশায় নড়ে-চড়ে উঠেছে রিক্‌সা স্ট্যান্ড। সবাই ব্যস্ত। কাকে শুধাবো, রবার্ট কোথায়? একবার ভাবলাম রবার্ট হয়তো রিক্‌সা নিয়ে আসেনি, ও খামখেয়ালী মানুষ, মদের পয়সা উঠে গেলেই রিক্‌সা গাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে অকাতরে মদ টেনে ঘুমায়। তখন প্যাসেঞ্জার এসে সাধাসাধি করলেও তার কোনও ভ্রূক্ষেপ থাকে না। মাঝে-সাজে আমি তাকে এ ব্যাপারে বকলে, সে বিনয় গদগদ কণ্ঠে বলে, আমার বেশি লুভ নাই বাবু, পেট চলে গেলেই আমি খুশি। রিক্‌সাওলারা কখনও দালান বাড়িতে শোয় না তাদের জন্য হাটচালা। সারাদিনে যা ঘাম ঝরে, সব ঘাম যদি বছর ভর জমিয়ে রাখি তাহলে এটা নদী হয়ে যাবে। কী বাবু, কথাটা সাচ্‌ না ঝুট—আপনিই হিসাব করে বলুন? ওকে বেশি ঘাঁটালেই মুশকিল, উল্টো-পাল্টা বকে। হিন্দি সিনেমার ডায়লগ উগরে সে মেগাস্টারের অনুকরণে হাঁটে।

যার খোঁজে যাওয়া যায় তার দেখা না পেলে বুকের ভেতরে ধ্বনিত হয় আফশোস। রবার্টের সঙ্গে দেখা হলেই বুঝি ভাল হত। পরে কোন এক সময়ে দেখা করে নেব—এমন ভেবে আপন খেয়ালে হেঁটে যাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ পেছন থেকে কে আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি,—যাকে খুঁজছিলাম সেই বনা ওরফে বনমালী। আমাকে যেতে হল না, বনমালীই এগিয়ে এসে আমার মুখের দিকে মূর্ছিত চোখে তাকিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল, বাবুগো, সব শেষ! শুকু আর নাই! সে অভাগী গলায় ফাঁস লিচে বস্তির সামনের শিশম গাছটায়। সকালে খপর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি—বিটি আমার মরিকি কাঠ হয়ে ঝুলে আচে ডালে। ব্যাঘরের শাড়িটা তার গলায় ফাঁস আটকানো। কি কইবা বাবু, সেই সকাল থিকে মোর মাথার কুনো ঠিক নাই। ঘাট খরচের পয়সা নাই, তাই বিটিরে ইস্টিশানে এনে শুইয়ে দিয়েচি দুটা পয়সার আশায়। কাঁদতে-কাঁদতে তর্জনী তুলে রাস্তার একপাশে শায়িত শুকুকে দেখিয়ে দিল বনমালী।

আমার ভেতরে তখন কে যেন চাবুক মারছে সপাং-সপাং। কাল সন্ধ্যায় যাকে আমি ব্লাডার ভর্তি মদ নিয়ে ত্রস্ত পায়ে হেঁটে যেতে দেখেছি—আজ তার এই নিষ্ঠুর পরিণতি আমাকে শোকে মুহ্যমান করে তোলে। বনমালী চোখ মুছে নিয়ে বলল, চলুন গো বাবু, সুটেবার মায়াঝিটার মরা মুখ দেখি যাবেন। সে বড় আপনারে ভালবাসত।

আমি ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম শায়িত, চির নিদ্রায় নিদ্রিত শুকুর কাছে। যেতে-যেতে বিড়বিড় করে বনমালী বলল, কাল রাতে মোর চোখে কাল ঘুম আইলা। মায়াঝিটা ঘর ঢুকলা অনেক রাতে। মোর গায়ে জ্বর, ঘুমে চক্ষু দুটা খুলতে পারি নাই। বিটি যেন মোর গোড় ধরি কইলা, বাপো, বাপো।

মুই সাড়া দিলিনি, ঘুমে মোর কুনো হুঁশ নাই। হায় কপাল, এ মোর কী হিলা গো, অখন কে মোকে বসিই-বসিই দানা-পানি দিবে? সে মরলা, মুই বি ভোখ তরাসে মরবা, মোর এই কথা মিছা হবেনি গো।

রাস্তার একপাশে শোয়ানো ছিল শুকুর শরীরটা। তাকে ঘিরে শোক করছিল গুরুবারি বুড়ি আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। আমি ভিড় ঠেলে দেখলাম, রঙ জ্বলা পাতলা চাদরটা শুকুর বুকের উপর পাতা। কিছু সিকি-আধুলি, দু-একটা টাকা দয়াবশত দান করে গিয়েছে পথচারী। খুচরো পয়সা তার বুকের উপর পেতে রাখা নীলাভ চাদরে আকাশের বুকে ফুটে থাকা বেলিকুঁড়ি তারার মতো দেখায়। মরে গেলে ভাল মানুষরা আকাশ হয়ে যায়, আমার মা বলত। শুকুকে অবিকল আকাশের মতো দেখায়। সেই আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আমি বিড়বিড়িয়ে বলি, শুকুরে তোর জন্য আমি সুখবর এনেছিলাম, তুই খবরটা না শুনেই চলে গেলি। আমার মায়ের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে, তুই নিশ্চয়ই উপর আকাশ থেকে আমার মতো তুচ্ছ মানুষকে দেখতে পাচ্ছিস! দেখে নে শুকু, আমার বুক পকেটে, সন্দীপের চিঠিটা। সেই চিঠিতে তোর সংসার ফিরে পাওয়ার কথা লেখা ছিল। এসব না শুনে তুই কেন বুনো হাওয়ার মতন চলে গেলি? যা। যেখানেই থাকিস, ভাল থাক।—রুমালে চোখ মুছে নিয়ে আমি যখন ফিরে আসব তখন হাত বাড়িয়ে দিল বনমালী, বাবুগো ঘাট খরচের জন্যি কিছু দিয়ে দাও। বিটি আমার বুকের হাড়-পাঁজর চুরচুর করি চালি গেলা! আমি যখন একটা দশ টাকার নোট শুকুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে আসব তখনই দেখি লাট সাহেবের মতো রবার্ট এসে হাজির। নেশায় দু'চোখ টকটকে লাল, পা টলছিল। সকালেই খবরটা পেয়ে স্টেশনের চাতালে বুক ভাসিয়ে কেঁদে সে চলে গিয়েছিল মদ ভাঁটিতে জ্বালা জুড়োতে। জ্বালা জুড়িয়ে ফিরে এসে সে বাঘের গলায় হুঙ্কার ছেড়ে বলল, খবরদার, আমার বউয়ের বুকের উপর কেউ পয়সা দেবা না। দেওয়ার যদি মন হয় তাহলে পায়ের কাচে দাও। বলেই সে টান মেরে সরিয়ে দিল শুকুর বুকের চাদর। তারপর, তোল্লা করে তুলে নিয়ে গিয়ে শুকুকে শুইয়ে দিল ভ্যান-রিক্সায়। বুকে থাবড়া মেরে পাগলের মতো চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলল, শুকুরে আমি মেরে ফেলেচি বাবু, তুমরা আমায় শাস্তি দাও।

বনমালী পয়সা কুড়াচ্ছিল দানা খুঁটে খাওয়া কাকের মতন। মাটির দিকে মুখ। সে দেখতে পেল না রবার্ট তার বউকে নিয়ে শ্মশানে চলেছে!



দশ

শীতের বিকেল টিকটিকি লজেন্সের মতো দ্রুত ফুরিয়ে যায়। কার্নিশ ছোঁয়া রোদ চনমনে, ফূর্তিবাজ। সদর রাস্তায় বিকেলবেলায় দেখতে পেয়ে বটু আমাকে ডাকল, ওর স্বরে আন্তরিকতার ঠাস বুনোট। অগ্রাহ্য করার তেমন দম কোথায় তাই এগিয়ে গিয়ে শুধোলাম, আজ কেমন আছ?

আমার প্রশ্নে বটু হাসল, দু-দিন থেকে জ্বর আসেনি। আমি তো দমে ভাত খাচ্ছি, চান করছি। মুখার্জি ডাক্তার বলেছেন, মন যা চায় তাই খেতে। অন্যদিনের তুলনায় হাসি-খুশি দেখলাম বটুকে। বটু আমাকে বসতে বলে ওর গুমটি ঘরে ঢুকে গেল। হাতে একটা সাদা খাম। তাতে গোটা-গোটা অক্ষরে বটুর ঠিকানা লেখা। বটুর নামে চিঠি এসেছে এটা একটা ঘটনা। এই দীর্ঘদিনের মেলামেশায় বটুর নামে কোনদিন চিঠি এসেছে আমার তা মনে পড়ে না। বটু আমাকে চমকে দিয়ে বলল, বলতো মাখনদাদা, কার চিঠি? ওর প্রশ্নে ছেলেমানুষির ছোঁয়া। আমার ভাল লাগল। মাত্র সাতদিন আগেও বটুকে দেখেছি, জ্বরের ঘোরে খাটিয়াতে শুয়ে ভুল বকতে। আজ সেই চোখে ধারাবাহিক অসুস্থতার কোনও লক্ষণ নেই. রোদ ওঠা আকাশের চেয়েও পরিষ্কার দৃষ্টি। খুশির দ্যুতিতে সেই চোখে পিছলে পড়ে আনন্দ। আমি বটুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সপ্রশ্ন চোখে তাকালাম, কার চিঠি? কই দেখি?

বটু আমার হাতে চিঠিটা দিয়ে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকল। আমি দেখলাম —খামটা যেমন এসেছিল তেমনই যত্ন করে রাখা। ওটা আর খোলা হয়নি। ঠিকানাটা ইংরেজিতে লেখা হলেও, হস্তাক্ষরটি আমার পরিচিত। কলকাতা থেকে সুজিত লিখেছে চিঠিটা। বটুকে বলতেই অবাক চোখে তাকাল। হয়তো চন্দনার সুশ্রী মুখটা ঝিলিক দিয়ে স্তব্ধ করে দিল ওর যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা। শুধু বটু নয়—উড়ো মেঘের মতো চন্দনা আমারও মনটাকে ঢেকে দিল অন্য ভাবনায়। কলকাতা থেকে ফেরা অনেকদিন হল কিন্তু আমরা

কেউই চন্দনাকে কোনও চিঠি লিখিনি। বটু অবশ্য আমাকে চিঠি লেখার কথা বারবার করে বলেছে, আমি ওর কথায় কর্ণপাত করিনি। চন্দনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সুজিত আর মাসিমার উপর ছেড়ে দিয়ে বোঝা হাল্কা করতে চেয়েছি নিজের। যে দরদ এবং সহানুভূতি চন্দনার সামনে দেখিয়েছি তা হঠাৎ করে আমাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়, অদৃশ্য তর্জনী তুলে আমাকে শাসায়, আমার সততাকে সন্দিহান করে তোলে। চন্দনাকে চিঠি লেখার প্রয়োজনীয়তা আমি যে অনুভব করিনি তা নয়। চন্দনাকে নিয়ে আমি যে ভাবনা-চিন্তা করিনি এমনটাও সত্য নয়। তবু, কেন যে এতদিন চিঠি লিখিনি এর কোনও তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যা আমার মনে আসে না। বটু যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হাসতে পারছে, আমি জোর করেও তা পেরে উঠছি না। আমার এই প্রতিক্রিয়া বটু হয়তো অনুভব করতে পেরেছিল, তাই ওকেও কেমন চিন্তিত দেখলাম। চিঠিটা হাতে নিতেই চন্দনার দুঃখী মুখটা চিকুর কাটা মেঘের মতো আমাকে কাঁপিয়ে দিল। আমি সেই কাঁপা গলায় বটুকে জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠিটা কখন এসেছে? বটু খুবই স্বাভাবিক গলায় বলল, দুপুরের সময় পিয়ন দিয়ে গেল। আমার নামে চিঠি এসেছে প্রথমে আমার বিশ্বাসই হয়নি। পরে ভাবলাম,—হতেও পারে! তাই, রেখে দিয়েছি। তা, মাখনদাদা, চিঠিটা পড়। কী লিখেছে শুনি—

চিঠির ভাঁজ খুলতেই মেয়েলি হাতের লেখাটা সুবাসিত ফুলের অপরূপ-ময়তায় নাড়া দিয়ে বাক্‌রুদ্ধ করল আমাকে। আমি সেই কালো কালো হরফের দিকে তাকিয়ে থাকলাম নির্নিমেষ, হয়তো চেষ্টা করলাম মানসিক দহন থেকে নিষ্কৃতি পেতে। কিন্তু ফল হল তার উলটো। ব্যথা ভুলতে গিয়ে ব্যথার হ্রদে ডুবে গেলাম আমি, চন্দনাকে ভুলে থাকায় অপরাধবোধ আমাকে সুতীক্ষ্ম ক্যাক্‌টাসের তীব্র দংশনে ক্ষত-বিক্ষত করল। আমার এতটুকু প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না যা দিয়ে আমি নিজেকে দাঁড় করাতে পারি। চিঠির অক্ষরগুলো আমার চোখের দৃষ্টিতে জড়িয়ে গেল, আমি কোনও শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে গোটা চিঠিটাতে চন্দনার মলিন মুখের সচল ছায়া দেখলাম, আর তখনই আতঙ্কিত চোখ তুলে বটুকে বললাম, বড় ভুল হয়ে গিয়েছে বটু, এতদিন হয়ে গেল অথচ চন্দনাকে আমার চিঠি লেখা হয়নি। কী ভাববে বলতো মেয়েটা! বটুকে তেমন উদ্বিগ্ন দেখলাম না, সব কিছুই ওর দিনের আলোর মতো সহজ সরল। আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, চিঠি দাওনি যখন পরে একটা লিখে দিলেই হবে। তুমি তো কাজের মানুষ, ঝামেলায় থাক। ভুল হওয়াটা তোমার কাছে মাথা হেঁট হওয়ার মতো জঘন্য কোনও অপরাধ নয়। সে কথা যদি বল তো আমারও দোষ হয়েছে। আমিও কোনও চিঠি লিখিনি। তবে প্রতিদিনই ভেবেছি চিঠি লেখাটা জরুরি। মেয়েটার তো কেউ নেই, সে তো আমাদের মুখ চেয়ে অতদূরে পড়ে

আছে। মাঝে মধ্যে চিঠি পেলে তারও মনের জোরটা বাড়ে।

বটুর সঙ্গত কথায় মাথা হেঁট হয়ে এলেও আমি হেঁটমুণ্ডে চন্দনার চিঠির দিকে তাকিয়ে থাকি। বটুকে ভাগ্যবান মনে হয়। এ যাবৎ চন্দনা আমাকে একটা চিঠিও দেয়নি, অথচ আমি মনে মনে চন্দনার চিঠি আশা করতাম! আমার সেই আশা পূরণ হয়নি, অথচ বটুর ভাগ্যটা মেঘ না চাইতে জল পাওয়ার মতো। বটু আমাকে খোঁচা মেরে বল, পড়, কী লিখেছে চন্দনা?

চিঠিটা আগাগোড়া শুনে হুঁশ করে একটা শ্বাস ছাড়ল বটু। কী হল? আমার প্রশ্নে হতভম্বের চোখে বটু তাকাল। ঢোক গিলে বলল, চিঠি লেখাটা জরুরি ছিল, কিন্তু যখন হয়নি তখন আর আফশোস করে কী লাভ? তার চেয়ে চল, নদীটার কাছ থেকে ঘুরে আসি।

হাতে সময় থাকলে বটু চা দোকানের কথা ভুলে যায়, ব্যবসার কথা বেবাক ভুলে এখানে-সেখানে বেরিয়ে পড়ে। আমি মাঝে মাঝে বটুর সঙ্গী হই। বটুর একটা সাইকেল আছে, সেই সাইকেলে করে দু-জনে চলে যাই অনেক দূরে। কোনও নির্জন গাছের তলায় বসে আমাদের কথা-বার্তা চলতে থাকে। এমনিতে বটু খুবই চাপা প্রকৃতির ছেলে। সহজে সে তার নিজের কথা বলতে চায় না। শুনতে ভালবাসে। কিন্তু শোনানোর মতো আমার আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

চা দোকানের ঝাঁপ বুজিয়ে গলায় ব্যস্ততা ফুটিয়ে বটু আমাকে বলল, চল মাখনদাদা, আর দেরি করে লাভ নেই। এখন গেলে আলো মরার আগে ঘরে আসব।

আমার কোনও কাজ ছিল না, বটুর কথায় সায় দিলাম। বটু তার ধোয়া-পোছা সাইকেলটা বের করে আনল খাপরার ঘর থেকে। পুরনো সাইকেল, যত্নের ঠেলায় দেখে মনে হল নতুন। আমি বহুবার দেখেছি—এই সাইকেলটার উপর বটুর মাত্রাতিরিক্ত টান আছে। হাসান মাস্টারের সাইকেল বলেই তার এই বিশেষ খাতির-যত্ন। সাইকেলটা দোকানে বেচে দিতে চেয়েছিল মাস্টার। বটু জানতে পেরে ন্যায্য দামে কিনে নিল। পরে সে সাইকেলটা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু মাস্টার মশাই নেননি। তিনি হাসতে হাসতে বলেছেন, বটুরে তোর কাছে থাকা আর আমার কাছে থাকা একই ব্যাপার। ও নিয়ে তুই ভাবিস নে। বরং তোর কাছে থাকলে সাইকেলটা ভাল থাকবে। আমার ঘরে তো শয়তানের বাস। জালালটার নজর পড়েছে। যে কোনদিন ওটা সে বেচে দিত। তখন এই যে কটা টাকা পেতাম তা-ও বেহাত হয়ে যেত।

হাসান মাস্টারের সমস্যা বটু নিজের অন্তঃকরণ দিয়ে বোঝে, ওই মানুষটার উপর তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। মানুষও মানুষের কাছে নদী হয়ে যায়, দেবতা হয়ে যায়। হাসান মাস্টার নদী বা দেবতা নয়—রক্ত-মাংসের ভগবান। তাই সাইকেলটার সেবা-যত্ন করার পিছনে বটু অন্য ধরনের

উৎসাহ পায়, তার মনে হয় সে যেন জল দিয়ে ধুইয়ে দিচ্ছে হাসান মাস্টারের ধুলোমাখা পা।

শীতকাল বলেই চারধারে নিঃশব্দতার বেড়াজাল। রেল কলোনি শান্ত, নিথর। আলোর প্রাচুর্যের অভাব নেই, তবু মনে হয় এই প্রাচুর্যময় আলোর পিছনে সূচিভেদ্য অন্ধকার। নদী দেখতে যেতে হলে এখনি যেতে হয়। বটু তাড়াহুড়ো করে বলল, মাখন দাদা, তুমি ক্যারিয়ারে বস—আমি চালাই। অনেকদিন সাইকেল চালাইনি, আজ গায়ের জোর দিয়ে চালাব।

আমি বটুর কথায় হাসলাম, জ্বর থেকে উঠেছ—এখন গায়ে এত জোর পাবে কী করে? তার চেয়ে তুমি বস—আমি চালাই।

বটু কিছুতেই আমার প্রস্তাবে রাজি হবে না, আমি ওকে চালিয়ে নিয়ে যাব এটা ভাবতেই অপরাধবোধে সংকুচিত দেখাচ্ছিল ওর মুখমণ্ডল। আমি ওর ভেতরের টানাপোড়েনটা ধরতে পেরে বলি, অত ভাবার কী হল? আজ তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি অন্যদিন তুমি আমাকে নিয়ে যেও, তাহলে সব শোধ-বোধ হয়ে যাবে।

বটু সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে আমার দিকে তাৎপর্যপূর্ণ চোখে তাকাল। চন্দনার চিঠিটা তখনও ওর বুক পকেটে ভাঁজ করা। ওকে বেশ ধোপদুরস্ত মানুষের মতো দেখাচ্ছিল। সামান্য একটা চিঠি তবু তার উষ্ণতায় বটু যেন আত্মহারা। বটুর এই ছেলেমানুষি ভাল লাগা আমারও ভাল লাগল। নদীর কাছে পাহাড় ছিল, পাহাড়ে ছিল অজস্র নাম না জানা গাছপালা। আমি সাইকেল থামালাম সরকারি ব্রিজটার কাছে। বটু তার অনেক আগেই নেমে পড়েছে লাফ দিয়ে। আমাকে দূরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে ও বলল, এখানে এলে আমার আর স্টেশনের দিকে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। ওদিকটা বড় বানানো, এদিকটা সাজানো।

আমি অদ্ভুত তন্ময়তায় বটুর কথা শুনি। ব্রিজের হাত পঞ্চাশেক নিচে সঞ্জয় নদী। ফেনামুখ জল আছাড় খেয়ে পড়ছিল পাথরে, ছিটিয়ে যাচ্ছিল চতুর্দিকে। যেন তারাবাজি ধরিয়ে দু-হাত দিয়ে সবেগে আনন্দে ঘোরাচ্ছিল কোনও দুরন্ত কিশোরী, বারুদ বিচ্ছুরণের চেয়েও ছিটিয়ে পড়ছিল জলরাশি সর্ষে ফুল রোদে। সাইকেলটা সিমেন্ট খুঁটিতে হেলান দিয়ে আমি আর বটু পাশাপাশি একটা উঁচু পাথরে বসলাম। হাওয়া ছিল মৃদু-মন্দ। রোদ থাকায় তাতে শীতের কোনও জ্বালাতন ছিল না। বটুর গায়ে তবু গরমের পোশাক, আমিও হাফ সোয়েটারটা জোর করে চাপিয়ে নিয়েছি গায়ে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বটুকে বললাম, জায়গাটা দারুণ, তাই না?

বটু ঘাড় নাড়ল। তারপর কিছুটা চুপচাপ থেকে দুম করে বলে ফেলল, চন্দনা যদি কোনদিন বেড়াতে আসে তাহলে ওকে এখানে আনব। এমন পাহাড়ী নদী ও কোনদিন দেখেনি মনে হয়।

বটু কি সর্বদা চন্দনার কথা ভাবে ? এই একটা প্রশ্ন আমার মনে ঘুরপাক খেয়ে আবার নিস্তরঙ্গ হয়ে গেল। বটুর চোখে-মুখে তখনও তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য। ও যেন অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে গিয়েছে এমন চোখ-মুখ। বটুকে দেখে আমার এমন ধারণা দৃঢ় হল ও যেন চন্দনার হাত ধরে দূরের কোথাও গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে আনন্দে। ফিরে আসবে তেমন তাড়াও নেই। পরম নিশ্চিন্তে বটু যেন চন্দনারমুখোমুখি বসে আছে। চন্দনার নিঃশ্বাস যেন তার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে। বটুর এই তন্ময়তার খোঁজ আমি ঠিক জানি না। তবে বটু যে চন্দনাকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবে এ সম্বন্ধে আমার কোনও দ্বিমত নেই। জ্বরের ঘোরে আমি বহুবার ওকে 'চন্দনা, চন্দনা' বলে চেঁচিয়ে উঠতে শুনেছি। তাহলে কি বটু চন্দনাকে ভালবাসে, অন্য চোখে দেখে। তাই যদি হয় তাহলে সেদিন আমার প্রস্তাবে ও কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল কেন ?

আমি তো স্বেচ্ছায় চন্দনাকে ওর হাতে সঁপে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন ওর ব্যবহারে চন্দনার উপর যে হিম শীতলতা ছিল—আজ তা আদৌ নেই।

বটু একটা ছোট নুড়িপাথর তুলে ছুঁড়ে মারল দূরে। পাথরে পাথর লেগে কঁকিয়ে ওঠার মতো শব্দ হল। আমি বটুকে বললাম, তুমি খুব ভাগ্যবান। চন্দনা তোমাকে চিঠি দিয়েছে।

আমার কথায় বটু আহত চোখে তাকাল। ওর চাউনিতে এমন এক নির্মলতা ছিল যা আমার হীনমন্যতাকে প্রকট করে দিল। এমন কথা বটুকে বলা আদৌ আমার উচিত হয়নি—এই ভেবে আমি চুপ করে থাকলাম।

বটু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, চন্দনার উচিত ছিল দু-জনকেই চিঠি লেখা।

ও যদি তোমাকে লিখে আমাকে না লিখত তাহলে আমিও এমন ভাবতাম। আর এই ভাবনাটাই স্বাভাবিক। আমরা দু-জনেই তো কম বেশি ওকে ভালবেসেছি। সাহায্য করেছি।

বটু যত সহজে কথাটা বলল তত সহজে আমি তা নিতে পারলাম না। ভালবাসা শব্দটায় আমার চোখে তখন রীতিমতন কাঁপুনি। বটু কী বুঝতে পারছে মৃদু ভূ-কম্পন বুকের ভেতর ! ও বোকা, বুদ্ধিমান বা চতুর হলে নিশ্চয়ই বুঝত। আমি নদীর দিকে তাকালাম। দেখলাম—আকাশের ছায়া পড়েছে নদীর জলে। অথচ, বেগবান জল তার ধর্ম হারায়নি। পাথরের বলপূর্বক বাধা তার কাছে কোনও বাধা নয়। হাওয়া তাকে মন্ত্রণা দিচ্ছিল স্বৈরিণী হয়ে ওঠার। কিন্তু জল বরাবরের নিম্নগামী, সর্পিল ফণা তোলা উদ্ধত-স্বভাব তাকে মানায় না। জলের কাছ থেকে আমি শিক্ষা

নিলাম। আর মনে মনে বললাম, আমার মনে যদি কোনও পাপ থেকে থাকে হে নদী, তুমি তা ধুয়ে দিও।

বটু জামার পকেট থেকে চিঠিটা বের করে এনে বলল, ভাল করে পড়তো শুনি কী লিখেছে চন্দনা? তখন তো ভাল মতন শোনা হয়নি। বটুর আগ্রহ দেখে চিঠিটা আমাকে দ্বিতীয়বার পড়ে শোনাতে হল! বটু হাঁপ ছেড়ে বলল, মেয়েটা ভাল আছে জেনে খুব ভাল লাগছে মাখন দাদা। অসুখের সময় ওর কথা খুব মনে পড়েছিল কিন্তু তোমাকে তা সাহস করে বলিনি।

বটু তার হৃদয়ের কথাটি আমার কাছে গোপন করতে চায়, এই ভেবে কষ্ট হলেও আমি তা হজম করে নিলাম। সব মানুষের লুকানো কিছু কথা থাকে—সেখানে অধিকার ফলানো অন্যায়।

চিঠিটা বটুর হাতে ফিরিয়ে দিতেই বটু উদাস স্বরে বলল, আমাকে একটা চিঠি লিখে দিয়ো তো। আমি তো বাংলা লিখতে পারি না—

ঠিক আছে লিখে দেব।—কথাগুলো বলতে গিয়ে এক অপ্রতিরোধ্য কাঁপুনিতে গলাটা আমার বুজে এল।

বটু আবিষ্কারের আনন্দে আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, ওই যে সামনের পাহাড়টা—ওটা হল রঙের পাহাড়। যাবে মাখন দাদা?

চল! চুপসে যাওয়া শরীরে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে পেরিয়ে এলাম ব্রিজটা। রঙের পাহাড় দৃষ্টির মধ্যে হলেও অনেক দূরের পথ। কিছুটা এসে থমকে দাঁড়িয়ে আমি বটুর মুখের দিকে তাকালাম। বললাম, পাহাড়টা মনে হচ্ছে কাছেই, কিন্তু হেঁটে গেলে কম করে আধ ঘণ্টা লাগবে।

বটু আশ্চর্য হয়ে বলল, পাহাড় কি তাহলে যাদু জানে? যত যাচ্ছি তবু সে আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে না। শুধু পিছিয়ে যাচ্ছে—

রঙের পাহাড় আশেপাশের পাহাড়গুলোর চেয়ে আলাদা, নেড়া মানুষের কেশহীন মাথার মতো মনে হয়। কর্কশ না হলে তার মধ্যে কোমলতার বড় অভাব।

সাইকেল থামল সেই নেড়া পাহাড়ের সামনে। দূরে যে অস্পষ্ট গ্রামটা দেখা যাচ্ছিল তার দৃশ্যও মনোরম। বটু মাথা চুলকে বলল, আমরা নদী থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। এখান থেকে নদীর কোনও কোলাহল শোনা যাবে না।

বটু ছায়া দেখে একটা গাছের নিচে বসল। তখনও রোদ পড়ে আসেনি, বিকেল রীতিমতন সুন্দরী। কাঠ ভাঙতে আসা মেয়েগুলো আমাদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে। আশেপাশের গ্রামগুলোতে ওরা থাকে—তা ওদের হাব-ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল। আমি একটা সিগারেট ধরাতেই ওদের মধ্যে কোকিল নয়না মেয়েটি মধুর হেসে উঠল। ওরা কাছেই ছিল। আর কাছে

থাকার দরুন অস্বস্তিবোধ করছিল বটু। মেয়েগুলো কাঠের বোঝা নিয়ে কল-কল করে হাসতে-হাসতে চলে যেতেই বটু আমার পাশ ঘেঁষে সরে বসল। ও যেন আমার কাছে গোপন কিছু বলতে চায় এমনভাবে তাকাল।

আমি শুধোলাম, বটু তুমি কি কিছু বলবে?

বটু অনেকক্ষণ নিরুত্তর থেকে আমার দিকে তাকাল, রোজই ভাবি বলব তবু বলা হয় না। যদি বলতে পারতাম তাহলে নিজে কিছুটা হালকা হতাম। কে না চায় তার বুকের বোঝা হালকা করতে।

বটুর কিছু দুঃখ ছিল, যা তার একান্তই নিজের। মানি অর্ডার ফর্ম ভরার সময় বটুকে আমি ঘেমে-নেয়ে একাকার হতে দেখেছি, তা তো বেশি দিনের কথা নয়। সে কথা আমার মাঝে-মধ্যেই মনে পড়ে। সুখিয়া নামের মেয়েটিকে বটু ভালবাসত এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু কে যে সেই সুখিয়া তা আমার এখনও জানা হয়নি। তবে, মেয়েটির উপর বটুর অসীম দুর্বলতা। এবং আমার বিশ্বাস—এই মেয়েটার ভরসায় বটু চন্দনাকে অগ্রাহ্য করেছে। সুখিয়ার ভালবাসাই বটুকে অন্য পথে হাঁটতে দেয়নি। না হলে বটু বিপথগামী হত।

বটু কীভাবে আমার কাছে তার গোপন দুঃখের কথা বলবে হয়তো এই নিয়েই গভীরভাবে ভাবছিল। আমি ডাকতেই বটু ধড়ফড়িয়ে তাকাল। বিনা ভূমিকায় আমি বলে ফেললাম, সেদিন তুমি সুখিয়ার প্রসঙ্গটা চেপে গেলে আজ বলতো কী ব্যাপার? সুখিয়া তোমার কে হয়? কোথায় আছে এখন?

বটু ভাবার জন্য কিছুটা সময় নষ্ট করল। তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকে যাচাই করল পুরোপুরি।

আমি বুঝতে পেরে বললাম, তোমার ভয় নেই, তুমি নিঃসংকোচে বলতে পার। এতদিন ধরে মিশছ নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পেরেছ। যদি ভরসা রাখতে পার তাহলে বল। আমার দ্বারা তোমার কোনও ক্ষতি হবে না!

বটু জিভ কেটে বলল, ছিঃ ছিঃ, আমি তা ভাবিনি মাখন দাদা। এই রেল কলোনিতে তুমিই একমাত্র মানুষ যে আমাকে মানুষের মর্যাদা দেয়। তোমাকে অবিশ্বাস করে আমি নিজেকে অবিশ্বাস করতে পারব না।

আমাকে যে বটু বিশ্বাস করে, এ ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। বটুকে ভাল লাগার কারণ ওর এই নির্ভেজাল আন্তরিকতা। বটু আমার হাতটা ধরে বলল, আজ তোমাকে সব বলব, আর বলব বলেই তোমাকে এত দূর নিয়ে এসেছি। সুখিয়াকে যে আমি ভালবাসতাম এ কথা মরার আগে কাউকে তো বলা দরকার। তুমি ছাড়া আমার এই কাহিনী শোনার কেউ নেই।

আমি লক্ষ্য করলাম বটু যেন নিমেষের মধ্যে পালটে গিয়েছে, ওর চোখে-

মুখে কি চাহনিতে উদাসীন একটা পরিবর্তন এসেছে। বটু যা বলতে চায় তা শোনার জন্য আমার ভেতরে কৌতূহল জমা হতে থাকে। রং পাহাড়ের পাদদেশে বসে বটু একের পর এক চমকপ্রদ ঘটনা বলে যেতে থাকে। যা শুনে বাক্‌রুদ্ধ চোখে আমি বটুর দিকে তাকিয়ে থাকি।

বিহারের এক অজ পাড়াগাঁয়ে বটুদের বাড়ি ছিল। তার বাবা ছিল ভুষিমাল দোকানের মালিক। জমিজমা নয়, এই ছোট দোকানটা ছিল তাদের জীবনধারনের একমাত্র ভরসাস্থল। বটুর মা ছিল গ্রাম্য মেয়ে কিন্তু রূপ তার গ্রাম্যতা ঢেকে তাকে দিয়েছিল বাড়তি একটা আকর্ষণ। সে যে গ্রামের মধ্যে সুন্দরী ছিল এই বোধটা তাকে অহরহ সতর্ক এবং আত্মসচেতন করে দিত। ভিন পাড়ায় বটুর বন্ধু ছিল ভজনলাল। তারা ছিল এক আত্মা এক প্রাণ। স্কুল থেকে ফিরেই ভজনলালের ঘরে না গেলে পেটের ভাত হজম হত না বটুর। ভজনলালের মা তাকে নিজের পেটের ছেলের মতো দেখত। ভজনলালের বোন ছিল সুখিয়া। সে ছিল মিষ্টি একটা মেয়ে, যার শীর্ণ মুখটা বটু এখনও ভুলতে পারেনি, আর কোনদিন পারবে না হয়তো। এই ভাবেই ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছিল বটু। জ্ঞান বাড়ার পর থেকেই সুখিয়ার উপর আকর্ষণটা তীব্র হচ্ছিল তার। গালের ব্রণ খুঁটে ঝিমিয়ে যাওয়া পদ্মফুলের চেয়েও নমনীয় শরীর নিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াত সুখিয়া। বটু তাকে জোর করে ছুঁয়ে দিলেই তেঁতুলপাতার চেয়েও দুরু-দুরু কেঁপে উঠত মেয়েটা। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে জড়োসড়ো প্রজাপতির মতো তাকাত। তারপর এক ছুটে আতা ফুলের চেয়েও সুন্দর শরীরটা নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘরের ভেতর ঢুকে যেত। আর বেরোত না। একদিন ওই সুখিয়াই তাকে ভালবাসার কথা বলে রামনবমীর মেলার ভিড়ে হারিয়ে যায়। বটু মরণ কুয়ার পাশ থেকে দেখে নাগরদোলায় সুখিয়ার রুপোর তোড়ায় মোড়া সুশ্রী লক্ষ্মীমন্ত পা দুটো। সাপ বিনুনি চুল নড়ছিল হাওয়ায়। সহেলীদের সাথে সুখিয়ার সেই হাসি মুখটা এখনও চোখে লেগে আছে বটুর। নতুন সজনে পাতার চেয়েও সুখিয়া ছিল তার কাছে নরম ভালবাসার বস্তু। ভজনলাল হয়তো জানত এই গোপন ভালবাসার কথা, কিন্তু সে কখনও মুখ ফুটে কোনও প্রতিবাদ করেনি। তাদের অভাবের সংসারে বটু ছিল অনেকটা উদ্ধার কর্তার মতো। বটুর বাবা যখন শহরে যেত মাল কিনতে বটু তখন দোকানে বসত ব্যবসা সামলাতে। বিক্রির টাকা সে সরিয়ে রাখত গোপনে। সুখিয়াদের অভাব মেটানোয় এটা তার একটা সামান্য প্রয়াস। এইভাবে বেশি দিন চলে না, বটু একদিন ধরা পড়ে গেল মায়ের কাছে। বেদম মার খেয়ে স্বীকার করল সব। সেদিন থেকে সুখিয়াদের বাড়ি যাওয়া তার নিষেধ। তার মা গিয়ে উঁচু গলায় অপমান করে আসল সুখিয়ার বাবা-মাকে। তবু বটু চেষ্টা করত আড়ালে আবডালে সুখিয়ার সাথে দেখা করতে। ওই মেয়েটাকে সারাদিনে একটি বার না

দেখলে তার বুকের ব্যথা বাড়ত, পড়াশুনো দূরে থাক, এমন কী কোনও কাজে মন বসত না।

এইভাবেই অতিক্রান্ত হচ্ছিল দিনগুলো, সুখিয়ার ভালবাসা কাঁচ শ্যাওলার মতো বিছিয়ে গিয়েছিল পুরো মনে। ঘন ঘন দেখা না হলেও মাঝেমধ্যে দেখা হত সুখিয়ার সাথে, তাতেই জোয়ার আসা মনটা জড়িয়ে সর ফেলত ভালবাসার। সুখিয়া তখন দূরের বনের বুনো পাখি নয়, পোষ মানা ময়না, বটু তার হৃদয়ের খাঁচায় আগলে রাখত ওই পাখি শরীরের মখমল উত্তাপ। কথা ছিল তারা বিয়ে করবে—সমাজ বাবা-মা যদি বুড়ো আঙ্গুল দেখায় তা সত্ত্বেও। সুখিয়া ছিল ভীরু প্রকৃতির মেয়ে। তবু তার আত্ম-বিশ্বাস আর মনোবল কোনও অংশে একজন পূর্ণ যুবতীর চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু সেই স্বপ্ন বটুর বাস্তবায়িত হয়নি। এর জন্য সে কাকে দায়ী করবে? তার বাবা মারা গেল মাত্র দু-দিনের জ্বরে ভুগে। দোকান সংসার, খেতি-বাড়ির সমস্ত দায়-দায়িত্ব পড়ল বটুর উপর। মন ভেঙে গেল বটুর, পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হল তাকে। তার মা তখন অন্য নেশায় মেতেছে, বটু তা নিজের চোখে দেখল। প্রতিবেশী লছমন সিং তার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বটু তাকে চাচা বলে ডাকত। একদিন মাকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় লছমন সিংয়ের সাথে শোবার ঘরে দেখতে পেয়ে বটুর মাথায় আগুন জ্বলে গেল। এত নির্লজ্জ, অকৃতঘ্ন মানুষ হতে পারে? বটু আর ভাবতে পারছিল না, ভেজানো দরজা খুলে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া দু-জনকেই হত্যা করেছিল সে। এই অভাবনীয় ঘটনা একা হাতে সে কীভাবে করল—যা ভাবতে গেলে বিস্ময়ে তার কথা আটকে যায়। কিন্তু সে যা করেছে এর জন্য তিলমাত্র অনুতপ্ত নয় সে। সেই যে এক কাপড়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেছিল তারপর এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও ঘরে ফেরার তাগিদ অনুভব করেনি সে। তবু সুখিয়াকে সে একদিনের জন্যেও ভোলেনি। ওই শীর্ণকায় মেয়েটি তাকে গ্রামেব স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। বটুর তখন ইচ্ছে জাগে গ্রামে ফিরে যেতে। কিন্তু সে একজন খুনী। তাই, এতদিন পরেও গ্রামে ফেরার সাহস রাখে না সে।

বটুর সমস্ত কিছু শোনার পর আমি হতবাক চোখে ওর দিকে তাকালাম। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বটু নিরুত্তর চোখে তাকাল। আমি ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলাম না। ওর অশ্রুসজল চোখ দুটো আমাকে বোবা করে দিল মুহূর্তে। আমি খুব সন্তর্পণে বটুর হাতটা ধরলাম, অতীতকে ভুলে যাওয়া কঠিন, কিন্তু না ভুলে গেলে ওই রক্তাক্ত অতীত তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।

বটু অনুশোচনায় পুড়ছিল। ধরা গলায় বলল, নিজের হাতে মাকে আমি খুন করেছি, এর শাস্তি কি আমি পাব না।

বুঝতে পারলাম গর্ভধারিণী মাকে খুন করার অপরাধে এতদূরে পালিয়ে এসেও বটুর অপরাধবোধ মন থেকে যায়নি। শুধু অনুশোচনা নয়, আত্মগ্লানিতে বিধুর বটুর মুখমণ্ডল। এই মুহূর্তে বটুকে সান্ত্বনা দেওয়া বাতুলতা মাত্র। ওর উপর দিয়ে বহু পুরনো ঝড় এইমাত্র বহে গেল। সম্ভবত তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে এসেছিল বটুর। শুকনো ঢোক গিলে সে আমাকে বলল, গলাটা শুকিয়ে এসেছে, একটু জল পেলে হত। অনেক দূরে ফেলে এসেছি নদীটাকে। সেখানে ফিরে যাওয়ার চেয়ে সামনের গ্রামটাতে ঢুকে যাওয়া ভাল! আলো তখনও ফুরোয়নি, তবে আগের সেই উজ্জ্বলতা হারিয়ে মলিন পাঁপড়ি। পাহাড়ি পথ বেয়ে স্বল্প ক্লেশে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে গ্রামের দিকে ফিরছিল আদিবাসী মেয়েগুলো, আসন্ন অন্ধকারে তাদের মুখাকৃতি একই ছাঁচে গড়া কোনও প্রতিমার মুখ। হাঁটু অব্দি ওঠানো শাড়ি, কারোর পায়ে রুপোর তোড়া। রং-পাহাড়ের মাথার উপর তখনও খোঁচা খাওয়া সাপের মতো কিলকিল করে রোদ। গাছের পাতা হাওয়া আটকে দেয় বুক ফুলিয়ে, পাখ-পাখালির ধ্বনিতে পাহাড় চত্বর উৎসব মুখর হাট। ঘরে ফেরা গরু-মোষগুলোকে পাশ কাটিয়ে আমি সাইকেল নিয়ে হাজির হই একেবারে গ্রামে ঢোকার পথটায়। আমাদের দেখে সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয় দেহাতি মানুষগুলো। আমি সাইকেল থামিয়ে জিজ্ঞেস করি, এখানে জল খাওয়ার কুয়ো কোথায়?

আঙুল উঁচিয়ে একজন দেখিয়ে দেয় কুয়োটা। দূরে শান বাঁধানো একটা ঝাঁকড়া মাথার অশ্বত্থ গাছ। গোলাকার শান বাঁধানো বেদীর হাত দশেক তফাৎ-এ কুয়োটাকে আমি লক্ষ্য করি। আলো কমে আসার মুখে ভিড় ছিল না কুয়োতলায়। সাইকেল নিয়ে আর ক-কদম এগিয়ে গিয়ে আমি বটুকে বললাম, আমি এখানে থাকছি তুমি তাড়াতাড়ি জল খেয়ে এস। বটু সমস্যা-সংকুল মুখ তুলে বলল, তুমিও চল, আমি একা যাব না। দেখছ না কুয়োতলায় মেয়েদের কেমন জটলা!

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, মেয়েরা আছে তো তোমার কী? তুমি তো জল খেতে যাচ্ছ, জল খেয়েই ফিরে আসবে।

বটু স্ফূর্তি হারিয়ে বোকা-বোকা চোখে তাকাল। আমি এক রকম জোর করে বললাম, যাও ভয় পাবার কিছু নেই। মেয়েরা তো বাঘ-ভালুক নয় যে তোমাকে খেয়ে নেবে।

বটু গেল বটে কিন্তু যাওয়ার একদম তার ইচ্ছে ছিল না। ওর এই সংকোচ সব সময় আমার ভাল লাগে না।

সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে আছি বিকেলের ম্রিয়মান আলোয়। রাস্তার এত কাছে এত সুন্দর একটা গ্রাম আছে, বাসে চেপে শহরে যাওয়ার পথে এতদিন তা চোখে পড়েনি। চোখে পড়লেও এতদূরে থেকে পল্লী প্রকৃতির এই খোলা

মেলা সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। বাতাসে আর্দ্র ছোঁয়া। নিচের আকাশে পাখি উড়ে যাচ্ছিল ক্লান্তির ছায়া ফেলে। সেই পার্থিব অথচ অপার্থিব ক্লান্তি তখন আমার সর্বাঙ্গে। এক বিপন্ন শিথিলতায় শরীরের জোর হারিয়ে ফেলছিলাম ক্রমশ। বটু ফিরে এলে অপরিচিত এই গ্রামের পথে বেশিক্ষণ সময় অতিবাহিত করা চলবে না। তাছাড়া, শীতের আকাশ বাজিকরের পুতুল নয়—যে যখন-তখন আক্রোশে ফুঁসে উঠে পিচ্ছিল করে দেবে পথ-ঘাট। যদিও তেমন কোনও অশুভ আভাস আকাশের বুকে লেখা নেই। ভরসায় বুক বেঁধে আমি আঁধার কম্পিত-বুকে কুয়োতলার দিকেই তাকাই। চোখে পড়ে মেয়েদের জল তোলার অনায়াস ভঙ্গি, রোদের সোনা রঙে দেহাতি মেয়েগুলোর চকচকে মুখ, রং-বেরঙের শাড়ির আঁচল। শঙ্কা বোধ করি বটুর জন্য। সে বেচারা জল না খেয়েই হয়তো ফিরে আসবে। যা মুখচোরা ছেলে! বয়সটাকে সে যেন কৈশোরের কোটায় আটকে রেখেছে, গ্রামীণ সরলতায় ভরপুর গ্রাম্য কোনও গানের কলির মতো অনায়াস মাধুর্যমণ্ডিত তার জীবনযাপন। কালবিলম্ব না করে সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে আমিও কুয়োর দিকে এগিয়ে যাই। সেই কখন ভাত খাওয়ার পর জল খেয়েছিলাম, তৃষ্ণাও আমার বুকে লগবগিয়ে বেড়ে ওঠা মরুভূমির গুল্মলতা। জল খেয়ে সময় নষ্ট না করে সোজা পথ ধরব ঘরে ফেরার—এমন ইচ্ছে আমার পায়ে দ্রুতগতি এনে দেয়। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে তখনও ঠিকরে পড়ছে মরা রোদ, বিশেষত শীতের এই সময়ে এমন নিরহঙ্কারী রোদ যেন আপন জন।

বেশি দূর যাইনি হঠাৎ তাড়া খাওয়া মোষের মতো হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এল বটু। ওর হাতে মুখে জলের ছোঁয়া। পায়ে স্যান্ডেলে জলের দাগ। চলকে পড়া জলে ভিজে গেছে জামা। মুখে মুক্তো পুঁতির মতো মোটা-মোটা ঘামের ফোঁটা! প্রথমে আমি মনে করেছিলাম—ওগুলো জলবিন্দু, পরে অনুমান করলাম বটুর মুখে কুয়োর শীতল জল নয়, শরীরের লবণাক্ত ঘাম।

বটু আমার কাছে এসে ভেঙে পড়া স্বরে বলল, মাখন দাদা, তাড়াতাড়ি সাইকেলটা ঘুরিয়ে নাও। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে বিপদ হতে পারে। চল, আমরা পালিয়ে যাই।

পালিয়ে যাব, কেন?—আমার প্রশ্নে বটু কাকুতি-মিনতি করার মতো বলল, দোহাই এখন কোনও প্রশ্ন নয়, যা বলার পরে আমি সব বলব। চল, তাড়াতাড়ি পালাই।

বটু যেন বাঘের মুখ থেকে ফিরে এসেছে এমন ভীতিপ্রদ চোখ-মুখ। অথচ দিনের শেষ আলোয় বাঘ তো দূরে থাক—কটা ভ্রাম্যমান গ্রামীণ কুকুরকেও আমি দেখতে পেলাম না। খোলামেলা আকাশের নিচে তখনও ঘরে ফেরা কর্মক্লান্ত মানুষের বিক্ষিপ্ত যাতায়াত আমার নজরে পড়ে।

কুয়োতলা থেকে কপি কলের ঘ্যাড়-ঘ্যাড় শব্দ আছাড় খায় কানের পর্দায়। বটুর উদ্ভ্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত ঘর্মাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমি শুধোই, তোমার কী হয়েছে, অমন করছ কেন?

বটু শুকনো গলায় একবার কেশে নিজেকে স্বাভাবিক করতে চাইল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম---যত্ন করে বটু কিছু একটা লুকিয়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু গোপন করতে গিয়ে সে অকৃতকার্য হচ্ছে বারবার। কি এমন ঘটেছে কুয়োতলায় যা নিয়ে বটুর এত উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা! জেদটা আমাকেও গ্রাস করল। আমি শক্ত চোখে বটুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি জল খাওয়া হয়নি?

বটু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তার চোখের তারায় দোদুল্যমান সংশয়। কুয়োটার দিকে সে ভয়ে তাকাতে পারছিল না। ওর এই হঠাৎ ভাবান্তর আমাকে রীতিমতন ভাবিয়ে তুলল। সাইকেলটা স্ট্যান্ড দিয়ে আমি বটুকে বললাম, চল, আমারও জল তেষ্টা পেয়েছে। কুয়োর জল খেয়ে মেসে ফিরব।

জল খাওয়া সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে জরুরী ছিল না তবু রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য মরিয়া হয়ে আমি বটুর হাত ধরে টানলাম। বটু নিরুপায় দৃষ্টি ফেলে আমাকে দেখল। অবশেষে কাতর স্বরে বলল, আমি যাব না মাখন দাদা—তুমি যাও। কেন যাবে না, তোমাকে যেতেই হবে। জেদে সোচ্চার হয়ে উঠল আমার গলা। এবার বটু আমার হাতটা ধরল কৃপাপ্রার্থীর মতো। সবিনয়ে কম্পিত স্বরে বলল, ওখানে গেলে তার সাথে আবার দেখা হয়ে যাবে। আমি চাই না দ্বিতীয়বার তার সাথে আমার দেখা হোক।

বটুর কথায় রহস্যময়তার গন্ধ। এই নিস্তেজ বিকেলে বটু কি ভূত দেখেছে কুয়োতলায়! আমি ওকে ধমক দিয়ে বললাম, চল, তোমাকে যেতেই হবে। তোমার কোনও অজুহাত আমি শুনব না।

বটুকে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম কুয়োতলায়। আমাদের দেখে লজ্জায় সরে দাঁড়াল উদ্ভিন্ন যৌবনা দু-তিনটি মেয়ে। বটু গাছের মতো স্থির, নিষ্পলক। দরদরিয়ে ঘামছিল। ওর স্পন্দনহীন, জড়তাপূর্ণ দৃষ্টি একটা চারা আমড়া গাছের গোড়ায় নিবদ্ধ। আমি জল চাইতেই মাঝবয়সী একটি বউ সাগ্রহে আমাকে লোটা ভরে জল দিল। আমি আলগোছে জল খেয়ে নিঃশব্দে বটুর কাছে ফিরে এলাম। বটু তখনও হাঁ করে তাকিয়ে আছে, কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল সে। আমি ওর কাঁধে হাত রাখতেই চমকে ফিরে তাকাল বটু। লজ্জা সংকোচে রক্তিম ওর মুখ। ও কিছু বলার আগে আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, কি দেখছ অমন মনোযোগ দিয়ে?

বটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কৈ কিছু না তো! তারপর সে ঘাড় নিচু করে

স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াল।

আমড়া গাছের ছায়ায় শ্যামলা রঙের কাঁচদূর্বার মত নরম দৃষ্টির মেয়েটিকে অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলাম আমি। মেয়েটির হাতে একটা পেতলের ঘড়া। জল নিতে এসে কুয়ো ফাঁকা নেই বলেই দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। মেয়েটিকে দেখে আমার মনে হাজার প্রশ্নের ঝড় উঠল। বটু কেন এই মেয়েটার দিকে তাকিয়েছিল অপলক। যে বটু মেয়েদের মুখের দিকে তাকাতে সাহস পায় না সে কোন্ সাহসে বেপরোয়া, সর্বগ্রাসী রাজভিখারি দৃষ্টি মেলে মেয়েটাকে দেখছিল? তবে কি ওই শ্যামলা মুখশ্রীর সুশ্রী মেয়েটি বটুর পূর্ব পরিচিত? এমন ভাবতে আমার সাহস কুলায় না। মেয়েটির কাছ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচু গলায় বটুকে শুধোই, ওই যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে ওকে তুমি চেন নাকি?

বটু আমার প্রশ্নটা হৃদয় দিয়ে শোনে। মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে ও নীরব থাকে কিছুক্ষণ। আমি আবার অধৈর্য হয়ে বলি, কি হল জবাব দিচ্ছ না যে—আত্মসমর্পণের দৃষ্টিতে বটু আমার দিকে তাকায়, সে অনেক বেশি সাহসী। আত্মপ্রত্যয়ী স্বরে বলল, আমি ভাবতেই পারছি না সুখিয়া এখানে এল কী করে? মাখন দাদা, তোমাকে যে সুখিয়ার কথা বলেছিলাম —তাকিয়ে দেখ সে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি রেগে-মেগে বললাম, তোমার কি মাথা খারাপ হল! দ্বারভাঙা জেলার কোন্ অজ-পাড়াগাঁয়ের সুখিয়া এখানে আসবে কী করে? তুমি ভাল করে দেখ, তোমার হয়তো কোথাও ভুল হচ্ছে।

বটু সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকাল, ওর চোখে ভুল-ভ্রান্তির কোনও ছাপ নেই। সে যা বলছে তা যেন অনেক ভেবেচিন্তেই বলছে। আমার কাছে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সরে এসে বটু আগের মতো দৃঢ়গলায় বলল, দিনের আলোয় ওকে আমি চিনতে ভুল করিনি। মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে, ও তো সুখিয়াই। ও যদি সুখিয়াই না হবে তাহলে আমাকে দেখে কেন কুয়োতলা থেকে পালিয়ে গেল।

বটুর যুক্তির আমি কোনও তল খুঁজে পাই না। ওর কি সুখিয়ার চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে গেল? সন্দেহ ভর্তি চোখ নিয়ে আমি বটুকে দেখি, যত দেখি ততই অবিশ্বাসের রেখাগুলো আমার খর দৃষ্টিতে ঝিলমিলিয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ আগে বটু সুখিয়ার স্মৃতি রোমন্থনে ডুবে গিয়েছিল, তখন যে অস্বাভাবিকত্ব আমি ওর চোখে ফুটে উঠতে দেখেছিলাম—তা এখন প্রমাণিত সত্যের মতো মহান। আমি কি করে বটুকে বোঝাব যে মেয়েটি চারা আমড়া গাছের পাশে পেতলের ঘড়া পায়ের কাছে নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে আদৌ সুখিয়া নয়। এটা বোঝালেও বটু এখন বুঝবে না। বিরাট এক ঘোরের মধ্যে বটুর এমন অবস্থা। যতক্ষণ না ওর ঘোর কাটছে

ততক্ষণ আমার কথা পানসে বিস্বাদময় কোনও খাদ্যের মতো অনাদরের বিষয় হয়ে পড়ে থাকবে। তবু, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা দরকার। আমি নিচু স্বরে বটুকে বোঝালাম, এখনও দিনের আলো ফুরিয়ে যায়নি, তুমি ভাল করে দেখ, যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সে তোমার সুখিয়া নয়। —এ গ্রামের মেয়ে। অত দূরে থেকে সুখিয়া বলে ভুল করছ। সে এখনও অবিবাহিতা।

বটু নিজস্ব যুক্তিতে অনড় থাকল। ধীরে ধীরে বিকেলের রোদ সরে গিয়ে ছায়া পড়ছিল তরল আঁধারে। চোখের পলকে চারদিক কেমন শান্ত, নিঝুম পাহাড়গুলো নিদ্রাতুর চোখ মেলে চেয়ে আছে গ্রামটার দিকে, গভীর ঘুমের আচ্ছন্নতায় সব যেন ধীরে ধীরে বিবশতায় ডুবে যায়। গ্রামে ঢোকার একমাত্র পথটায় আলো কমে এসেছে, অন্ধকার ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে মাঠ-ঘাট গাছ-গাছালির উপর। আমি দেখলাম সেই তন্বী, শ্যামল সজীব কমনীয় মুখের মেয়েটা পায়ের কাছ থেকে পেতলের ঘড়াটা তুলে নিয়ে ধীর মন্দ পায়ে এগিয়ে গেল কুয়োতলার দিকে। এই সুযোগ হাতছাড়া করার নয়, আমি লক্ষ্য করলাম কুয়োতলা একেবারে ফাঁকা—শুধু একটা শীর্ণ রোগাটে শন চুলের বুড়ি কতকগুলো এঁটো বাসন-কোসন নিয়ে মাজছিল অলস হাতে। এই সুযোগে বটুকে একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। দূরে থেকে সে যাকে সুখিয়া বলে ভুল করেছে হয়তো কাছ থেকে তার এই মতিভ্রম দূরে হবে—এই ভেবে আমি বটুকে অনুরোধ করলাম কুয়োতলায় দ্বিতীয়বারের জন্য যেতে। বটু আমার প্রস্তাবে রাজি হল না, বিরক্তিতে ওর মুখের রেখাগুলো নিমেষে কঠিন হয়ে এল। গুড়ো গুড়ো কুয়াশায় তখন ভরে গিয়েছে চারধার, অশ্বত্থ গাছটা আবছা হয়ে উঠছিল চোখের সামনে! পাখ-পাখালির ডাক আগের মতো সরব নয়। বটুকে বারংবার বলা সত্ত্বেও বটু যখন গেল না, তখন আমিই জোর কদমে এগিয়ে গেলাম কুয়োতলায়। গিয়ে দেখি মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে কুয়ো থেকে জল তুলছে। ওর মুখে সরল আপন ভোলা হাসি! এমন সুন্দর হাসি দেখলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা আরও প্রবল হয়। স্বীকার করতেই হয় বটুর নজর আছে। মেয়েটা সঙ্গে করে একটা রশি বাঁধা ছোট বালতি এনেছিল। কুয়োয় বালতিটা আলগোছে ছেড়ে দিতেই শব্দ হচ্ছিল কপাৎ, আর তোলপাড় জলের দিকে নজর ফেলে আপন মনে হেসে উঠছিল মেয়েটা। আমি যে ওর সাত হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছি সে খেয়াল ওর নেই। হয়তো জলের সাথে খেলবে বলেই দেরি করে কুয়োতে আসা। শীত পড়ছিল. কুয়োতলা থেকে উঠে আসছিল হিম স্পর্শী হাওয়া। মেয়েটার স্বাধীনচেতা দুরন্তপনা দেখে মনে হল, ওর কাছে শীত-গ্রীষ্ম সব সমান। নাহলে, একটা সামান্য ফ্রকের মতো হাঁটু ছাপানো জামা পরে কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে এখন!

ভাবলেই আমার যেন শীত ভাবটা বেড়ে যায়। তবু, এমন দৃশ্য দেখতে পাওয়া যেন একটা ভাগ্যের ব্যাপার—এমন স্বতঃস্ফূর্ত ঝর্না সাবলীল দেহ ভঙ্গিমা হাসি রেল কলোনিতে কোথায় পাব? ঠিক চোরের মতো নয়, অথচ সিঁধেল চোরের মতো ড্যাবা-ড্যাবা চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকলাম একান্তে। এই নির্জনতা আমার বুকের বিষণ্ণ বাতাস বের করে দিয়ে আমাকে ভরিয়ে তুলল আমার মতো করে। মেয়েটি বালতিতে করে জল তুলে ঘড়ায় ভরছিল। দু-তিন খেপ তোলার পরে আমি দেখলাম এবার বেশ দ্রুততায় বালতিটা ডুবিয়ে দিচ্ছিল কুয়োয়, জামা ভিজিয়ে টেনে তুলছিল বালতি। বুঝতে পারলাম—পাহাড় দেশের শীত এবার ওকে তাড়া করেছে, ওর পাতলা ফুল ছাপা জামাটা ওই দাঁতাল শীতের সাথে কিছুতেই পেরে উঠছে না। মেয়েটা ঘড়া ভরে যেই বাড়ির পথে পা বাড়াবে—অমনি আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ভেতরেও তখন হুলুস্থুলু। একটা অজানা, অচেনা গ্রামে এমনভাবে একটা পূর্ণা যৌবনা মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা পাহাড়ি মৌমাছি চাকে ঢিল মারার সমান। একটু এদিক-ওদিক হলেই গ্রামবাসীরা বিষাক্ত হুলের মৌমাছির চেয়েও মারাত্মক হয়ে উঠবে চোখের নিমেষে। ভয়টাকে যতই ঝেড়ে ফেলতে চাই, ভয়টা তবু যায় না। পায়ের তলা থেকে একেবারে মাথার ঘিলুতে জড়িয়ে যায়। মেয়েটি ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে। ভয় পেয়েছে কিনা চোখ-মুখের ছটফটানি দেখে বোঝা যায় না। আমি সামনে দাঁড়াতেই মেয়েটা ক-পা পিছিয়ে গিয়ে ঘড়া কাঁখে দাঁড়াল। এক ঝলক দেখে নিয়ে আবার নামিয়ে নিল চোখ। যাক, বাঁচা গেল। ও আমাকে চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমায়েশ ভাবেনি। ভাবলে চেঁচিয়ে উঠত, নয়তো কাঁখের ঘড়া দড়াম করে ফেলে দিয়ে বাড়ির দিকে ছুট লাগাত। সেদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান। মেয়েটির মতিগতি বুঝে নিয়ে ভাঙা হিন্দিতে বলি, আমাকে একটু তোমার ঘড়া-বালতিটা দেবে। জল পিপাসা পেয়েছে, কুয়ো থেকে জল তুলে খেতাম।

মেয়েটি এক মুহূর্তের জন্য ভাবল না, আমার চোখের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে আশ্বস্ত হয়ে বলল, আসুন।

আমি এবার ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম, চটকরে চন্দনার মুখটা আমার মনে পড়ল। চন্দনা অনেকটা ঘষামাজা, এই মেয়েটির সিঁদুরে-আমের চিলকার মতো গায়ের রং। গোলগাল, ভরাট স্বাস্থ্য, লক্ষ্মীশ্রী হাত-পা। চোখ দুটো বড়-বড়, বর্ষার জামফলের চেয়েও কুচকুচে কালো। চওড়া কপালে কাচপোকা টিক্‌লি। মোটা ঠোঁট দুটো তার গোলাকার পদ্মপাতা মুখের সাথে মানিয়ে যায়। সব মিলিয়ে মেয়েটার চেহারায় নজর কাড়া চমক আছে। আমি ওর মেয়েলি গলায় ভরাট শব্দের গমগমানি শুনে অবাক হলাম। কুয়োর দিকে এগিয়ে যাব, মেয়েটি বলল, দাঁড়ান।

আমি বাধ্য ছেলের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম।

মেয়েটি কাঁখ থেকে ঘড়া নামিয়ে আমাকে বলল, হাত পাতুন।

আমি মাজা ভেঙে হাত পেতে দাঁড়িয়েছি, মেয়েটি ঘড়া কাত করে নির্দ্বিধায় জল ঢেলে দিল আমার হাতে। আমি আকণ্ঠ পানে ডুবে গেলাম। এত তৃষ্ণা বুকের ভেতর আগে যে জানি না! আসলে এ হয়তো আমার তৃষ্ণা নয়, ভিখারি সেজে নদীর কাছে জল চাওয়া। আমার সামনে তরল আলোয় যে দাঁড়িয়ে আছে সে নদী ছাড়া আর কে হতে পারে। সেই প্রথম আমি অনুভব করি—প্রতিটি মেয়েই সময় বিশেষে নদী। সে আকাশও হতে পারে, আবার এই সসাগরা ধরিত্রীও। চন্দনাকে দেখেও আমার এমনটা মনে হয়েছে, বন্ধুরা শুনে মন্তব্য করেছে, আমি কামুক পাগল…কত কী! তাদের কথায় আমি ইদানিং দুঃখ পাই না, আমার চোখ দুটোই নদীর জলে ভেসে যাওয়া কৃষ্ণ গোপাল। আমি যেন ওই মেয়েটির জাম কুচকুচে চোখের তারায় তলিয়ে যাই। হারিয়ে যেতে-যেতে আমার ইতিহাসে বইয়ের সেই ছবিটার কথা মনে পড়ে। বুদ্ধদেবের সামনে পায়েসের থালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সুজাতা, সুখিয়া কি তাহলে সুজাতা? এ প্রশ্ন অপরিচিতাকে আমি করতে পারি না, তবে অপরিচিতার প্রশস্ত হৃদয়ের সন্ধান পেয়ে বটুর নেশাটা আমার চোখেও লেপটে যায়। বটু কি তাহলে জহুরী না হলে সে চেনে কী করে?

মেয়েটা আবার ঘড়া ভরে নিয়ে ফিরে গিয়েছে তার ঘরে। যাওয়ার সময় আমি তাকে শুধিয়েছিলাম, আচ্ছা, এ গ্রামে কি চা পান বিড়ির দোকান নেই?

আমার প্রশ্নে মৃদু হেসেছিল মেয়েটি, এ গ্রামে কেউ লাল চা খায় না। এখানে সবাই সফেদ চায়ের ভক্ত।

সফেদ চা?

এবার ঠোঁট ফাটিয়ে ভেতর থেকে হেসে উঠেছিল মেয়েটি, আমার দিকে তাকিয়ে হাওয়ার সুরে মিহি গলা মিলিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, সফেদ চা! হাড়িয়া-রশাকে এ গ্রামের সবাই সফেদ চা বলেই জানে। বিশ্বাস না হয় হাঁড়িয়া ভাঁটিতে চলে যান, সব চোখের সামনে দেখতে পাবেন। আমি জিভ কেটে বলেছিলাম, সফেদ চায়ে আমার দরকার নেই। পান-বিড়ির দোকানটা দেখিয়ে দিলেই হবে।

অন্ধকারে চিনতে পারবেন?

চিনিয়ে দিলে নিশ্চয় পারব।

মেয়েটি আঙুল উঁচিয়ে একটা সিমগাছওলা বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছিল। হেঁটে গেলে সেখানে পেঁছতে বড় জোর পাঁচ মিনিট লাগবে।



এগার

অন্ধকার নেমে আসলে খাপরার ঘর আর পাকা ঘরের ফারাক বোঝা যায় না। আর শীতকাল হলে তো কথাই নেই, ঘরের আলোটুকু পর্যন্ত দেখা যায় না, সব একেবারে গলা টিপে মেরে ফেলার মতো আয়োজন। দমকা হাওয়ায় রাস্তার দু-পাশের গাছগুলো নত মাথায় কেঁপে উঠছিল যেন তাদের দুনিয়া-রাজ্যে কেউ নেই, তারা একলা এবং প্রতিরোধহীন। অনেক দিন পরে আমাদের চোখের সামনে সন্ধে নামল, এবং তা ভয়াল-ভয়ংকর অমাবস্যার রাত্রির চেয়েও কৃষ্ণকান্ত। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় সন্ধে রাত্রিটা ভয় এবং চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অথচ আমি এবং বটু দু-জনের কেউই সন্ধ্যার অন্ধকারকে গুরুত্ব দিলাম না। আমাদের যে ছ-মাইল দূরে স্টেশনের ধারে ফিরে যেতে হবে সে চিন্তা ধুয়েমুছে আমরা এমনভাবে দোকানের দিকে এগিয়ে গেলাম, যেন আমাদের কোনও ব্যস্ততা নেই ফিরে যাবার। বটু অবশ্য মাঝে একবার ক্ষীণ গলায় বলেছিল, চলো মাখনদাদা, এবার আমরা ফিরে যাই। অচেনা জায়গায় সাঁঝের বেলায় ঘোরাঘুরি ভাল নয়। তাছাড়া দিনকাল খারাপ, লোকে সন্দেহের চোখে দেখবে।

আমি বটুর কথাকে গুরুত্ব দিইনি, কেননা বটু যা বলছে সেটা তার মনের কথা নয়। বটুর ইচ্ছে ছিল মেয়েটার সাথে কথা বলার, ওর খোঁজখবর নেওয়ার। ওর ভীরুতাই ওকে অতদূর অগ্রসর হতে দেয়নি, এবং এর জন্য আমি বিন্দুমাত্র দায়ী নই। কুয়োতলা থেকে ফিরে এসে মেয়েটির সম্মোহনী আলাপচারিতার কথা হুবহু বটুকে আমি সব ব্যাখ্যা করেছি। বটু তা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছে, এবং বিস্ময়াভিভূত চোখ মেলে সে আমাকে বারংবার দেখেছে। এবং অতিরিক্ত বাক্যালাপ করার জন্য আমাকে প্ররোচিত করেছে। বটুর এই অযাচিত উন্মাদনার রহস্যটি আমার বুঝে নিতে কোনও অসুবিধা হয়নি। মেয়েটি যে সুখিয়া—বটু তার সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়ে আসেনি। বটুর এই একগুঁয়েমি আমাকেও কিঞ্চিত সন্দিহান এবং সংশয়ী করে তুলেছে।

মনে ভাবি, এই পৃথিবীতে কত না ঘটনা ঘটে যাচ্ছে একের পর এক, দিনের পর দিন, তার কতটুকুই বা খোঁজখবর রাখি আমি। বটু যা বারবার করে বলছে বা দাবি করছে তা সত্যি হলেও হতে পারে। তাকে যাচাই করা জরুরি। নাহলে পরে এই বটুই আমাকে দুটো কথা শোনানর সুযোগ পাবে। আমি বটুকে তেমন সুযোগ দিতে চাই না। সন্ধে নেমে আসায় বাহ্যত আমরা ডানা মুচড়ে দেওয়া পাখির মতো অসহায় বোধ করি। মেয়েটি কুয়ো থেকে ঘড়া ভরে নিয়ে চলে গিয়েছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে। আমি বা বটু তাকে অনুসরণ করতে পারিনি, মুখ্যত অন্ধকার এবং অপরিচিত পথঘাটই দায়ী। বটু বেশ ভেঙে পড়েছে তা আমি ওর কথাবার্তাতে অনুমান করতে পারি। কিন্তু আমিও যে নিরুপায় সেটা বটুকে বোঝাতে সক্ষম হচ্ছি না। মেয়েটি চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর বটু মনের দিক থেকে ভেঙে পড়েছে, ওর সরল মুখাবয়বে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে যা অন্ধকারেও আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। বটু ফিরে যাওয়ার কথা বলছিল, কিন্তু ফিরে গেলে ও যে শান্তিতে যেতে পারত না তা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। মেয়েটি যাওয়ার আগে যে নিমগাছওলা বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েছিল, সেদিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। হাঁটাচলায় বটুর বিশেষ কোনও উৎসাহ ছিল না। এতদিন পরে সুখিয়ার দেখা পেয়ে বটু যেমন ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিল এখন কঠিন আঁধারে তা কিছুটা প্রশমিত। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘাস ভিজে উঠেছে শিশিরে, চটি ছাড়িয়ে গোড়ালিতে শিশির জলের ছোঁয়া লাগে! বটু কিছুটা এসেই হতাশ স্বরে বলে, চলো মাখনদাদা, এবার আমরা ফিরে যাই। অন্ধকার রাত এখন না ফিরে গেলে খুব অসুবিধে হবে।

অসুবিধা যা ভাগ্যে আছে তা তো হবেই। আমার কথায় বটু থতমত খাওয়া চোখে তাকাল। আমি বললাম, আমার সিগ্রেট ফুরিয়ে গিয়েছে। এক প্যাকেট নিয়েই ফিরে যাব। বটু কেমন ঝিম মেরে হাঁটতে লাগল। অন্ধকারে ওর দীর্ঘশ্বাস আমাকে কাঁপিয়ে দিল, আমি বোবার মতো হাঁটতে লাগলাম ওর পাশাপাশি। বটুর যে চিরস্থায়ী একটা দুঃখ ছিল তা আমি পূর্বেই অনুমান করেছিলাম, আজ তার গভীরতা এবং প্রখরতা অনুভব করে আমি নিজেও মুষড়ে পড়লাম। বটুকে আমি দুঃখী দেখতে চাই না, তাই হয়তো আমার এই অন্তর্গত প্রতিক্রিয়া।

পথের দুপাশে ঢোলকলমীর ঝাড়, হাওয়া ঝুঁকে পড়েছে পথের উপর। ডালপালা সরিয়ে হাঁটতে গেলে মনে হয় এ পথ যেন আর ফুরোবে না। রাতটা এখানেই ভোর হয়ে যাবে। বটু আবার কুয়োতলায় সুখিয়ার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে। রেল কলোনিতে জোনাক পোকাগুলো যে কোথায় যায়, অথচ এই নির্জন পথে জোনাক পোকার হাট। অদ্ভুত সব শব্দ আসছিল ঝোপের ভেতর থেকে। বড় তেঁতুল গাছটা পেরিয়ে আসতেই একটা হাঁড়িয়া

ঠেক নজরে পড়ল। তখনও ঢুলু ঢুলু মাতাল চোখের নেশাখোর মানুষগুলো অন্ধকারে তারিয়ে তারিয়ে চাখনি দিয়ে হাঁড়িয়া খাচ্ছিল। এই খাওয়াটাই তাদের বেঁচে থাকা আমি জানি। দুবেলা অফিস যাওয়া-আসার পথে প্রায়ই তো এদের দেখি। কত সস্তা, অহমিকাহীন এদের জীবন ধারণ। বটু হয়তো বিরক্ত হয়ে উঠেছিল মনে মনে ; একটা পচা পাতায় পা পড়তেই ও সিঁটিয়ে আমার কাছে চলে এল। আমি আঙুল তুলে বললাম, ওই তো আর সামান্য পথ। সিগ্রেটটা নিয়েই চলে যাব, দেরি করব না।

আমার কথায় হ্যাঁ বা না কোনও কিছুই বটু বলল না। সুখিয়াকে পেয়েও সে হারিয়ে ফেলেছে এই ক্ষোভ ঝাড়া দিয়ে উঠছিল বুকে। এতদিন তার এত জ্বালা-যন্ত্রণা ছিল না। আজ সেই পুরনো ঘায়ে বিধাতা যেন গরম তেল ঢেলে দিয়ে মজা দেখছেন অলক্ষ্যে। বটু হারবে না ! সে আবার আসবে। সুখিয়াকে যে করেই হোক খুঁজে বার করবে। তাতে তার সর্বস্ব যায় যাক। বদনামে মাথার চুল পেকে গেলেও বটু তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়বে না।

নিমগাছ লাগোয়া ঘরখানা কাঁচা ইঁটের গাঁথুনি। ছাট জলে পায়রিয়া মাড়ির মতো ক্ষয়ে গিয়েছে দেওয়াল। ঘরটার উপরে অর্ধগোলাকার টালি। শ্যাওলা পড়ে টালির আসল রং অনেকটা ছ্যাচা কালমেঘ পাতার মতো। টিমটিম করে হ্যারিকেন ঝুলছিল শূন্যে। পাশে যে ছোটমতো ঘরটা আছে তার বারান্দায় দু-তিনটে ছাগল বাঁধা।

দোকান খোলা ছিল কিন্তু কোনও খদ্দের ছিল না। দোকানের মালিক ছিল ভেতরের ঘরে। আমরা ডাকাডাকি করতেই সে এল কম্বল গায়ে জড়িয়ে, আশ্চর্য তার শুধু চোখদুটোই বেরিয়ে আছে মাকড়সার পেটের মতো। দোকানদার লোকটি মাঝবয়সী। মাঝারি উচ্চতা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। মুখ দেখলেই বোঝা যায় বেশ পোড় খাওয়া লোক। দোকানের মধ্যে ঢুকে এসে মালিক সুলভ গলায় বলল, কি চাই ?

সিগ্রেট আছে ? এবার দোকানদারটা আমার মুখের দিকে তাকাল, আমাকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে রীতিমতো বিস্ময় মাখান স্বরে বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে একটা কথা শুধাই। আপনি কি বাঙালি ? লোকটি আমাকে সরাসরি বাংলায় জিজ্ঞাসা করেছে তাই উত্তরটা আমাকে বাংলাতেই দিতে হল। আমার মুখে বাংলা শুনে ভূত দেখার মতো চোখ করে তাকাল, কি সৌভাগ্য, আপনি বাঙালি ! আমি তো ভাবতেই পারি না, এই অজগাঁয়ে কোনও বাঙালি কোনদিন সিগারেটের খোঁজে আসবে। তা কি ব্যাপার, এই সন্ধেবেলায় এদিকে এলেন কিভাবে ?

আমি সব খুলে বলতেই লোকটি আরও আশ্চর্য হল। আমি সিগারেট দেশলাইয়ের দাম মিটিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। লোকটি দোকান থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে এল উঠোনে। আমার হাতটা ধরে নিকট

আত্মীয়ের সুরে বলল, চলুন, একটু বসে যাবেন। জানেন ভাই, কতদিন বাংলা ভাষায় প্রাণ খুলে কথা বলিনি। গাঁয়ে সবাই হিন্দি আর আদিবাসী ভাষা বলে। আমি হিন্দিটা একটু-আধটু বলতে পারি, কিন্তু আপনার বৌদি এই সাত বছরে সাতটা অক্ষরও শেখেনি। তাই লজ্জায় সে ঘর থেকে বেরোয় না। আপনাদের দেখলে সে বড় খুশি হবে। চলুন, ভেতরে চলুন।

আমি তাজ্জব, বটু হতবাক। এ এক উটকো ঝামেলায় পড়া গেল। লোকটি নাছোড়বান্দা। উঠোন থেকেই চিৎকার করে বলল, কৈ গো শুনছো, একটু চা বসাও! দেখো, কারা এসেছে।

লোকটা ব্যস্ত হাতে দুটো পুরনো চেয়ার এনে ধুলো ঝেড়ে আমাদের বসার জায়গা করে দিল। দোকান ঘরে একমাত্র হ্যারিকেন ঝুলছিল, অক্লেশে তা পেড়ে এনে আমাদের সামনে বসিয়ে দিল। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে সে এসে আমাদের পাশে বসল। আমাদের ফেরার তাড়া ছিল, পথ অনেকটা তাই উসখুসিয়ে উঠছিল বটু। দোকানদারটা কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করল, ইনি কে, আপনার বন্ধু বুঝি?

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই লোকটি আবেগে বটুর হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে প্রায় শিশুর গলায় আমোদিত হয়ে বলে উঠল, কি ভাগ্য আমার, আপনাদের মতো বাবু মানুষের পায়ের ধুলো পড়েছে আমার ঘরে। তা, কি আর বলব। এই গ্রামে আমার সাত-সাতটা বছর কেটে গেল। আজ অব্দি একটা বাঙালির দেখা পাইনি।

আমি খুব বিস্মিত হলাম, একি বলছেন?

লোকটা আরো দৃঢ়তার সাথে বলে উঠল, যা বলছি তা ঠিক। বিশ্বাস না হলে আমার গিন্নীকে শুধোন। আমার গিন্নীতো বারবার আমাকে বলে, চলো এখান থেকে উঠে যাই। এমন বনবাস অসহ্য। তা কি আর বলব। বলতে গেলে এটা তো একরকম বনবাসই। শ্রীরামচন্দ্র বনবাস গিয়েছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে পাক্কা চোদ্দ বছর বনে বনে কাটালেন। আমার ভাগ্যটাও অনেকটা সেইরকম। দেশ গাঁ ছেড়ে দুটো পেটের ভাতের জন্য এখানে এসে মাথা গুঁজেছি।

শেষের দিকের কথাগুলোয় কেমন একটা জলীয় স্পর্শ ছিল। আমি বটু দু-জনেই সেই সদাহাস্যময় মানুষটার মুখের দিকে তাকালাম। হ্যারিকেনের আলোয় চিকচিক করছিল দোকানদারের চোখদুটো। কেমন ভার ভার গলায় সে বলল, দেশ ছিল আমার বাংলাদেশে। ভিটে ছাড়া হতেই বর্ডার পেরিয়ে চলে এলাম। দু-বছর রিফ্যুজি লাইফ কাটিয়ে ঠেলা মেরে পাঠাল দণ্ডকারণ্যে। সেখানেও ঠাঁই হল না। ছিটকে এসে পড়লাম এইখানে। এখান থেকে কেউ আর ভাগিয়ে দেয়নি, সেই থেকে আছি। এই ঘরটা জায়গা কিনে নিজের হাতেই বানিয়েছি। আপনার বৌদির ভরি পাঁচেক গয়না ছিল, তা বেচে

দিয়ে এই ভূষিমালের দোকানটা ঘিরে দিয়েছি। তা চলে মোটামুটি। যা হয় তাতে আমাদের কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে যায়। এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে লোকটি সামান্য হাঁপ নিল, তারপর বিরাট কোনও দোষ করে ফেলেছে এমন চোখ মুখের ভঙ্গি করে বলল, এই যা, আমিই তো শুধু বকবক করে চলেছি, তা আপনাদের কথা তো কিছু শোনাই হল না? তা বলুন, কোথায় থাকেন, কী করা হয়?

আমি আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেই দোকানদার স্বভাবসিদ্ধ হেসে বললেন, ও, আপনি তাহলে রেলবাবু? তা ক-বছর ধরে আছেন?

এই তো সবে আড়াই বছর হল। উত্তর দিয়েই আমি বটুর দিকে তাকালাম, ও কেমন গুটিয়ে রেখেছিল নিজেকে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অপারগ ছিল বটু। এতক্ষণ হল অথচ বটু সেই থেকে একটা কথাও বলেনি। যা কিছু ঘটছিল সবই একপেশে।

ওঠার জন্য তাড়া লাগালাম আমি, বটুও ঘাড় নেড়ে সায় দিল আমার কথায়। দোকানদার অসহায় চোখে তাকিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে আমার হাতটা চেপে ধরলেন, অনুনয়ের স্বরে বললেন, কতদিন পরে একজন বাঙালির দেখা পেলাম, শুধু মুখে ফিরিয়ে দিতে পারি না। আর একটু বসুন। চা হয়ে গেল বলে। চা খেয়েই চলে যাবেন, আর আটকাবো না।

এমন ঐকান্তিক অনুরোধকে উপেক্ষা করা পাপ। তাছাড়া দেরি যখন হয়েছেই তখন আর একটু সময় ব্যয় হলেই বা ক্ষতি কি। দোকানদার ভদ্রলোকটি একটু বেশি কথা বলেন, আমোদপ্রিয় লোক, মানুষের সাহচর্য পেলে চট করে তা হারাতে চান না। আমাদের উপস্থিতি তাকে যে খুব খুশি করেছে এটা আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। লোকটি চায়ের খোঁজে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। ফিরে এলেন হন্তদন্ত হয়ে, তাঁর দু-হাতে দুটো ফুল আঁকা কাচের গেলাস। তাতে জল ভর্তি। গ্লাস দুটো ছোট টুলের উপর নামিয়ে রেখে উনি ঘরের দিকে মুখ করে বললেন, লজ্জা কি রে, আয় না, এরা তো আমার আপনজন। আমি থতমত খেয়ে দেখি কাঁচ শ্যামলা একটা মুখ কাপড়ের পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দ্বিধান্বিত চোখ মেলে তাকিয়ে। ভদ্রলোক না উঠেই স্মিত হাস্যে সেই একইরকম ডাকলেন, আয় না, চলে আয়। পর্দা সরিয়ে কাচের প্লেট হাতে মেয়েটি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। লজ্জা অবনত মুখ। ঠিক রোগা নয়, আবার মোটাও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি দেবদারু টানটান শরীর। এক পিঠ খোলা চুল তাকে একটা বিশেষ সৌন্দর্য প্রদান করেছে। মেয়েটি কাচের প্লেটটা নামিয়ে রাখতেই ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দিলেন, সীতা আমার একমাত্র মেয়ে। ওর খুব পড়াশোনার শখ ছিল কিন্তু এখানে ধারেকাছে স্কুল না থাকায় ওর আর পড়াশোনা হল না। ভদ্রলোকের গলায় আফশোস ঝরে পড়ল।

সীতার সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই আমার সর্বাঙ্গে উষ্ণ একটা স্রোত বয়ে গেল। এই মেয়েটিকে কুয়োতলায় বিকেলে নিভু আলোয় বটু আমি দুজনেই দেখেছি। এই মেয়েটিই ঘড়া থেকে জল ঢেলে আমার তৃষ্ণা নিবারণ করেছে। অথচ তখন আমি বুঝতে পারিনি মেয়েটি বাঙালি। ওর হিন্দি বলার ধরণ দেহাতি মানুষগুলোর মতোই চোস্ত, সাজ-পোশাক ছিল অবিকল ওদেরই মতো।

বটু জল খাচ্ছিল তখন, আড় চোখে তাকাতেই নাকেমুখে জল উঠে সে এক বিশ্রী অবস্থা। দুর্দান্ত শীতে বটু দরদরিয়ে ঘামছিল, সেই যে ও মাটির দিকে চোখ নামিয়েছে তারপর ওকে আমি আর ঘাড় তুলতে দেখিনি।

সন্ধেবেলায় সীতাকে দেখেছিলাম জামা পরা অবস্থায়, এখন সে গোলাপী রঙের একটা শাড়ি পরাতে একেবারে কলেজে পড়া মেয়েগুলোর মতো দেখাচ্ছিল। আমরা আছি বলেই সীতা সামান্য সাজগোজ করে সামনে এসেছে। ওর শ্যামলী মুখে পাতলা পাউডারের আস্তরণটা আমার চোখ এড়াল না। কপালে লাল ভেলভেটের টিপ, নাকছাবিটায় পাথরের রং ঠিক মাধবীলতার পাপড়ির মতো লাল। সুতন্বী, ডাগর চোখের সীতাকে দেখে সব পুরুষেরই চোখের তারা অল্প সময়ের জন্য হলেও কুঁচকে যাবে—এমনটা আমার বিশ্বাস। এমন এক একটা মেয়ে থাকে যারা অতি সাধারণ হয়েও, কোনও না কোনও দিক থেকে অসাধারণ—সীতা তাদের দলে পড়ে। ওর নাক-চোখ-মুখ আর গোলাকার চিহ্নলতা সুলভ মুখমন্ডলে এমন এক অদ্ভুত সাযুজ্য আছে যা শাশ্বত সুন্দর। সীতা দাঁড়িয়েছিল শালকাঠের খুঁটি ধরে, ওর বাবা বলছেন, দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বাবুদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর। এরা তোর গুরুজন। ভদ্রলোকের কথা শুনে বাধা দেওয়ার আগেই বাঙালি কায়দায় সীতা বটুর পায়ে হাত দিল। সে এক দেখার মতো দৃশ্য, বটু লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বিড়বিড়িয়ে বলল, এ পাপ…। তারপর হাত দুয়েক সরে গিয়ে অপরাধীর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, পরিস্থিতি যে এমন ঘোরাল হয়ে উঠবে তা সে স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেনি।

ভদ্রলোক নিজেকে শোনানোর মতো বললেন, বড়দের ছোটরা প্রণাম করবে এ আর এমনকি। বরং এটা না হলেই খারাপ দেখায়। আপনারা তো আমার পর নন, বরং বলা যায় আপন। তাছাড়া, সীতা তো এখানে কাউকে প্রণাম করারই সুযোগ পায় না। সেদিক দিয়ে আজ ওর একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল।

খাবারের প্লেট দুটোয় আমরা কেউই হাত দিইনি। ভদ্রলোক তা দেখে বললেন, খেয়ে নিন। সামান্যই দিয়েছে, আমার আর কী সামর্থ আছে বলুন। দেখছেন তো সব নিজের চোখে। প্লেট ভর্তি সাজানো খাবার। ডালডায় ভাজা খান ছয়েক লুচি, সঙ্গে আলুভাজা। তার সঙ্গে বাড়তি হিসেবে সুজির পায়েস, তার পরিমাণও নিতান্ত কম নয়। সেই কখন দুপুরে খেয়ে বেরিয়েছি, তারপর আর খাওয়া জোটেনি। আমি একটা প্লেট তুলে

নিয়ে বটুকে বললাম, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আজকে আর ঘরে গিয়ে খেতে হবে না।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসলেন, এগুলো খেয়ে নিন, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মজা পাবেন না।

আমরা যখন খাওয়া শুরু করেছি তখন চায়ের কাপ হাতে ঘরে এলেন সীতার মা। ভদ্রমহিলাকে দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়ল। তার চাউনির সংযত আশিসবাণী আমার সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তে। দেখে বুঝলাম, ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকের উল্টো, উনি খুব কম কথা বলেন, আর যেটুকু বলেন তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর দুটো লুচি দিই বলে কথা শুরু করলেন ভদ্রমহিলা, থামলেন, আজ থেকে যান। কাল খুব ভোরে উঠে চলে যাবেন। সেদ্ধ ভাত রেঁধে দেব অফিস ধরতে কোন অসুবিধা হবে না।

ভদ্রলোকও সায় দিলেন, আরে থেকে যান না, কি আছে একটা রাতের তো মামলা। কোনও অসুবিধা হবে না, গরিবের ঘরে ডাল-ভাত যা হয় দুটো খেয়ে নেবেন। তাহলে সারারাত আপনাদের সঙ্গে গল্প করা যেত।

লোভনীয় প্রস্তাব, আমি বটুর দিকে তাকাতেই ও খুব অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। আমাকে শ্লেষের সঙ্গে বলল, মাখনদাদা, তুমি থাকলে থাক, আমাকে কিন্তু যেতেই হবে। দোকানে কেউ না থাকলে চুরি হয়ে যাবে। তুমি তো জান—কলোনির কি অবস্থা!

থাকার প্রশ্নটা আসছে কী করে তা আমার মাথায় ঢোকে না। 'ঘুরতে যাচ্ছি' বলে মেস থেকে বেরিয়ে না ফিরে গেলে পরিমল এবং আমার অন্যান্য বন্ধু দুশ্চিন্তায় থাকবে। আমার একটা মিল নষ্ট হবে। মিল নষ্ট হওয়ার জন্য আমি তেমনভাবে দুশ্চিন্তা করি না। আমার দুশ্চিন্তা অন্যখানে। সীতাকে দেখার পর বটুর চলে যাওয়ার আগ্রহটা বেশি মাত্রায় নজরে পড়ল। অথচ, এই সীতাকে সে সুখিয়া বলে ভুল করেছিল মাত্র এক ঘণ্টা আগে। মানুষের মতো মানুষ থাকে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে বাস্তবিক যার কোনও ব্যাখ্যা নেই। সুখিয়ার সঙ্গে সীতার যে মুখশ্রীগত এবং দৈহিক গঠনমূলক সাজুয্য তা বিস্ময়কর, না হলে বটু অমন আবেগমথিত হয়ে আমাকে বিব্রত করত না। বটুর দেখার এবং ভাবনার কোনও ভুল নেই। কৈশোরে সে যাকে ভালবেসেছিল দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে সেই আবেগমন্দ্রিত ভালবাসা পুরনো ঘিয়ের চেয়েও সুগন্ধময় হয়ে উঠেছে। এবং তা এই যৌবন বেলায় পরিণতির স্বপ্ন দেখছে—এটা জল-হাওয়ার মতো সত্যি। দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে বটুর গুমরে থাকা, হৃদয় অন্তর্গত হৃদয় আবেদন আজ শেষ বিকেলের ক্ষীণ আলোয় বাঁধ ভাঙা জলোচ্ছ্বাসের মতো ওর মনের জ্বালা যন্ত্রণাকে প্রশমিত করে দিয়েছে। এ এক পরিমল, ঐশ্বরিক স্নিগ্ধতা আমি তখন বটুর মুখে

উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখেছি। বটুকে কিঞ্চিত অসহ্য লাগলেও এটাই জাগতিক সত্য এবং নিয়ম বলে মেনে নিয়েছি। বটুর কল্পিত সুখিয়া যখন জলের ঘড়া নিয়ে ঘরের দিকে চলে গেল তখনও বিচ্ছেদ বেদনায় বটুকে আমি আপ্লুত এবং ভেঙে পড়তে দেখেছি। যদিও ওর স্বভাবটা চাপা, নিজের দুঃখকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে অক্ষম তবু আমি ওর চোখের কাতর দৃষ্টি আর পাংশু বিরহ অস্থির মুখ দেখে ওর দুঃখের গভীরতাকে অনুভব করেছি এবং সমব্যথী হয়েছি। ঘটনাচক্রে এবং সৌভাগ্যক্রমে বটুর সেই মানসী সুখিয়াকে আমি আবার আবিষ্কার করি দোকাদারের মেয়ে হিসাবে এবং এই আবিষ্কার ও প্রাপ্তিযোগে আমি মনে মনে সুখ অনুভব করি। আমার এই সুখানুভূতি বটুর মধ্যে আরও গাঢ়মাত্রায় খুঁজে পেতে চাই। কিন্তু বটু নির্বিকার, উদাসীন। তার বাউল-ফকিরের মতো দীঘল চোখ দুটোয় আমি আবেগ-উৎসাহের এককণা আলোও খুঁজে পাই না। সীতাকে সামনা সামনি দেখার পর থেকে, বটুর ওই কৃষ্ণ কালো চোখের মণি দুটোয় বাড়তি কোনও উচ্ছ্বাস নেই, ফিউজ হয়ে যাওয়া বাল্বের চেয়েও করুণ এবং মর্মান্তিক। সীতাকে দেখার পর বটুর মুখে যে সামান্যতম ক্ষীণ হাসিটুকু ভদ্রতার খাতিরে মানুষ ঠোঁটে লাগিয়ে রাখে তা-ও নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল। এমন বর্ণহীন, ধাতব কঠিন মুখে বটুকে আমি কোনদিন দেখিনি। এমন বিশ্রী সাদা হয়ে যাওয়া চোখে আমি বটুকে কোনদিন পাথরের চেয়েও নীরস এবং গম্ভীর হতে দেখিনি। খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে বটু যেন অন্য জগতে বিচরণ করছিল, অন্যমনস্কতায় ডুবে ছিল বটুর যাবতীয় চিন্তা এবং কল্পনা শক্তি। খাবারের দিকে দৃষ্টি থাকলেও সেই দৃষ্টিতে রসনা নিবৃত্তির কোনও চিহ্ন ছিল না। বটু যেন দূরে কোথাও নির্বাসন নিয়ে চলে গিয়েছে, শুধু তার দেহটুকু এখানে মনটা অন্যখানে-এমন এক অপার্থিব দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে অপলক।

আমি তাকে ঠেলা মেরে হুঁশ ফিরিয়ে দিই, বটু অ্যায় বটু, কি হল খাচ্ছ না যে! গভীর ঘুমে লিপ্ত মানুষকে সাহসা জাগ্রত করলে সে যেমন দিশেহারা, কমজোরি দৃষ্টি মেলে তাকায় তার চেয়েও অসহায় পরাস্ত চোখে ধড়ফরিয়ে বিপন্ন চোখে তাকাল বটু। আমি আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলাম, খেয়ে নাও, আমাদের যেতে হবে।

ভদ্রলোক বটুর মতো আমার মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন, আমার এই সিদ্ধান্ত তাকে হয়তো সামান্য আঘাত দিয়েছে, এমনটা ভাবা হয়তো অন্যায় নয়। সামান্যক্ষণ আলাপচারিতায় তিনি আমাদের আপন করে নিয়েছেন যা কেবল রক্তজ সম্পর্কের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়। এ পৃথিবীতে এমন মানুষ কত আছে তা আমার জানা নেই তবে এমন মানুষের সংখ্যা যে নিতান্তই কম এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ভাল মানুষের সাহচর্য যে

কোন মানুষ পেতে চায়, সাহচর্য বিমুখতা মানুষের একটা রোগ। বটুকে দেখলাম সেই রোগে ধরেছে। ওর কপট গম্ভীরতা, জোর করে দুশ্চিন্তায় ভরিয়ে তোলে মন, এবং অসহিষ্ণু কৃত্রিমতা আমাকে স্বতঃস্ফূর্ত এবং বেগবান হতে দেয় না। কোথায় যেন দুর্মর আড়ষ্টতা অনুভব করি। মনের অবদমিত ক্রোধকে ভদ্রতার মোড়কে ঢেকে এক সময় হাসি হাসি মুখ করে আমিও জোড়হাতে উঠে দাঁড়াই! আমাদের বিদায় পর্বের ইঙ্গিত পেয়ে পর্দার আড়াল থেকে রক্তিম হাস্যে, সঙ্কুচিত পায়ে এগিয়ে আসে সীতা। ওর চোখেও বিচ্ছেদের একটা তাৎক্ষণিক তরঙ্গ। কেমন অনুচ্চারিত গলায় শরাহত পাখির মতো ঠোঁট ফাঁক করে বলল, আবার আসবেন কিন্তু।

আমি ওর দিকে মনমরা চোখে তাকিয়ে ধীর সংযত স্বরে বললাম, হ্যাঁ, আবার আসব। তুমি ভাল থেকো, ভাল থাকার চেষ্টা কর।

সীতা দুঃখিনী চোখে হেসেই লজ্জাবতী পাতার মতো নামিয়ে নিল মুখ। বাইরে এসে দেখলাম, অন্ধকার আকাশে বর্ষার বেলিফুলের চেয়েও উজ্জ্বল কতকগুলো তারা চোখের মণির চেয়েও তীব্র দ্যুতিময়তায় হাসছে। উঁচু-উঁচু পাহাড়গুলোর চুড়ো নজরে পড়ে না আগের মতো, সব যেন সমতলে মিশে লীন হয়ে গেছে। এই অন্ধকার এবং সমধর্মীয়তা আমার ভাল লাগে। চোখ মেললেই সীতার ঢেউ খেলানো চুলের চেয়েও তীব্র ঘনঘোর আঁধার। উদ্ভিদেরা এই অন্ধকারকে মেনে নিয়ে নিজেদের লীন করে দিয়েছে এই অন্ধকারে। পথে এসে দেখি কখন যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সীতা। ওর খালি পা, সেই গোলাপী রঙের শাড়িটার আঁচল উড়ছিল হাওয়ায়। আমাদের বিদায় দেওয়ার জন্য ওরা সপরিবারে উঠোন ছেড়ে নেমে এসেছে রাস্তায়। কনকনে শীতে আমরা পাঁচটা প্রাণী একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে। তীব্র শীত অনুভব হয় না, পারস্পরিক সাহচর্য উষ্ণতা প্রদান করে যা কোন অংশে আগুনের উত্তাপের চেয়ে কম নয়।

কিছুটা আসার পর অন্ধকার দোকানঘরের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোকটি তার মেয়েকে উদ্দেশ করে বলেন, যা মা, ঘরে যা। আমরা একটু এনাদের ওই তেঁতুলগাছ অব্দি এগিয়ে দিয়ে আসি।

সীতা চলে গেল এক রকম দৌড়ে ঘরের দিকে। বাতাসে ওর হালকা প্রসাধনের গন্ধ, আমার মনে হল কামিনী গাছের ডালে হাওয়া লেগে টুপটুপিয়ে ঝরে পড়েছে সুগন্ধস্নাত ফুল। সীতার দৃষ্টি আকর্ষণকারী চেহারা নয়, ওর ব্যবহারটাই প্রথম থেকে ভাল লেগেছে আমার। সংযত, পরিশীলিত কথোপকথনে ও যেন অদ্বিতীয়া! ও চলে যাওয়ার পরে এক গভীর শূন্যতাবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে থাকে। আমি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাঁটতে থাকি সামনে। আমার ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়। বিয়োগ বিচ্ছেদ অস্থিরতায় কপালের দু-পাশ দপদপিয়ে ওঠে। আমার মনে

হয়, সীতা আমার আত্মীয়া, ওকে আমি অনেক দিন ধরে, অনেক জন্ম ধরে চিনি। ও আমার তৃষ্ণা নিবারণকারী নদী। সুগন্ধি ফুলের বাগান। যাবতীয় শুদ্ধ শব্দের অভিধান। মরা ডালে বসন্তের হাওয়া। সীতাকে আমি বনবাস দিতে পারি না। এই গ্রামের নীলাভ আকাশ রেল কলোনিতেও ছায়া দেয়। এই হাওয়া ছুঁয়ে আসে আমাদের। এখানকার উদ্ভিদের প্রলম্বিত শেকড় মৃত্তিকায় রস নিতে নিশ্চয়ই নিকট আত্মীয়তা গড়েছে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতি ঘন ইঞ্চি মাটির সঙ্গে। এই যোগাযোগ অমূলক বা কল্পনাপ্রসূত নয়। এই যোগাযোগ চিরকালীন, চিরস্থায়ী। কিসের টানে, কিসের আকর্ষণে, আমার বুকে আবেগের দামাল ঘোড়াটা বারবার পেরিয়ে যায় সীতা নামের স্রোতস্বিনী। আমি প্রগাঢ় অন্ধকারে অসংযত হয়ে বলে ফেলি, সীতা বড় মিষ্টি মেয়ে।

আমার কথা শুনে থমকে দাঁড়ায় ওরা তিনজন। হ্যারিকেনে নির্গত আলোয় ওরা আমার অন্তর্জরে কবলিত তৃষ্ণার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ। সব চাইতে অবাক হয় বুঝি বটু! সে বাক্যহীন চোখে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়। আমার মুখে সীতার প্রশংসা হয়তো ওর মনঃপূত নয়। তবু যখন আমি বলেই ফেলেছি এখন নিজেকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু বৃথা আমার সেই চেষ্টা। হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার নিক্ষিপ্ত হলে তাকে তো সাত সাধনায় ফিরিয়ে আনা যায় না।

আমার ভাগ্য খুব সুপ্রসন্ন তাই ভদ্রলোক অমায়িক হেসে সন্তান গর্বে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, নিজের মেয়ে বলে নয়— আমাদের সীতা খুব ভাল মেয়ে। ভদ্রমহিলা সায় দিলেন স্বামীর কথায়, ইতস্তত স্বরে বললেন, মেয়েটার জন্য খুব চিন্তায় আছি দেখলেনই তো ওকে, কতই বা বয়স—এই সবে সতেরো ছাড়িয়ে আঠারোয় পড়ল। অথচ, ওর এমন শরীরের বাড়—বলতে নেই ওকে নিয়ে আমাদের এখন সমস্যা। এই গ্রামে আমরাই কেবল এক ঘর বাঙালি। ওকে যে কোথায় পাত্রস্থ করব—এই দুর্ভাবনায় আমাদের ঘুম হয় না।

আমি ঢোক গিলে ওদের চিন্তাহীন করার জন্য বলি, মেয়ে আপনাদের সুন্দরী। ওর বিয়ের জন্য আপনাদের বিশেষ ভাবতে হবে না।—ভদ্রলোকের গলায় আফশোষ আমরা হলাম ছিন্নমূল মানুষ। ভিটে ছাড়া হয়ে এই বিহার অঞ্চলে পালিয়ে এসেছি। এতদিন হল তবু কোনও জানা-শোনা হয়নি। যে দু-একটা সম্বন্ধের খোঁজ পেয়েছি তাদের খাই অনেক। আপনি তো নিজের চোখে দেখেছেন আমার অবস্থা। ওই ভূষিমালের দোকানটাই ভরসা। জমি-জমাও নেই যে বিক্রি করে মেয়েটাকে পার করব। তাই বড় চিন্তা হয়, মাঝে-মাঝে ভাবি মেয়েটা আমার আইবুড়ো না থেকে যায়। আজকাল তো টাকা-পয়সা না থাকলে কোনও কিছুই হয় না, আর এতো

বিয়ে বলে কথা।

আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকি। ভদ্রমহিলা আমার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে সবিনয়ে বলেন, দেখুন না একটু চেষ্টা করে মেয়েটার যদি একটা গতি করে দিতে পারেন। আপনি তো সরকারি অফিসে চাকরি করেন, কত লোকের সঙ্গে জানা-শোনা একটু মনে রাখবেন আমাদের কথাটা।—ভদ্রমহিলার অনুরোধ আমার কানে কাতরানির মতো শোনাল। সত্যিই, বিদেশ-বিভুঁইয়ে এ এক বিরাট সমস্যা। আমি কি পারব এদের এই সমস্যা সমাধানে নিজেকে নিয়োজিত করতে? সংশয়ে দুলে উঠল মনটা। নিজের খামখেয়ালি আর অন্যমনস্কতার কথা ভাল মতন ওয়াকিবহাল। তাই কথা দিতে গলাটা সামান্য কাঁপল।

ভদ্রমহিলা হয়তো মনস্তত্ত্ব বোঝেন, তাই আমাকে বললেন তাড়াহুড়োর কিছু নেই, শুধু মনে রাখবেন, খোঁজ-খবর পেলে একটু জানাবেন। ও তো প্রায় মাল আনতে আপনাদের রেল কলোনির বাজারে যায়। আসা-যাওয়ার পথে একটু খোঁজ আনবে।

ওরা যে সীতাকে নিয়ে কতটা চিন্তায় রয়েছে তা ওদের কথাবার্তা শুনতেই সঠিক অনুমান করা যায়। আমি ভদ্রমহিলাকে বললাম, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, ভাল পাত্রের সন্ধান পেলে আমি নিজে এসেই সংবাদ দিয়ে যাব। আপনারা এত ভাল, আপনাদের কোনও উপকারে লাগতে পারলে নিজেরও ভাল লাগবে।

রাতের অন্ধকারে তেঁতুলগাছ, অশ্বত্থগাছ সব যেন মিলে-মিশে একাকার। তবু, পাতার শিহরণময় ধ্বনিতে বোঝা যায় আমরা তেঁতুলতলায় এসে দাঁড়িয়েছি। ভদ্রলোক তার টর্চলাইটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, অন্ধকারে যাবেন, সঙ্গে এটা রাখুন। আমি তো প্রায়ই যাই গোলবাজারে। আসার সময় নিয়ে আসব।

অন্ধকার পথ বিপদ-আপদের আখড়া। আমি বাধ্য হাতে টর্চ লাইটটা নিয়ে নিলাম। ভদ্রলোক অভিভাবকসুলভ সাবধানতায় বললেন, সাবধানে যাবেন। আর সময় পেলে বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসবেন। আমাদের এখানে কোনও আত্মীয় নেই। আপনারা এলে খুশি হব।

বটুকে সামনে বসিয়ে আমি সাইকেলের হ্যান্ডেল দু-হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলাম। বটুর হাতে টর্চ। আলো পড়েছে কাঁচা পথে। মনে হচ্ছে, আলো যেন খাবলা দিয়ে আত্মসাৎ করছে যাবতীয় আঁধার। কিছুটা এসে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি তখনও দাঁড়িয়ে আছেন ওরা দু-জন। আমাদের ফেলে যাওয়া আলোর দিকে ওদের চোখ। আমি জোরে-জোরে প্যাডেল ঘুরিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে এলাম, কিন্তু মনটাকে রেখে এলাম ওদের কাছে।



বার

ঢোল কলমী গাছ বেড়া দিতে লাগে, এ ছাড়া মানুষের কোনও কাজে লাগে না। বটু বলে, ঢোল কলমী হল রাক্ষুসী গাছ, সার খেয়ে নেয় মাটির। এমন স্বার্থপর গাছ উপড়ে ফেলাই ভাল! বটুর চা দোকান লাগোয়া প্রায় দু-মানুষ উঁচু ঝাকড়া মাথার একটা খেজুর গাছ। তার পাতাগুলো মানুষের রাগী আঙুলের মতো ছড়ানো, হাওয়ার স্পর্শ পেলেই অদ্ভুত শব্দ করে কাঁপে। রাত-বেরাতে এই শব্দ প্রগাঢ় শব্দময়তায় ভরিয়ে তোলে চারপাশ। ঝিঁঝিঁ পোকা লুকোচুরি খেলে কাঁটা পাতার ভেতর। কতদিন একলা বাইরে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে পাতার কাঁপুনি শুনেছে সে। আর ওই লম্বা পাতায় ঠাসা গাছটাকে মনে হয়েছে দৈত্য যে বটুর পাশে রয়েছে সর্বদা। কতবার চেষ্টা করেও গাছটাকে মারতে পারেনি বটু। গরম জলের হাঁড়ি উপড়ে দিয়েছে গাছটার গোড়ায়, তবু একটু ঝিমোয়নি গাছটা, একেবারে আগের মতো বাড়-বাড়ন্ত দশা। আজ দোকান ফাঁকা, খদ্দেরের ভিড়ও নেই—বটু তাই দা হাতে সামনে দাঁড়িয়েছে গাছটার। শুকনো ডালগুলো কেটে দিলে গাছটা ঝরঝরে হয়, আর ডালপালাগুলো জ্বালানীর কাজে লাগে। হাসান মাস্টার বলেছিল, গাছটাকে সাফ-সুতরো রাখবি বটু। এর শুকনো কাঁটা পায়ে ঢুকলে মানুষ আর বাঁচবে না। মাস্টারের কথায় নয় বটু মনে করেছে ওই কাঁটা গাছটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। কোনওদিন ঝড়ে উলটে খাপরার চালে পড়লে বিপদ ঘটে যাবে অনায়াসে। তখন ঘরও যাবে, গাছও যাবে। ভয়টা অনেকদিন তার মনের ভেতর জায়গা করে নিয়েছিল, আজ তা মরিয়া হতেই বটু আর সময় ব্যয় না করে এক রকম জেদের বশে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। তার ইচ্ছে আছে গাছটা কেটে ঘরটাকে একটু বাড়িয়ে নেবে। শুধু চা দোকানের ভরসায় থাকলে জীবনে আর উন্নতি হবে না। রেল কলোনিতে লোক আসছে জোয়ারের বেগে। ডবল লাইনের কাজ চলছে পুরোদমে। নতুন নতুন কোয়ার্টার গজিয়ে উঠছে রাতারাতি। ঠিকেদার,

দালাল, ধান্দাবাজ আর ফড়ে মানুষের ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। সবাই বলছে আর ক-বছর পরে নাকি পুরো ভোল পাল্টে যাবে কলোনির। এই সুযোগে যে যেমন পারছে রেলের কাছ থেকে জায়গা হাতিয়ে ঘর-বাড়ি দোকান তুলছে হামেশা। বটুর অনেক দিনের ইচ্ছে চা দোকানের পাশে মনোহারি আর মুদিখানার দোকান খোলার। নগদ যা টাকা আছে পোস্টাপিসে তা নেহাৎ কম নয়, বুঝে শুনে কাজে লাগাতে পারলে বেশ ভদ্র গোছের একটা দোকান করা যায়। এ অঞ্চলে মনিহারি-ভূষিমালের দোকান নেই। রেলের লোকেদের সামান্য কিছু কিনতে হলে যেতে হবে সাইকেল ঠেঙ্গিয়ে বড়-বাজার অথবা গোল-বাজার। তা প্রায় মাইলখানেক পথ। হাতের কাছে কেউ যদি ন্যায্যমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পেয়ে যায় তাহলে কেন আর কষ্ট করে গোল বাজারে যাবে? বটুর এই ভাবনা অনেক দিনের। ব্যবসা তার রক্তে। তা ছাড়া, পরিশ্রমকে সে ভয় পায় না।

খেজুর গাছের ডালগুলো কেটে সাফ-সুতরো করতে গেলেই অসাবধানবশত হাতে কাঁটা ঢুকে যায় বটুর। যন্ত্রণায় বেঁকে গিয়ে অস্থির চোখে তাকায়। হলুদ রঙের কাঁটাটা বুড়ো আঙ্গুলের নখের কোণ ঘেঁষে ঢুকে গিয়েছে মাংসে। কাঁটাটা নখের চিমটায় টেনে বার করতে গেলেই রক্ত বেরিয়ে আসে দরদরিয়ে। বটু বসে পড়ে ঘাসে। কাঁটাটা বের করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয় সে।

হাসান মাস্টার যাচ্ছিল বস্তির দিকে, তার হাতে ওষুধের ব্যাগ। বটুকে অমন মন মরা বসে থাকতে দেখে শুধোল, কী হয়েছে রে বটু?

বটু কষ্ট-কষ্ট মুখ করে বলল, খেজুরের কাঁটা ঢুকেছে, আর বেরুচ্ছে না। মাস্টারসাব আপনি একবার আসুন না।

হাসান মাস্টার ব্যাগ হাতে চিন্তিত মুখে বটুর সামনে এসে দাঁড়ালেন, ঝুঁকে পড়ে বললেন, কাঁটাটা ঢুকল কী করে?

বটু নিরুত্তর মুখে তাকিয়ে থাকল। হাসান মাস্টার উপদেশ দেওয়ার মতো বললেন, সব কাজ সবার দ্বারা হয় না। তুমি চা বানাতে অভ্যস্ত, আমাকে যদি বল তোমার মতো চা বানাতে আমি কী তা পারব? মোটেও নয়। তাই কাল একটা মজুর ঠিক করে খেজুর গাছটা সাফ করে ফেল। ঘর লাগোয়া খেজুর গাছ ভাল নয়। সাপ-খোপ, ঝরা কাঁটার উৎপাত আছে।

কাঁটাটা বের করতে হিমসিম খেয়ে যান হাসান মাস্টার, তারপর ব্যথা কমানোর এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথি দাওয়াই দিয়ে বলেন, থাক, কাঁটা যখন বেরিয়ে গেছে তখন আর চিন্তার কোনও কারণ নেই। রাতে হয়তো শুলোতে পারে, আমি পুরিয়া বানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি তিনঘণ্টা পর পর খেয়ে নিস।

ওষুধ বানিয়ে হাসান মাস্টার চলে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হতেই বটু কাঁচুমাচু মুখে বলল, যাওয়ার আগে এক কাপ চা খেয়ে যান। আপনি তো আর এখানে আসার সময় পান না। বটুর কণ্ঠস্বরে ন্যায়সংগত অভিমান।

হাসান মাস্টার গলা ছেড়ে হাসতে গিয়েও চুপ করে যান। বটু বলে, আমার যদি কোনও দোষ হয় ক্ষমা করে দেবেন। আপনি না আসলে আমার দিন ভাল যায় না।

হাসান মাস্টার ঘাড় নেড়ে কী যেন বলতে চান। বটু ততক্ষণে চা বানিয়ে মাস্টারের সামনে ধরেছে। চায়ে চুমুক লাগিয়ে হাসান মাস্টার বলেন, তোর কাছে আসার মতো আমার আর মুখ নেই। পুরো রেল কলোনি জালালের ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করে। সেদিন আর পি এফের ও সি সামন্তবাবু বাজারে দেখা হতেই অনেক অপমানজনক কথা শোনালেন। জালাল নাকি রাতের বেলায় রেল স্লিপার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। শুধু আমার মুখ চেয়ে ওরা দু-চার ঘা চড়-চাপড় মেরে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কতদিন আর এ ভাবে চলবে! জালালের দিন ঘনিয়ে এসেছে, ও এবার মরবে।

হাসান মাস্টারের কথায় অসহায় ভাব ফুটে উঠল, বটু ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল। জালাল এখন বর্ষার বুনো নদী, তার মাতাল যাতায়াত সবাইকে ভাবনায় ফেলে দেয়। এই তো কিছুদিন আগে সে অ্যাকাউন্টেন্ট-বাবুর কলেজে পড়া মেয়েটার বুকে কমলালেবু ছুঁড়ে মেরেছিল, মেয়েটি লজ্জায় হই-চই করতে পারেনি, বাড়ি ফিরে ঠোঁট ফুলিয়ে বুক ভাসিয়ে কেঁদেছে। জালাল জোর করে প্রেমপত্র গুঁজে দিয়ে তার হাতে, শর্ত আরোপ করে বলেছে, আমাকে যদি ভালবাসা না দাও তাহলে তোমার ওই সুন্দর মুখ আমি অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেব। এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় রেল কলোনি উত্তাল। বটুর চা-দোকানটা রেডিও সেন্টার, নানা লোকের মুখে যে জালালের কত অপনিন্দা আর বদনাম শুনেছে।

হাসান মাস্টার দেবতার মতো মানুষ, জালাল তার একমাত্র ছেলে হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত। অ্যাকাউন্টেন্টবাবুর মেয়েটির হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে এসেছে হাসান মাস্টার। মেয়েটি মাস্টার মশাই-এর মুখের দিকে তাকিয়ে সহস্র অভিমান অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কটু কথা বলতে পারেনি।

জালালের দুষ্কৃতী, দুর্ব্যবহার সবই কানে আসে বটুর। কিন্তু সে কোনও উচ্চ-বাচ্য করে না। সে ভাল মতোই জানে, থুতু উপর দিকে ছুঁড়লে তা নিজের মুখে পড়ে।

সেদিন মোরগ লড়াইয়ের মাঠে জালালকে কমিটির লোকে বেধড়ক পেটাল। সংবাদ পেয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে সাহায্যের জন্য ছুটে

গিয়েছিল বটু। অথচ, জালাল তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিল বটুকে। বটুও মুখ নিচু করে ফিরে এল। অথচ সেই রাতে জালাল যখন খোঁড়াতে-খোঁড়াতে তার কাছে এসে মদ খাওয়ার পয়সা চাইল, বটু সব দেখে-শুনে জালালকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। জালালকে ঘরে ডেকে লাল ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে বেদনায়। দশটা টাকা হাতে দিয়ে বলেছে, এই টাকা দিয়ে ফল-মূল কিনে খেও। এই রাত-বেরাতে এখন আর হাড়িয়া খেতে যেও না। আজকাল হাড়িয়ায় ইউরিয়া মেশায় আদিবাসীরা।

জালাল টাকাটা নিয়ে সুযোগসন্ধানী বন বেড়ালের মতো পালিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারে তাকে আর দেখতে পায়নি বটু।

হাসান মাস্টার ওঠার জন্য ছটফট করছিলেন বটু তাকে আর বাধা দিল না। কাজের মানুষকে আটকে রাখা ঠিক নয়। তার উপরে বেলা চড়ছে। শিমুল গাছটার মাথার উপর উঠে এসেছে সূর্য, তার আলোয় চারদিক বড় উৎসব মুখর। ইদানীং শীতটা কম, পালাই-পালাই করেও শীত বুড়ি যেন এক ছুটে পালিয়ে যেতে পারছে না। সকাল বেলায় ঘাসের মুখগুলো শিশিরে ভিজে মুখিয়ে থাকে অবিকল বর্ষাকালের মতো। একটু রোদ চড়লে ঘাসগুলো আবার নেতিয়ে যায়, ফ্যাকাসে-বিবর্ণ দেখায়। বটু এখন আর গায়ে কম্বল জড়ায় না, ভোর রাতের দিকে কম্বলটা শুধু বুকের কাছ অবধি টেনে নেয়। ফাঁকা ঘরে একা শুলে শীতটা একটু বেশি লাগে তার। ভগবানের দয়ায় এখন তার সব আছে শুধু একজন মনের মানুষের অভাব। এই অভাব তার আর কোনও দিন বুঝি ঘুচবে না। অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকায়ে যায়। তার মতো অভাগা, হতভাগা কে আছে এই রেল কলোনিতে। বাবু ঘরের মেয়েগুলো যখন সেজে-গুজে স্কুলে যায় তখন চোরা চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে বটু। বুকের ভেতরে তেঁতুল পাতার কাঁপুনি। একদিন তার অর্থ ছিল না, এখন তার অর্থ হয়েছে। অনেকেই তার কাছে এখন সুদে টাকা ধার নেয়। কলোনিতে কাবুলিওলার কাছে চড়া সুদ। তারা মোটর বাইকে চড়ে ঘরে-ঘরে টাকা ধার দিয়ে আসে। বটু কোথাও যায় না, অনেকেই তার কাছে আসে—নিতান্তই স্বল্প সুদে টাকা ধার দেয় বলেই। ভগবান দিন দিলে ছাই মুঠালেও সোনা হয়। বটুর এখন সুদিন। তার ভাঙা-চোরা ঘরে নতুন দেওয়াল উঠেছে। চুন, শিরিষ আঠা কিনে রং করিয়েছে মিস্ত্রি দিয়ে। ঘরের ফাটা ফুটো দেওয়াল এখন একেবারে নতুন। আসা-যাওয়ার পথে লোকে চোখ টেরিয়ে দেখে, সবাই তাকে উৎসাহিত করে, বাহবা দেয়। কেউ আবার রগড় করে বলে, বটু, তোমার তো সব হল—এবার একটা ধুমধাম সহকারে বিয়ে করো। আমরা ভোজ খাই।

লোকের কথায় বটুর হাসি পায়। সেই হাসির সঙ্গে মিশে থাকে তরল, অভিনব, হৃদয়বিদারক দুঃখ। অতর্কিত আর্তনাদের মতো বুক উজাড় করে ঠেলে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। চরম দুঃখবহ জীবন যাপনে সে উন্মনা হয়ে যায়। কথা বলার সামান্য শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। এই আত্মীয়হীন জীবন তখন তার কাছে পরগাছার মতো মনে হয়। নিজের দুর্ভাগ্যকে সে তখন অভিসম্পাৎ করে। কার পাপে তার এই অভিশপ্ত জীবন—এই জটিল হিসাব যে কিছুতেই মেলাতে পারে না। তখন শুধু কপালের দু'পাশটা টনটন করে, মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে চায়, সারা মুখে ফুটে ওঠে বিবর্ণতার ধূসর ছবি। বটু মনে মনে হেরে যায়। সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতের কথা মনে পড়ে, যে রাতে সে তার স্বৈরিনী মাকে খুন করে অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রায় পাড়ি দিয়েছিল। মায়ের রক্তাক্ত, বেদনা সমাহিত মুখটা সে একদিনের জন্য বিস্মৃত হতে পারেনি। এই হাত দুটোয় মায়ের রক্ত মিশে আছে। সাত সহস্র লেলিহান অনুশোচনার আগুনে পুড়লেও তার যেন নিষ্কৃতি নেই। মাতৃহন্তা বটু তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। রাত্রি ছাড়া তার কান্না কেউ শুনতে পায় না। চোখের কোণাগুলো লাল হয়ে উঠলে ক্লান্তিতে ঘুম এসে যায় বটুর, তবু ঘুমের মধ্যে সে তার মায়ের স্বপ্ন দেখে। জন্মভূমির অকৃত্রিম টানে সে আবার দিশেহারা হয়ে ঘর্মাক্ত শরীরে উঠে বসে বিছানায়। কোনও কোনও রাত তার বিনিদ্র চোখের সামনে কাক-পক্ষীর সরব কাকলিতে ভোর এনে দেয়, বটু আবার আঁচ ধরিয়ে চায়ের জল বসিয়ে দেয় হাঁড়িতে। এই ধারাবাহিক জীবনে এখন তার অনীহা, বৈচিত্র্যের আস্বাদনে তার মন আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। কখনও সুখিয়া তার চোখের তারার মাঝে পুকুরের মাছের মতো ঝিলিক দিয়ে হারিয়ে যায়। ওই একটা মুখ যা তার রক্তকে এখনও নিস্তেজ করে দেয়, পরাজয়ের গ্লানি ফুটিয়ে দেয় সারা মুখে। সুখিয়াকে সে ভুলতে চায়, অথচ সে ভুলতে পারে না। কেবলই দীর্ঘস্থায়ী দুঃস্বপ্নের মতো সুখিয়া তার চারপাশে বিরাজ করে। বটু কিছুতেই ওই অধোমুখের নৈঃশব্দ্যময় আবেদনকে নস্যাৎ করতে পারে না। প্রিয় গানের কলির মতো সুখিয়া বার বার তার কাছে ফিরে আসে, স্মৃতিতে ঘাম-গন্ধ মিশিয়ে আবার বেসুরো বেহালার মতো কেঁদে-ককিয়ে নির্বাসন নেয়। এ এক মহারোগ। এ রোগের যেন মুক্তি নেই।

হাসান মাস্টার চলে যাবার পর বটু আবার একা হয়ে যায়। প্রাত্যহিক কাজকর্মে ডুবে থাকলেও তার ধারাবাহিক চিন্তায় কোনও ছেদ ঘটে না। চিন্তারা অক্টোপাশের মতো ঘিরে ধরে থাকে। এই ভাবেই দুপুরের প্রখরতা বেড়ে ওঠে। সামনের বাঁধানো কুয়োটায় স্নানরত মেয়েদের ভিড় বাড়ে। হাসি, কথা-বার্তার ঠুনকো শব্দে ভরে থাকে বাতাস। ঠিকেদারের ট্রাক এসে

থামে বটুর চায়ের দোকানের সামনে। পাঁউরুটি আর আলুর দম খেয়ে আদিবাসী কামিনগুলো পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে রোদ মাথায় যে যার কাজে চলে যায়। ধীরে-ধীরে পাতলা হয়ে আসে কুয়োতলা। দু-একটা কাক-শালিক তখন ঘিরে থাকে কুয়োর বাঁধানো পাড়। বটু চা-দোকানের ছোট টুলটায় বসে বিবশ কাছিমের মতো ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে থাকে। নিভু আঁচে এক পোয়া চাল-ডাল ফুটিয়ে নিলেই খাওয়ার ঝামেলাটা মিটে যায়। এই সময় যদি সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে পিওন আসে তাহলে খুশিতে পুনরায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার মুখ। কলকাতা থেকে আসার পর এই এক নতুন নেশা তার মধ্যে শিকড় পুঁতেছে। চন্দনা তাকে নিয়মিত চিঠি লিখে কুশল জানায়। প্রত্যুত্তরে বটুও তার ভাল থাকার কথা জানিয়ে দেয়। এখন চিঠি না আসলে কেমন খারাপ লাগে বটুর। কাজে-কর্মে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে সে। চন্দনার চিঠি তার কাছে মানসিক শক্তিবর্ধক টনিক। অথচ, ওই দুঃখী মেয়েটাকে সে কখনও নিজের বলে ভাবতে পারে না। চন্দনার কথা ভাবতে গেলেই সুখিয়ার কথা ছিন্নভিন্ন করে দেয় বটুর সাজানো জীবন। এলোমেলো হাওয়া বওয়ার মতো সে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। টাগরা শুকিয়ে চোখের কোণাটা আবার স্যাঁতসেতে হয়ে যায়। এ কেমন রোগ, বটু তার কোনও হিসাব-নিকাশ জানে না! সে অসহায়, অতৃপ্ত, আহত মন নিয়ে কুয়োটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আজ পিওনটা তার চা-দোকানের সামনে থামে না, সাইকেল নিয়ে সোজা চলে যায় করাত কলের দিকে। আজও চন্দনার চিঠি এল না। কতদিন চন্দনার চিঠি আসেনি—সেই হিসাব মনে মনে ছকতে বসে বটু। বেশিদিন নয়—মাত্র দশদিন। তবে ধীরে ধীরে চন্দনাও কি চেষ্টা করছে তাকে ভুলে যাওয়ার!

দুপুরে খেতে বসেছিল বটু, এমন সময় রং পাহাড়ের গা থেকে এলেন মুদি দোকানী অভয়বাবু। ছাতাটা মুড়ে তিনি বটুকে দেখে সহাস্যে বললেন, দোকানের মাল কিনতে এসেছিলাম, ফেরার পথে ভাবলাম—যাই একবার দেখা করে আসি। তাই, ঘুরতে-ঘুরতে চলে এলাম। তা, আপনাদের খবর সব ভাল তো!

বটু ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে বলল, ভাল। তবে, খেজুর গাছের ডাল কাটতে গিয়ে বুড়ো আঙ্গুলে একটা কাঁটা ঢুকেছিল। মাস্টারসাব কাঁটাটা বের করে দেওয়াতে এখন একটু আরামবোধ করছি।—এঁটো হাতে উঠে এসে বটু টুল দিল বসার জন্য। অভয়বাবু বসলেন, চারভাঁজ করা খবরের কাগজে হাওয়া খেতে খেতে শুধোলেন, তা মাখনবাবুর খবর কি, উনি তো আর কোনও খোঁজ-খবর দিলেন না?

বটু চুপ করে থাকল। সীতার বিয়ের ব্যাপারে সে কোনও রকম চেষ্টাই করেনি অথচ এই ব্যস্ত মানুষটি এই নিয়ে তিনবার আসলেন। রেল কলোনি থেকে রং পাহাড়ের গ্রামখানা সাইকেলেই একঘণ্টা লেগে যায়। অথচ, ব্যস্ত মানুষটি কত আশা নিয়ে এখানে ছুটে আসেন। তাঁর এই ছুটে আসা বটুর কাছে এখন অর্থহীন পণ্ডশ্রম মনে হয়। অভয়বাবু তোয়ালে রুমালে মুখ মুছে দম নিয়ে বললেন, আমরা খুব আশায় আছি—জানি না ভগবান কী করবেন। আসলে এ সবই তো যোগাযোগের ব্যাপার। প্রজাপতি নির্বন্ধ—সময় না হলে হাজার চেষ্টা করলেও হয় না।

ঘণ্টা দুয়েক অনর্গল কথা বলে রোদ পড়তেই অভয়বাবু চলে গেলেন। উনি চলে যাওয়ার পর বটুর নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল। তার মনে হল, সে যেন কাউকে ঠকাচ্ছে। যে মানুষটা এত আশা নিয়ে ছুটে আসে তাকে কেন বটু মুখের উপর না বলে দিতে পারে না। সে যদি চেষ্টা করত তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি থাকত। বাস্তবিক সীতার জন্য সে কোনও দিন কাউকে কোনও কথা বলেনি। বলেনি ইচ্ছে করেই। সীতা যে সুখিয়া নয়, এটা সে জেনেছে। আর জেনেছে বলেই তার এত দিনের ক্ষোভটা তাকে শ্বাস নিতে দেয় না। এ এক অসহ্য জ্বালা। সামনে ফুলের বাগান অথচ তাকে নয়ন ভরে দেখার ক্ষমতা নেই তার। বুক ফেটে যাবে অথচ বুকের জ্বালা মুখ ফুটে কাউকে বলা যাবে না। সীতা যদি সুখিয়া হত তবু এই সু-উচ্চ পাঁচিলকে ভাঙত কী করে? আর ভেঙ্গে ফেললে কি সমস্যার সমাধান হয়ে যেত?

বটু আক্রোশে অসহিষ্ণুতায় ঠোঁট কামড়ে দূরের দিকে তাকাল। অভয়বাবুর যাওয়ার পথটা ধু-ধু শূন্য। একটুও ছায়া নেই, বৃক্ষ জগত নেড়া-নেড়া। বটু চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাবল, সীতা যদি সুখিয়া হয়—তাহলে দোষ কোথায়?



ভের

মুরগার নাম ফিটপানিয়া। দারু-হাড়িয়ার দেশে ফিটপানিয়া মানে সাদার উপরে লাল ফুটিফুটি রঙের মোরগ। খুব মনযোগ সহকারে তাকে দানা খাওয়াচ্ছিল লাটু সিং। তখন সকাল। ফাঁকা ঘরে হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল কবাট। হা হয়ে খুলে যাচ্ছিল ঘরটা। আবার ফিরতা বাতাসে দড়াম শব্দ। হেলে যাচ্ছিল বিজাকাঠের কবাট। লাটু সিং ঠোঁট কামড়ে বাতাসকে মোক্ষম গাল দিল একটা। এ বছর তার শুধু হারার পালা। টাকা, মুরগা, মালতী সব গেল। রাতে ঘুম হয় না। মালতীর কাঠবাদাম পাতার চেয়েও চকচকে, ছিপছিপে মুখটা মনে পড়ে। দশ-বারো বছরের অভ্যাস। এই অল্পদিনে কি ঘোচে? মাঝে-মাঝে মালতী যেন তার সামনে এসে দাঁড়ায়, নারকেল কুচির চেয়েও সফেদ দাঁত বের করে হাসে। তার হাতে ডেকচি-হাঁড়ি। মেসবাড়ি থেকে ফেনভাত চেয়ে এনেছে সে। ভাগ করে খাবে চারজনে। করাতকলে মাইনে কম। যা কামায় সব হাব্বা-ডাব্বা, তিনতাস নয়তো মুরগার পায়ে চাকু বাঁধতে চলে যায়। নেশাটা বেয়াড়া তাকে শাসন করে। ফি-বুধবার-রোববার তাকে কানধরে হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে যায় লাউডিড়া টিবি নয়তো পটকা, বড়বাম্বু, রাজকারণন। যাওয়ার মন না থাকলে ইয়ারদোস্তের অভাব নেই। তারা এসে সুড়সুড়ি দেয়। বাটি খানিক হাড়িয়া খাইয়ে বলে, চল না বে, মরদ কা বাত, হাতি কা দাঁত। এইভাবে হেরে যাবি শালা? জুয়া কোন বেটায় খেলেনি? ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির জুয়ায় বউ বাজি রেখে হেরে গেল! তারা দোষ করলে লীলা, আমরা দোষ করলে বিলা। ছ্যাঃ, ওটা একটা কথা নাকি। মন যা চায় মানুষের তা করা দরকার। যার পেটে ভুখ মুখে লাজ তার দুঃখ চিরকাল। কথায় জাদু থাকলে মন গলে যায় কদমার মতো। অথচ কোন যাদুতে মালতী তাকে ভুলল? শুধু ভোলা নয়, সম্পর্ককে জবাই দিল। মেয়েমানুষের মন, বাবলা কাঁটার বন। সব জেনেও সুখ চেয়েছিল লাটু। সুখ পেল না, পেল অনন্ত ফক্কা। খুন গরম করা ধোকা।

ফিটপানিয়া দানা খায় লাটু আপন মনে হাসে। বদলা নিতে হবে, বদলা। রাগটা চলকে ওঠে রক্তে। মালতীর মুখটা আঁকা হয়ে যায় হৃদয়ে। সামনে যেন মালতী দাঁড়িয়ে। দে-গালি, দে-গালি। মুষলধারে বৃষ্টিপাতের মতো চড়বড় করে নড়ে লাটুর ঠোঁট, গাল দেয় বউটাকে।

রামনবমীর মেলা বসেছিল রেললাইনের ধারে। রবার্ট বলল, যাবা ভাবী, চলো গো ঘুরে আসবা। যাওয়া-আসা ফিরি, আমার তো রিকসো আচে। ছেলে-মেয়ে গুলানকেও নিয়ে চলো। তাদের আমি পাঁপড় ভাজা, চপ, সিঙ্গাড়া খাওয়াবো। মালতী এক কথায় রাজি। লাটু সিং ঘোরাল মনের মানুষ, তিতকুড়ো ঢোক গিলে বলল, যেতে হয় যাও কিন্তুক সাঁঝ লাগার আগে ফিরে আসবা। তাতেই সই। মালতী তার আবলুশ কাঠ শরীরে পেঁচিয়ে নিয়েছিল ফুলতোলা শাড়িটা, হেঁসেল ঘরে গিয়ে ছোটজামা পড়ল সারা মুখে বুদিবুদি ঘাম জমিয়ে। গলায় মাখল পাউডার। শ্যামলা কপালে টিপ আঁকিল যত্নে। তারপর, প্লাস্টিকের চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে মহারানীর মতো রিকসায় সে গ্যাঁট হয়ে বসল। ছেলে-মেয়ে দুটো তার দু-পাশে। রবার্ট রিকসাটা চালায় ভাল, কিন্তু মেয়েদের যে খেলাতে ওস্তাদ এটা ঘুণাক্ষরে জানতে পারেনি লাটু সিং। জানল তিনদিন পরে চাঁইবাসা থেকে ফিরে এসে। তখন সবে রাত, অথচ ঘরে হ্যারিকেন বুঁজান। বিজা-কাঠের দরজায় গোল গোল আংটা। মাথার উপর শিকলি। শিকলিতে টিপ তালা, আংটায় ঝুলছে মেলায় কেনা ধোমা তালা। ছেলে-মেয়েগুলোরও পাত্তা নেই। ঘরে থাকলে পায়ের শব্দে, গায়ের চকো খাওয়ার জন্য মৌমাছির মতন জড়ো হত। আশ্চর্য, এই রাত করে সেয়ানা বউটা গেল কোথায়? মাথায় খুন চড়লেও সেই খুন পায়ে নামিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এল মেস অব্দি। রামধন ঠাকুর মালতীকে মেয়ের চোখে দেখলেও তার কু-নজর বউটার বুকের উপর। কতদিন যে ধরে ফেলেছে লাটু সিং! হেঁ হেঁ হেসে কথা বদলেছে ঠাকুর। চোখ-মুখ খচ্চরের মতন—যেন ঘাস-বিচুলি ছাড়া হারামিটা ফুল কোনদিন চিবিয়ে খায়নি। হাঁটিতে-হাঁটিতে রাগ হল, ভাবল দেবে আজকে চ্যালা দিয়ে মনের সুখে সাটিয়ে। পরক্ষণে সাঁড়া হল। ওই তো দুবঘাসের মতন রোগা-পেটকা গতর, মার খেয়ে সইবে কি করে? চোখ উল্টালে থানা-পুলিশ, শেষে কোমরে দড়ি পরিয়ে টানাটানি, জেল-হাজত। বউ যে মাঝে-মধ্যে ঘা খায় না, তা তো নয়। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরলেও আবার সুড়সুড় করে খাটিয়ায় এসে বসবে। পাঁচ নয়া দিয়ে ঘামাচি মেরে দেবে পিঠের, হাওয়া না থাকলে পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস করে দেবে—যেন বউ না তার মরা মা। মেস বাড়িতেও মালতী ছিল না, চতুর্দিক ফাঁকা। মাথায় হাত দিয়ে এক কাপ চায়ের প্রত্যাশায় বসেছিল লাটু সিং। আমাকে দেখে

শুকনো মুখে বলল, মালতীটা যে গেল কুথায়, তারে আমি খুঁজে পাচ্ছিনা।

কোথাও হয়তো গিয়েছে। কাজের মানুষ, সব সময় কি ঘরে থাকতে পারে?

ঠোঁট উল্টাল লাটু সিং, কাজ করে তো শুধু উল্টে যায়! কঞ্চির মতন গতর, ওই গতর দিয়ে কোনমতে বাসন-কোসন মাজে। হেভি কাজ কিছু হয় না।

তখনই রামধন এল স্টেশন থেকে, তার পেছন-পেছন হেঁটে আসছিল লাটু সিংয়ের দুই ছেলে-মেয়ে। কাঁদছিল তারা। অবোধ, কচি নিষ্পাপ মুখ। জলের দাগে সেই কচি মুখ কত ভয়ংকর। লাটু সিং ছুটে গিয়ে শুধাল, তোর মা কুথায়?

মা তো চল্লে গিয়েচে।

কুথায়?

জানিনা।

আবার অঝোর ধারায় কান্না, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, ফুলে-ফুলে, কেঁপে-কেঁপে।

রামধন ঠাকুরই খোলসা করে বলল, তুমি তারে খেতে-পরতে দিতেনি, শুধু মারধোর করতে। সে বেচারী রবার্টের সাথে ভাগলবা। আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম পাউরুটি কিনতে দেখি তোমার ছেলে-মেয়ে আদ্রা-গাড়ির দিকে তাকিয়ে মরা কান্না কাঁদচে। আমাকে দেখে বলল, জ্যাঠা গো, হা দিখো—মা চল্লে গেল ওই গাড়িতে, আমাদের নে গেল না। তারপর রিকসা স্ট্যাণ্ডে এসে খোঁজ নিলাম রবার্ট নেই। সে তার ঝুপড়ি আর খাপরার ঘরটা বিচে দিয়েচে মাত্র ন-শ টাকায়। সবাই বলচে—সে নাকি আর দারু হাড়িয়ার দেশে ফিরবে না!

চটাস চটাস কপাল চাপড়ে লাটু সিং দেহাতি যাত্রা দলের সখীগুলোর মতন কাঁদল। বাড়াবাড়ি দেখে আমি বললাম—চলো, থানায় যাই। লোকাল থানায় রবার্টের নামে একটা কেস ঠুকে দাও। পালাবে কোথায়? পৃথিবী গোল। ধরা ওদের একদিন পড়তেই হবে।

সেদিন ওই ঘেয়ো মাল আমি ঘরে তুলব? ইজ্জতে ঘা লাগতেই ফুঁসে উঠল লাটু সিং, হেঁপো রোগীর মতো দম নিয়ে বলল, ও শালীর মুখই দেখব না, আমার নাম লাটু সিং। মরদের বাচ্চা কখনও চুঁহার মতো বাঁচে না। ওরে আমি কি দিইনি? ছেলে-মেয়ে দিয়েছি, কান পাশা, নথ, পায়ের ঝুমঝুমি সব দিয়েচি। নিজে না খাইয়ে ওরে খাইয়েচি। ও শালী নেমক-হারাম। মন চিনল না, বেজম্মার হাত ধরে বেপথে চলে গেল!

সেই শোক এখন লাটু সিংয়ের বুকে চাগুড় বাঁধা ঘা। রস চুয়ায়।

কুঁকুটায়। শান্তি নেই, শুধু চিড়বিড়ানী। পাঁচিয়ে দেয় মনটাকে। ছেলে-মেয়ে দুটো বাঙালি টোলার ভাই বৌয়ের কাছে আছে। হপ্তা গেলে টাকা দিতে হয়, চাল-ডাল-সবজি বাজার করে দিতে হয়। ভাইয়েরও অভাবের সংসার, সে এতো পাবে কোথায়? একদিক দিয়ে ভাল হয়েছে, এখন দিব্যি ঝাড়া-হাত-পা। মালতীর মুখটা শুধু শোওয়ার সময় মনে পড়ে, ভোরবেলায় বাইরে গেলে মনে পড়ে। কলপাড়ে বাসন মাজত বউটা, গা ধুতো—কলে গেলে মনে পড়ে। মালতী চলে যাওয়ার পর এখন রামধন ঠাকুরও আসে না তার ঘরে। ছুত-নাতায় এড়িয়ে যায়। মেসে গেলে ভার মুখ করে বসে থাকে। মাথায় আঙুল বিঁধে দিয়ে বলে, কি করবে ভাই, সবই ভাগ্য! ভাগ্য মন্দ হলে কি না হয়! শুকনো ডাঙ্গায় হোঁচট খেয়েও জ্ঞান হারায়। মেয়েছেলে চিত্তটাই হল ওইরকম! একটু এদিক-ওদিক হলেই হাত ফসকে পাখি উড়ে গেল! তুমি শুধু শূন্যপানে চেয়ে থাকো? সুখ নেই গো ভাই? সুখ আচে লড়াই মাঠে, মদ ভাঁটিতে। জীবন যদি খুঁজতে হয় তাহলে ওখানে চলে যাও।

শ্রা. ঝিঁ ঝিঁ কানা!—লাটু সিং ফিটপানিয়াকে দানা খাওয়ায় আর রাগে দাঁতে-দাঁত ঘষে। কোথায় বিপদ থেকে টেনে তুলবে, না বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া? পারে বটে হাত-পা-ওয়ালা মানুষগুলো। এর চেয়ে বিষধর সাপ ঢের ভাল। তারা ছোবল মারে, বিষ ঢালে তার মধ্যে কোন ভণিতা নেই! এ ব্যাটার মধ্যে ভণিতার যেন শেষ নেই!

ফিটপানিয়ার রেশমী, তেল চুকচুকিয়া পালকে হাত বুলিয়ে আদর করে লাটু সিং। এই আদর করার মধ্যে এক ধরনের তৃপ্তি, যে সে নিজেকেই আদর করছে যতনে। মালতী যেদিন চলে গেল তার ক-দিন পরেই এই ফিটপানিয়া মুরগাটাকে বিনে পয়সায় পেয়ে গেল লাটু সিং। কাঠের খোঁজে সে গিয়েছিল গোয়ায়। ফিরছিল গোয়া প্যাসেঞ্জারে। রাজকারশনে গাড়িটা এসে খালি হয়ে গেল কামরা। লাটু ঘুমিয়ে পড়েছিল—ক্লান্তিতে। কিসের একটা হৈ-চৈ, ঘুম ভেঙে দেখে সিটের তলায় কক্-কক্ করছে বেচারী ফিটপানিয়া। ধারে কাছে কেউ নেই। মুরগাটার ডানা আর পা দুটো বাঁধা। উবু হয়ে মুরগাটা ঝোলায় ঢুকিয়ে দে চম্পট। তারপর মালগাড়ি ধরে সটান চক্রধরপুর। ঝোলার ভেতর ফিটপানিয়ার ডাকটা বড় তেজিয়াল। লড়াকু মুরগার ডাক শুনলেই বোঝা যায়। শেষ সিজিনে এই ফিটপানিয়াই আসর মাৎ করবে লাটু সিংয়ের বিশ্বাস। যে আদিবাসী বুড়োটা মাদুলি-তাবিজ দেয়, পুজোপাঠ করে, সরহুল পরবে পুরোহিত হয়—সে ফিট-পানিয়াকে দেখে দাম দিয়েছিল পঁচাত্তর টাকা। লাটু সিং তাকে দেয়নি। দিলে বদলা নেবে কি করে? মালতী সংসারের কাত্তি খেয়ে ডরপুক মুরগির

মতো ভেগেছে। রবার্ট'ও চোট খাওয়া মুরগা। তারও লড়ার ক্ষমতা নেই। লড়াই মাঠ থেকে যে ভেগে যায় তার সাথে কি লড়াই করা সাজে? লাটু সিং গোঁফে তা দিয়ে হাসল। হাসিটা অবজ্ঞার, তাচ্ছিল্যের। ঘেন্না মিশে আছে সেই হাসিতে!

ফিটপানিয়া মুরগাটাকে সে ভাত খেতে দেয় না। বনমালী বুড়া ভিখ মাঙতে এসে নিষেধ করে গিয়েছে তাকে। ভাত খেলে চর্বি জমবে গায়ে। চর্বি জমলে ভারি হবে গতর। উড়ে গিয়ে কাত্তি চালাতে পারবে না। বনমালী বুড়া সতর্ক করে বলেছিল, যত্ত পার মিরচা খাইতে দাও। মিরচা খাইলে তেজ বাড়বে কুঁকড়ার। লড়বে জান দিয়ে, উঁড়ি-উঁড়ি পালিইবে না।

তারই কথা মতো মুরগাটাকে রোজই ইতোয়ারি বজার থেকে মিরচা এনে খাওয়ায় লাটু সিং। নিজে খেতে না পেলেও মুরগার কোনও যত্নের ত্রুটি নেই। বস্তিতে ফিটপানিয়া মুরগাটাকে ঝুটমুট লড়িয়ে দিয়ে সুখ পায় লাটু সিং। ফিটপানিয়া ঘাড়ের পালক ফুলিয়ে ছুটে যায় আক্রোশে। ঝাঁপিয়ে পড়ে খামচে তুলে নেয় পালক। ঠুকরে মাংস ছিঁড়ে নেয় গায়ের। শুধু ঝটফটানির শব্দ। হিংস্র ক্রোধ আর উত্তেজনার শব্দ। হাততালি দিয়ে শরীরে রাগ জুড়ায় লাটু সিং। এ তার বিকৃত আনন্দ সুখ! লোক বলে,—বউ পালানোর পর মাথাটা গড়বড় হয়েছে লড়াকু মানুষটার। হবে না কেন? মালতীকে যে লাটু নিজের চেয়েও ভালবাসত। লোকের কথায় আরও জ্বালা বাড়ে। কেউ তাকে যখন সমবেদনা জানায়, হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে লাটু। বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়। কোনও কাজে সুখ পায় না। ফিটপানিয়া মুরগাটা যা পারে—সে কেন পারে না! এই না পারার যন্ত্রণাটাই আলাদা। মাথাটা কে যেন দুরমুস দিয়ে পেটায়। রগ ফুলে ওঠে। কঠিন হয়ে ওঠে চোখের দৃষ্টি। প্রেমহীনতায় ডুবে যায় বুকটা।

গত বুধবার লাউড়িয়া ঢিপিতে হাতাহাতি হয়ে গেল বাজি নিয়ে। লাটু দমেনি। আদিবাসী ছেলেটা চিৎ করে ফেলে দিয়েছিল শুকনো ডাঙায়। তারপর বুকের উপর চড়ে কিল-চড়-ঘুষি মারল। মার খেয়েও দমল না সে। হেরে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে ধারাল দাঁতগুলো দিয়ে সে কামড়ে দিল ছেলেটাকে। 'পাগল কুত্তা' বলে অতর্কিত আর্তনাদ করে ছেলেটা মাঠময় ছুটে বেড়াল। লাটু হা-হা করে হাসল। কমিটির লোক ধরে নিয়ে গেল তাকে। তখনও তার সুস্থ চোখ দুটো অবিকল পাগল মানুষের মতো। ঘোলাটে দৃষ্টি, অস্থির চাহুনি। মাঝে-মাঝেই চুল চেপে বিকট আওয়াজ করে ভ্যালভেলিয়ে তাকায়। নিজের চুল ছিঁড়ে নিজেই ফুঃ দিয়ে উড়িয়ে দেয়

বাতাসে। গায়ে চিমটি কেটে রক্ত বের করে পরখ করে তার রং। কপালের রগ দাবিয়ে সে কখনও খনখনিয়ে কেঁদে ওঠে। এসব তাৎক্ষণিক, কিছুটা জিরোন নিলে সে আবার ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে।

করাতকলের মালিক তার রকম-সকম দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, কাজে মন না লাগলে কাজ ছেড়ে দাও। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না।

কথাটা গায়ে চাম এটুলির মতো আটকে গেল। মালিককে দেখলেই তার ইচ্ছে করত কা-কা করে ডেকে উঠতে। কাক হয়ে উড়ে গিয়ে খোঁজ করতে মালতীর। মালতী কোথায় গেল, কোথায় আছে? যদি তার সাথে দেখা হয়ে যায় কোনও অসতর্ক মুহূর্তে তাহলে কি ভাবে সে বদলা নেবে—এই পরিকল্পনায় ডুবে আছে তার মাথাটা। ঘুম ভেঙে গেলেও সেই একই চিন্তা রক্তের ভিতর হুটোপুটি করে।

ফিটপানিয়া মুরগাটাকে সে লড়াতে চায়, কিন্তু জোড়া মেলে না। বগলদাবা করে মুরগা নিয়ে ফিরে আসে ঘরে। হাড়িয়ার নেশা চড়ে গেলে হাতে তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। ধীরে-ধীরে পা ফেলে সতর্ক শিকারীর মতো এগোয়।

একদিন লাটু সিংকে আমি ধরে ফেললাম পাম্প রোডের কলা বাগানে। তার সাথে ছিল ল্যাংড়া হো। বিনুজয় নদীর ভিনু পাড়ে তার ঘরটা। ভাল শিকার করতে পারে। শীত পড়লেই হাত থেকে তীর ধনুক নামায় না সে। লেংটি পরে, খালি গায়ে মাথায় ছেঁড়া গামছার ফেট্টি বেঁধে সে ঘুরঘুর করে চ্যালাবেড়া পাহাড়ের কোলে। খরগোশ, বনচড়ুই, টিয়া, উদ্‌বেড়াল কোনও কিছু তার হাত থেকে রেহাই পায় না। আজকাল লাটু সিংয়ের সাথে তার খুব দোস্তি হয়েছে। লাটু সিং তাকে হাড়িয়া মহুয়া মদ খাওয়ায়। ল্যাংড়া হো-র পেটে যেন নাদা আছে, হাড়িয়া খাওয়া শুরু করলে যতক্ষণ না তল পেটটা ব্যথা করে ততক্ষণ সে খেয়ে যায়। লাটু তাকে মনের সুখে খাওয়ায়। তার উদ্দেশ্য একটাই কিভাবে তীর-ধনুক চালাতে হয় তার প্রয়োগ কৌশল ল্যাংড়া হো-র কাছ থেকে শিখে নেওয়া। অল্প ক-দিনের শিক্ষায় লাটু অনেক দূরের বস্তুও এফোড়-ওফোঁড় করে দেয়। ল্যাংড়া হো তখন পিঠ চাপড়ে সাবাশি দিয়ে বলে, চোখ-মন-নিশানা ঠিক রেখো, তাহলে যা ছুঁতে চাও তাই ছোঁবে ইস্পাতের ফলা। অধৈর্য হলে এসব সূক্ষ্ম কাজ হয় না।

লাটু সিং ল্যাংড়া হো-র পায়ের কাছে বসেছিল মুখ নিচু করে। ল্যাংড়া হো তাকে উসকে দিয়ে বলল, ওই উবের কলাগাছটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দাও হে, দেখি তোমার ধনুকের কত জোর।

লোহারের কাছ থেকে জুতসই কতগুলো তীর বানিয়েছিল লাটু সিং, তারই একটা তুলে নিয়ে ছিলাটা বুকের কাছে টেনে এনে ছেড়ে দিল আক্রোশে।

আমি দেখলাম, তীরটা দুবলা-পাতলা কলাগাছটাকে ফুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তীর ছোড়ার সময় লাটু সিংয়ের অস্বাভাবিক চোখ দুটো দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। লাটু সিং আমাকে কোনও আমলই দিল না, সে নিজের খেয়ালে মত্ত। ল্যাংড়া হো আমাকে দেখে গদগদ হয়ে বলল, বাবু চলুন আজ আপনাকে সফেদ চা পিলাব।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম, মনে মনে কিছুটা রেগেও গেলাম। ওর বড় ছেলে ভীষণ হো রেল অফিসের খালাসি। একদিন একটা চাইবাসা কোর্টে উকিলের নোটিশ নিয়ে আমার কাছে হাজির। চিঠিটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিব্রত স্বরে বলল, বাবু পড়ে দিন, কি লিখা আছে উটাতে।

নোটিশ পড়ে শিউরে উঠেছিলাম আমি। ভীষণের নামে নোটিশ পাঠিয়েছে রাম শেঠ দশ হাজার টাকার দাবি করে। বছর দুয়েক আগে টাকাটা নাকি উধার নিয়েছিল ভীষণ। এখন পনেরো দিনের মধ্যে টাকাটা না দিলে চাইবাসা কোর্টে কেস ঠুকবে রাম শেঠ। ঘটনাটা খুলে বলতেই কালিতে ভরে উঠল ভীষণের ঘাম চকচকে পাথর কঠিন মুখটা, রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেছিল, এ অন্যায়। রাম শেঠের কাছ থেকে আমি পানশ টাকা উধার নিয়েছিলাম, সে টাকা আমি সুদে আসলে কবে শোধ দিয়েচি। তারপরেও কোনু টাকার নোটিশ—কিছু বুঝলাম না। বাবু, আমি মুর্খ মানুষ পড়া-লিখা জানিনা, এমনভাবে ঠকিয়ে নিলে আমি যে পথে দাঁড়াব বাবু।

ভীষণ হেরে গিয়েছে কোর্টের রায়ে কেন না দশ হাজার টাকা সে ধার নিয়েছিল—এই মর্মে হ্যাণ্ডনোটে ওর টিপছাপ ছিল। আমরা মেসের ছেলেরা শত চেষ্টা করেও ভীষণকে জেতাতে পারিনি।

তাদের দুঃসময়ে আমরা যে সামান্য উপকার করেছিলাম—সে কথা এখনও ল্যাংড়া হো-র পরিবারের লোকেরা ভুলতে পারেনি। ওদের গাঁয়ে গেলে খাতির যত্ন করে, খাটিয়া পেতে দেয় আঙ্গিনায়, গ্লাস ভরে জল দেয়, লাল চা বানিয়ে আতিথেয়তা সারে। মহুয়া ফুলের সুগন্ধ যেমন বানানো হয়, ওদের আন্তরিকতাও তেমন বানানো। তবু কেন জানিনা ওর এই সফেদ চায়ের নিমন্ত্রণ আমার ভাল লাগল না। আমি লাটু সিংয়ের দিকে নীরব চোখে তাকিয়ে ফিরে এলাম মেসে।

তিনদিন পরের ঘটনা।

আমি ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বাংলা কাগজ পড়ছি, রামধন ঠাকুর কোথায় গিয়েছিল, ফিরে এসে গায়ের ঘাম মুছতে-মুছতে বলল, জানেন বাবু, লাটু সিংটা পাগলা হয়ে গেল। গেল রাতে সে রবার্টের কুঁড়েঘরটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ঘরটা। পুলিশ এসে মাজায় দড়ি পরিয়ে থানায় ধরে নিয়ে গেল লাটুকে। আমরা সবাই দেঁড়িয়ে-দেঁড়িয়ে দেখলাম।

লাটু সিং হল্লা-চেল্লা করছিল। ও বলছিল—পুরা দুনিয়াটাই আমি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিব। কোথায় পালাবে মালতী? সে মাগী যেখানেই থাকুক—তারেও আমি পোড়াব। এ রকম কত কি আবোল-তাবোল ভাষণ।

আমি সব শুনেও চুপ করে থাকলাম। লাটু সিংয়ের এমন পরিণতির জন্য আমি যেন মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম। তাই কষ্ট পেলেও নীরব থাকা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। লাটু সিংয়ের সরল-সাধাসিদে মনে যে ঘা হয়েছে তা সারিয়ে দিতে গেলে মালতীকে পৃথিবী চষে খুঁজে এনে ঐ মানুষটার পায়ের কাছে ফেলে দিতে হয়। কিন্তু তা কি করে সম্ভব। এতবড় দুনিয়ায় আমি তাকে খুঁজব কোথায় আর খুঁজে পেলেও সে ফিরবে কেন?

পরের দিন সকালে পুলিশ ইন্সপেক্টর ঘোষবাবুর সাথে দেখা হল বটুর চায়ের দোকানে। সহাস্যে এগিয়ে এসে বললেন, লাটু সিংয়ের ঘটনা শুনেছেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কই কিছু শুনিনি তো? বিশেষ কোন খবর আছে নাকি?

ঘোষবাবু টুপিটা খুলে ফেললেন মাথা থেকে তারপর বটুকে দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বললেন, লাটু সিং কেন পাগল হয়েছে জানেন? আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, ওর স্ত্রী মালতীর বেইমানির জন্য। সহজ সাদা-সিধে মানুষ। আঘাতটা সহ্য করতে পারেনি। ব্রেনটা ক্র্যাক্ হয়ে গেছে।

ঘোষবাবু আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, আপনি কিছু জানেন না। লাটু সিংয়ের মাথা খারাপ হওয়ার অন্য কারণ আছে। ও একটা মোরগ পুষেছিল যার গায়ের রঙ লালের উপরে সাদা-কালো ছিটে। ল্যাংড়া হো তার সেই মোরগটা চুরি করে খেয়ে নেয়। লাটু সিং তার বাড়িতে গিয়ে পালকগুলো দেখেই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। সে পালকগুলো বুকে চেপে হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ে। হাসি থামিয়ে অতর্কিতে সে ছুটে যায় ল্যাংড়া হো-র দিকে। চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে চেপে বসে বুকে। ল্যাংড়া হো যত চেঁচায়, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তত লাটু সিংয়ের মাথা আরও গরম হয়ে ওঠে। গলা টিপে সক্রোধে বলে, বেইমানির কোনও ক্ষমা নেই হো-য়ের বাচ্চা। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। লাটু সিং ল্যাংড়া হো-কে মেরেই ফেলত যদি না গ্রামবাসীরা ছুটে আসত সেখানে। এ ঘটনার পর থেকে দিনকে দিন হিংস্র হয়ে উঠছিল। আপনি তো শুনেছেন—সে রবার্টের কুঁড়েঘরটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন ওর সামনে কেউ যেতে পারে না, গেলেই দাঁত কিড়মিড়িয়ে কামড়াতে আসে। নখ দিয়ে খামচাতে আসে। ভাবুন তো কি ডেঞ্জারাস ব্যাপার!

আমি চুপ করে থাকলাম, এখন নীরবতাই আমাকে একমাত্র শান্তি দিতে

পারে। লাটু সিংয়ের সাথে আমার যে সখ্যতা হয়েছিল তা এ অঞ্চলের সবাই জানে। আমি যে ওর সাথে মুরগা লড়াইয়ের আসরে যেতাম, আমার এই উগ্র, একরোখা বদখেয়ালি মনোভাবের জন্য পরিমল এবং মেসের অন্যান্য বন্ধু আমাকে নেক নজরে দেখত। তাদের মতে মুরগা লড়াইয়ের মাঠে তারাই যায়, যারা জুয়া-দারু, মদ চুল্লু-হাড়িয়া পছন্দ করে। এ সমাজে পিছনে থেকে লড়িয়ে দেবার মনোভাব অনেকেরই। মুরগা লড়াইয়ের মাঠে আমি লাটু সিংকে কখনও সখনও উচ্ছৃংখল, বেপরওয়া, গোঁয়ার-গোবিন্দ হয়ে উঠতে দেখেছি। ওর ধূর্ত, অভিজ্ঞ চোখ দুটো এক নজরে যে কোনও মুরগার নাড়ি-নক্ষত্র বুঝে যেত। তার চোখের দিকে চোখ ফেলে যে মুরগা তাকিয়ে থাকতে পারত নিশ্চল সেই মুরগাই ছিল তার প্রিয় মুরগা। ফিটপানিয়া রঙের মুরগাটা তার প্রিয় ছিল একটাই কারণে। মুরগিগুলো তাকে দেখে ডরত। কখনও বা কাম লালসায় চোখে নিগূঢ় আবেদন নিয়ে ঘুরঘুর করত বস্তির ঝোপ জংগলে। লাটু তাকে ছেড়ে দিলে বিদ্যুৎ-এর বেগে ছুটে যেত ফিটপানিয়া মুরগা। শরীরের তাগদ দেখিয়ে সে দখল নিত বাড়ির মুরগাগুলোর উপর। বস্তির অন্য মোরগগুলো ভয় পেয়ে সম্ভ্রমের চোখে দেখত ফিটপানিয়ার বাহাদুরি। তারা ডাকতেও ভুলে যেত। বোকা-বোকা মুখ তুলে লুকিয়ে যেত ঝোপ-ঝাড়ে। ফিটপানিয়া যা পারে লাটু সিং কেন তা পারবে না? ফলে, ফিটপানিয়া মুরগা ছিল তার আদর্শ, স্বপ্ন, বদলা নেবার হাতিয়ার। তার মৃত্যু সহ্য হয়নি সরল সাধাসিধে মুরগা পাগল মানুষটার।

ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক তবু চোখের উপর ঘটছে বলেই মেনে নিতে হয়। সরহুল পরবে লাটু সিংয়ের নাচ আমি দেখেছি। নাচতে নাচতে আলিঘাসের চেয়েও খেপে যাচ্ছিল তার কোমর। দুমাং নাগরার তালে তালে নড়ছিল তার ছন্দোবদ্ধ পা। নেশায় চুর। তবু আমাকে দেখতে পেয়ে নাচ থামিয়ে আড়ষ্ট গলায় আফসোস করে বলেছিল, বাবু গো, আমার বউটা ছিল কলমকাঠি ধানের মত। তার শ্যামা মুখ আমি ভুলতে পারি না। ওই যে মেয়েগুলান নাচচে তাদের দেখে আমার মালতীর কথা মনে পড়ে। সে যে অমনভাবে আমার বুকে চাকু মেরে পালাবে—তা আমি স্বপনেও ভাবি না।

মানুষ যা ভাবে না তা এ সংসারে আকছার ঘটে যায়।

লাটু সিংকে থানা থেকে চালান দিয়েছে চাইবাসায়। তার জামিন আনার কেউ নেই। জেল হাজতে সে পচবে। বড়জোর চিকিৎসার জন্য রাঁচি পাঠাবে তাকে। এর বেশি বড় পরিবর্তন তার জীবনে আসবে না।

লাটুর কথা যখন ভুলতে বসেছি তখনই তার কথা মনে করিয়ে দিল মালতী। আমি, পরিমল আর রামধন ঠাকুর সবাই তাকে দেখে অবাক।

খটখটে দুপুরে সে এসে মেসের সামনের নিমগাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়েছে হাতে সানকি। পরনে ছেঁড়া কাপড়, গায়ে ব্লাউজ নেই। চোখ বসা. মুখের দু-পাশে ঘা। কাকের বাসার মতো মাথার চুলে কতদিন যে তেল পড়েনি। রামধন ঠাকুর বিরক্ত হয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছিল তাকে, মেস ম্যানেজার পরিমল বলল, ঠাকুর, কাকে তাড়াচ্ছো —ও যে আমাদের লাটু সিংয়ের বউ মালতী। আমাদের দৃষ্টিগুলো আছড়ে পড়ল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ঝুলকালি মুখটার ওপর। বিশ্বাসই হচ্ছিল না ভিক্ষাপাত্র হাতে রোদের মধ্যে যে দাঁড়িয়ে আছে সে আমাদের অতি পরিচিত মালতী। এ কয়দিনে এত পরিবর্তন, ভাবাই যায় না। মানুষের কংকাল দেখে যেমন চেনা যায় না, তেমনি ওই রোগা শুটকো হনুহাড় জাগা মাঝবয়সী মেয়েটিকে দেখে কিছুতেই কালো, ছিপছিপে, পানপাতা আদলের মালতী বলে মনে হয় না। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে মানুষ এতো বদলে যায়? তবে কি দুঃখের থাবা এমন সর্বগ্রাসী, দাউ দাউ দাবানলের আগুন? মালতীর পোড়া শরীরটা থেকে একরাশ ঘেন্নায় কেঁপে উঠে দৃষ্টি সরিয়ে নিল রামধন ঠাকুর, গলায় কাঠিন্য আর বিরক্তি মিশিয়ে বলল, রাঢ়ুয়া মাগীর যা হাল হয়, এরও তাই হয়েচে বাবু। আগুন খেলে অঙ্গার তো বেরবেই।

রামধন ঠাকুরের কথাগুলো পাথরের চেয়েও কঠিন, সব শুনেও নিশ্চল পাথর প্রতিমার মতো মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকল মালতী। রামধন ঠাকুর আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল, মাগীটাকে ভাগায় দেন বাবু। ও মেসের সামনে ঘুরঘুর করলে আপনাদেরই বদনাম হবে। ও তো চন্দন নয়, পাঁক। পাঁক যত ঘাটবেন তত গন্ধ বেরবে। আপনাদের সমাজ নিয়ে থাকতে হবে। শুখা ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে যখন তখন মানুষের বুক ফাটে। বাদ দিন তো। চলুন, খাওয়ার সময় হল।

যে পরিমল মালতীকে দেখতে পারত না, ওর হঠাৎ উপস্থিতিতে গা জ্বলত ওর, সেই পরিমলই এগিয়ে গিয়ে ডাকল, মালতী, রোদে দাঁড়িয়ে কেন ছায়ায় আসো। তোমার কি শরীর খারাপ?

মালতী ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁদল, শরীল থাকলে তো খারাপ হবে? চোখ মুছে নিয়ে মালতী এবার আমার দিকে তাকাল, বাবু, সে মানুষটা এখন কেমন আচে, কোথায় আচে? আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম—তালা ঝুলচে। শুনশান।

আমি লাটু সিংয়ের কথা সবিস্তারে বলতেই সে কপালে চপেটাঘাত করে নাকি সুরে কাঁদল, কে জানত আমার এমন কপাল পুড়বে গো বাবু! যার হাত ধরে পেলিয়ে গেলাম, সে-ও এট্টা ক্ষ্যাপা। আমায় ফেলে রেখে কোথায় সে যে হারিয়ে গেল তার খোঁজ আমি আর পাইনি। আজ তিনদিন

হল পেটে আমার দানা পড়েনি। শরীরও দুর্বল। হাঁটা-চলা করতে পারিনে। কোনমতে ট্রেনে চেপে বিলচুহার মতন আপনগর্তে ফিরে এলাম।

তুমি তাহলে রবার্টের কোনও খোঁজ জানো না? আমার প্রশ্নে মালতী উদাস হয়ে গেল মুহূর্তে, চোখের কোণ মুছে বলল, আজ সাতদিন ধরে তার কোনও খোঁজ নেই, ওই হিজড়ে বউটার জন্য আমার ভাগ্যটাও মুড়িয়ে গেল। এখন আমার একূল-ওকূল দু-কূল গিয়েচে। ঘরের বউ রক্তের তেজে বারমুখো হলে তার কপালে কোনদিন শান্তি জোটে না। মালতী এতই ক্ষুধার্ত ছিল যে তার দিকে চেয়ে থাকতেও কষ্ট হয়। আমি রানধনকে বললাম, ওকে দুটো ভাত দেওয়ার জন্য। রামধন ঠাকুর অমান্য করল না। থালায় করে ভাত এনে দিল বারান্দায়।

মালতী নোংরা হাতে গোগ্রাসে খাচ্ছিল। খেতে খেতে বিষম খেল জোরে। টুপটুপ করে সাদা ভাতে মিশে যাচ্ছিল চোখের জল। খাওয়া শেষ করে সে যখন থালা ধুয়ে দিতে যাবে তখনই বমির বেগে মুখে হাত চেপে ছুটে এল বাগানে। যা খেয়েছিল ওয়াক ওয়াক করে উগরে দিল নিমতলায়। আমি কাছে গিয়ে শুধোলাম, মালতী, তোমার কি শরীর খারাপ? মালতী কষ্ট করে বলল, না গো বাবু, পেটে আমার শত্রু বাড়ছে। এই শত্রুছাড়া রবার্ট যে আমাকে কিছু দেয়নি। কথা শেষ করে টলতে টলতে চলে গেল মালতী।



চোদ্দ

টানা বর্ষায় কনস্ট্রাকশানের কাজ বন্ধ ছিল দিন পনেরো। একদিন ছাতা মাথায় দিয়ে বাজারে যাওয়ার পথে বটুর সঙ্গে দেখা। বটু যাচ্ছিল মাল কিনতে বড় বাজারে। আমাকে দেখে রিকসাওলাকে থামতে বলল বটু। আমি রাস্তার এক পাশে সরে এসে শুধোলাম, অভয়বাবুর সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল?

আমি যে সহসা এমন প্রশ্ন করব বটু হয়তো প্রস্তুত ছিল না। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে মাথা চুলকে সে আমাকে বলল, উনি তো আগে প্রায়ই আসতেন। আমি একদিন নিষেধ করার পরে এই মাস তিনেক হল উনি আর আসেন না। কাজটা কিন্তু তোমার ঠিক হয়নি। আমার গলার স্বরে ঈষৎ কঠিনতা। বটু থতমত খেয়ে বলল, জানি, কিন্তু কী করব মাখনদাদা! ভদ্রলোক রোজই এসে ঘুরে যাবেন—সেটা তো খারাপ দেখায়। আমরা যখন সীতার জন্য কিছু করতে পারব না তখন না করে দেওয়াই ভাল। উনি কেন শুধু-শুধু আশায় থাকবেন। তাছাড়া, প্রত্যেকের সময়ের তো একটা দাম আছে।

বটু যা বলে তা হয়তো নাইন্টি নাইন পারসেন্ট ঠিক তবু কোথায় যেন মনটা খচখচিয়ে ওঠে, বিশ্বাসহীনতার প্রশ্ন খাড়া হয়। অভয়বাবু সীতার বিয়ের ব্যাপারে আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিলেন সংগত কারণে। এই সুদূর প্রবাসে তার জানা-শোনা কম। তিনি যে গ্রামে থাকেন সেখানে উনি ছাড়া আর একটা ঘরও বাঙালি নেই। সীতাকে পাত্রস্থ করতে হলে বাঙালি ঘরের ভদ্র সন্তানই প্রয়োজন। কোথায় পাবেন সুপাত্র? তাই, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনাগুলো আজ তার মধ্যেও প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয় এবং এই কারণে তিনি মরিয়া হয়ে আমাদের কাছে ছুটে আসেন যদি কোনও আশার আলো দেখতে পান—শুধু এই এক ইচ্ছায়।

সীতাকে পাত্রস্থ করার জন্য আমি যে চিন্তা-ভাবনা করিনি তা একেবারে

ঠিক নয়। আমার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি। আমি যাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম—তারা প্রত্যেকেই ন্যূনতম একটি 'পাশ' দাবি করে। সীতা নন-ম্যাট্রিক। ক্লাস নাইন অবধি পড়ে সে আর পড়ার সুযোগ পায়নি। তবে তার হাতের শিল্পকর্ম এবং সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধি ভাল। সর্বোপরি, সীতার একটি বিশুদ্ধ দয়ালু মমতাময়ী হৃদয় আছে যা অনেক মেয়ের মধ্যে থাকে না, আর থাকলেও তা পাথরচাপা উদ্ভিদের মতো ক্ষীণ। এমতাবস্থায় সীতাকে নিয়ে আমিও সমস্যায় পড়েছিলাম। পরিমল আমার বন্ধু হলেও বয়োঃজ্যেষ্ঠ। তাকে সব বলাতে সে একটা মজার কথা বলেছিল, পাত্র যখন পাচ্ছিস না তখন নিজেই পাত্র হয়ে যা। সীতা যখন ভাল মেয়ে, রূপে-গুণে উর্বশী—আর তুই-ও পাত্র হিসাবে খারাপ নয়, তাহলে সীতাকে তোর বিয়ে করতে দোষ কোথায়?

পরিমল ঠাট্টার ছলে যা বলেছিল সেই কথার সূত্র ধরে আমি অনেক বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেছি কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। সীতাকে স্ত্রী হিসাবে যখনই ভেবেছি তখনই একটা সুপ্ত পাপবোধ আমাকে ফালা ফালা করে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে—যেখানে আমি নিজে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারিনি। আমি কোনও না কোনও দিক থেকে হেরে গিয়েছি। কখনও মনে হয়েছে আমি সীতার যোগ্য নই। কারোর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে নিজের স্বপক্ষে তাঁবু বিছানো কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে উচিত নয়। লুকানো স্বার্থ প্রকাশ পেলে কোনও মানুষ কি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে? তাছাড়া, বিয়েটা এক তরফা খেলা নয়, এক্ষেত্রে সীতার মতামত অত্যন্ত জরুরি। প্রস্তাব দেওয়ার পর সীতা যদি অ-রাজি হয়, বেঁকে বসে? এসব ছাড়াও আর একটি প্রশ্ন আমাকে মাঝে মাঝেই ব্যতিব্যস্ত করত। প্রথম দর্শনে বটু সীতাকে সুখিয়া বলে ভুল করেছিল। এবং ওই সীতাকে নিয়েই সুখের স্বর্গ রচনা করেছিল মনে মনে। তার সেই স্বপ্ন এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। সেদিক থেকে ভাবতে গেলে আমার থেকেও সীতার উপর বটুর জোর বেশি। সীতা হল বটুর মানসিক ব্যাধি সারানোর ওষুধ। অথচ, সীতার ব্যাপারে বটুকে বলি-বলি করেও কোনওদিন আমি বলতে পারলাম না। চন্দনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে আমি বটুর কাছে সন্তোষজনক সাড়া পাইনি, বরং চাপা একটা অসন্তোষ আমি বটুর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম—যা আদৌ আমি আশা করিনি। বটু আমার বন্ধু এবং এই বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে আমার মতাদর্শকে আরোপিত করতে পারি না। সীতার সঙ্গে বটুর বিয়ের প্রস্তাব সেই প্রথমদিনই আমার মনে উঁকি দিয়েছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল বটুর হাবভাব লক্ষ করে একদিন আমি নিজেই বটুকে বুঝিয়ে বলব। ওর এখন সব আছে, শুধু একজন

প্রকৃত সঙ্গিনীর অভাব।

বটু মুদিখানা এবং মনোহারি দোকান পাশাপাশি খুলেছে, ওর সেই ভাঙাচুরো খাপরার ঘরের বদলে এখন পথচারীর চোখে পড়ে সুদৃশ্য পাকা বাড়িটা। কয়েক মাসের মধ্যে বটুর এই পরিবর্তন অনেকেই সন্দেহ এবং ঈর্ষার চোখে দেখে। বটু এখন রেল কলোনির মহাজন। তার নতুন দোকানে পাঁচজন কর্মচারী কাজ করে। বটু সেই চায়ের দোকান নিয়ে আছে। সে বলে, এই চা দোকান হল লক্ষ্মী। এর জন্যই আমার এত বাড়-বাড়ন্ত। নতুন ব্যবসা পেয়ে পুরনো ব্যবসাকে ভুলে যাব—আমি তেমন লোক নই। আমর কাছে নতুন পুরাতনের গুরুত্ব একই।

আর্থিক স্বচ্ছলতা বটুর মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি এটাই আশাব্যঞ্জক। বটুর দোকানে আমার আর নিয়মিত যাওয়া হয়ে ওঠে না। বর্ষাকাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিসের কাজের মাত্রাটা বেড়ে যায়, দম ফেলার ফুরসৎ পাওয়া যায় না। সেকশন ইনচার্জ আমাকে এক মাসের জন্য পাঠিয়েছেন জংশন স্টেশনে কাজ-কর্ম দেখা-শোনার জন্য। এক মাস মেসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। প্রাত্যহিক ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আমি স্টেশন সংলগ্ন রেস্ট হাউসে উঠেছি দিন পনেরো হল। যতক্ষণ কাজের মধ্যে থাকি ততক্ষণ ভাল থাকি। অবসর সময়টা একা-একা ভাল লাগে না। বটুর কথা, মেসের বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। পাহাড়ের মাথার উপর যখন বর্ষার গুরুগম্ভীর মেঘ তলপেটের ছোঁয়া দিয়ে উড়ে বেড়ায়—তখন ওই পাহাড়কে আমি ঈর্ষা পরায়ণ চোখে দেখি। নেড়া পাহাড়গুলো মাত্র কয়েকদিনের বর্ষায় একেবারে ঘন সবুজ। সকালে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যখন সূর্য ওঠে তা এক দেখার মতো দৃশ্য। চারদিক আবির ছড়ানো, কে যেন রক্ত কুলকুচি করে ছিটিয়ে দিয়েছে আকাশে। রোদ উঠলে সজনে গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত চকচক করে, মেঘলায় পাতাগুলোর কেমন গোমড়া কালো মুখ। হাতে কাজ না থাকলে রেস্ট হাউসে মন বসত না, আমি বেরিয়ে পড়তাম এদিক-সেদিক।

জংশন স্টেশন একটা বিচিত্র জায়গা। গাড়ি ধরার জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কত যে ভাষা-ভাষীর মানুষ প্রত্যহ এখানে একত্রিত হয় তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

সেদিনটা ছিল রবিবার। সকাল থেকে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে আকাশময় কার্পাস তুলোর ছড়াছড়ি। তেঁতুল গাছের ভিজে পাতা থেকে তখনও জল চুঁয়ায়, বিল ফেরত বকগুলো তার মগডালে বসে আমোদে মেতেছে। রোদ এসে পড়েছে সেই ক্ষুদে ক্ষুদে পাতায়। সে এক দেখার মতো দৃশ্য, মন ভরে ওঠে।

বৃষ্টি নেই বলে হোটেলে খেয়ে-দেয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি শহর দেখতে। একটা ভাল ছবি এসেছে, ইচ্ছে আছে দেখার। তখন দুপুর। বর্ষাকালের রোদ উঠেছে অবিকল গ্রীষ্মকালের মতো। ঘুরতে-ঘুরতে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। একটা চা দোকান দেখে চা খাওয়ার ইচ্ছে হল। দোকানটা বাস স্ট্যান্ডের একপাশে, বেশ ছোট্ট দোকান—সামনে একটা মাত্র বেঞ্চি পাতা। মাথার উপর ছাউনি বলতে পুরনো ত্রিপল, বোঝা গেল পুলিশি হুই-হুজ্জোতি হলে ত্রিপলটা খুলে নিয়ে দোকানটাকে গুটিয়ে নেওয়া যায়। তোলা উনুনের গনগনে আঁচে টগবগ করে জল ফুটছিল কেটলিতে। কয়েকটা কাঁচের জারে বিস্কুট-কেক। এই বাস স্ট্যান্ডটা শহরের একেবারে মধ্যে, এখানে এলে গ্রাম্যতার গন্ধ পাওয়া যায় মানুষের চেহারায়। বাস পথে জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ আসে কোর্ট-কাছারি-ব্যবসা-বাণিজ্য আর নানান মতলবে। এখান থেকে ট্রেন যোগাযোগও খুব উন্নত। বাস স্ট্যান্ড থেকে স্টেশন মাত্র দু-টাকা ভাড়া। বেশির ভাগ মানুষই পায়ে হেঁটে স্টেশনে যায়। এই অভাবি শহরে দুটো টাকার অনেক দাম।

সিনেমা দেখব বলে বহু আশা করে আমি বাস স্ট্যান্ড অব্দি এসেছি পায়ে হেঁটে। রিক্সা ভাড়া বাঁচানো উদ্দেশ্য নয়, আমার ইচ্ছে শহরটাকে পায়ে হেঁটে তারিয়ে-তারিয়ে দেখব। কিন্তু বাস স্ট্যান্ড অব্দি এসে আমার পা আর চলে না, কেমন অবসন্নতা বোধ করি। ক্লান্তিতে আমার এক পা চলতে ইচ্ছে করে না। ওই চায়ের দোকানটার ফাঁকা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ি। এক কাপ স্পেশ্যাল চা খেলে শরীরের ক্লান্তি দূর হবে, এই ভেবে চায়ের অর্ডার দিলাম বটুর বয়েসী ছেলেটাকে। এত ছোট দোকান তবু হিন্দি কাগজ রাখে নিয়মিত। আমি কাগজটা টেনে নিয়ে সামনের পাতার ছবিটা দেখছিলাম। তখনই আমার গায়ে ছায়া পড়ল ভ্রাম্যমান চিলের। ঘাড় তুলে দেখি একটা নয়—পরপর অনেকগুলো চিল, তারা একটা টিয়া পাখিকে তাড়া করেছে শিকারী তৎপরতায়। অন্য জায়গা হলে আমি চিলগুলোকে ঢিল ছুঁড়ে মারতাম এবং তাদের ঔদ্ধত্যের যোগ্য শাস্তি দিতাম। কিন্তু এই জনবহুল জায়গায় ঢিল ছোঁড়া সমুচিত হবে না বলে আমি আবার খবরের কাগজে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। সালসা বিক্রি করতে আসা পাগড়ি বাঁধা কালো লম্বা খিটখিটে লোকটা লাল শালু দিয়ে একটা বর্গাকার জায়গা ঘিরে ভাঙা নড়বড়ে টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে দিয়েছে ফুল-ভল্যুয়মে। টেপ-রেকর্ডারে তখন ঝ্যানঝ্যানে গলায় সালসার সুখ্যাতি। আমি এক মনে শুনতে শুনতে হেসে উঠলাম। এই পাগড়ি বাঁধা লোকটার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে চিত্র তারকার ছবি পর্যন্ত একই ফ্রেমে বাঁধান। লাল রঙের ওষুধের শিশিগুলো অনেকটা কমদামি মদের বোতলের মতো দেখতে। তাতে

কোনও লেবেল নেই, একেবারে সাদামাটা।

দু-দিক থেকে দুটো বাস এসে থেমে গেল বাস স্ট্যান্ডের মাঝখানে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ধোপ-দুরস্ত মানুষ চোখে খুব কম পড়ে। তেমন আগ্রহ বোধ না হওয়ায় চোখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি। কিন্তু ওই পাগড়ি বাঁধা লোকটার চিৎকার-চেঁচামেচিতে বসে থাকাও কষ্টকর। শ-খানেক মানুষের অন্তত বিশ জনকে ভাগিয়ে আনতে পারলে তার বিক্রি ভালই হবে। গ্রামের মানুষের সালসার উপর আদি, অকৃত্রিম টান আছে।

চা-দোকানি একটা মাঝারি মাপের কাঁচের গ্লাসের হাফ মাপ করে চা দিল আমাকে। গরম গ্লাসটা হাতে ধরতেই বুঝলাম চালু চা আর স্পেশ্যাল চায়ের ফারাকটা চোখে লাগাব মতন। চা-দোকানি বেশি দুধে কম লিকার দিয়ে চা করেছে। এবং ফাঁকি দেয়নি। আমি দুটো নোনতা বিস্কুট নিয়ে চায়ের গ্লাসে চুমুক দিলাম। তখনই দেখি সেই সুন্দর টিয়া পাখিটাকে ঠুকরে ফেলে দিয়েছে চিলগুলো, বাস স্ট্যান্ডের চেটো ডোবা জলে টিয়া পাখিটা হুমড়ে পড়ে অতর্কিত আর্তনাদে অতিষ্ঠ করে তুলেছে চারপাশ। সালসাওয়ালাকে ছেড়ে উৎসাহী জনতার ভিড় জমে গেল টিয়াপাখিকে ঘিরে। আশ্চর্য সেই সালসাওলা বরদাস্ত করল না এমন ব্যবসা পরিপন্থী আকস্মিক ঘটনাকে। সে মোচে তা দিয়ে সাপের মতো শীর্ণ শরীরটা রাগে ফুলিয়ে সূঁচের মতো ভিড় ভেদ করে ঢুকে গেল। ফিরে এল পাখিটার টুঁটি টিপে ঝোলাতে ঝোলাতে।

আমার চা তখন অর্ধেকে এসে ঠেকেছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সিনেমায় লাইন দেব এমন ভেবে দ্রুত চুমুক দিয়েছি গ্লাসে। ঠিক সেই সময় হাফপ্যান্ট পরা দশ-বারো বছরের একটা ছেলে এসে আমাকে বলল, শুনুন, আপনাকে ওরা ডাকছে। বলেই সে তর্জনী তুলে বাস স্ট্যান্ডের একেবারে শেষের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা দু-জন মেয়েকে দেখিয়ে দিল। এই অচেনা জায়গায় আমাকে কেউ ডাকতে পারে—প্রথমে আমার বিশ্বাস হল না। চায়ের দাম মিটিয়ে সংশয় ভরা মন নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, নজর আমার বাস স্ট্যান্ডের শেষের দিকে। যাব কী যাব না ভাবছি এমন সময় শাঁখা-পরা একটি হাত আমাকে উদ্দেশ করে নড়ে উঠল। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম অভয়বাবুর স্ত্রী, সঙ্গে সীতা। ওদের অসময়ে এখানে দেখব কল্পনাও করিনি। দীর্ঘ চার-পাঁচ মাস সীতার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, আজ হঠাৎ বাস স্ট্যান্ডে ওকে দেখে খুশিতে আমার মন ভরে উঠল। তৎক্ষণাৎ আমার ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ল আত্ম-তৃপ্তির হাসি। সীতা তখনও গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে, ওর বিনুনী দুটো ঘাড়ের কাছ দিয়ে বুকের উপর ফেলা, এবং তা সাপের লেজের মতো সরু হয়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত, মাদকীয় উন্মুখ নাভির উপর পড়েছে। ওর প্রশান্ত দু-চোখে

অভিমানের প্রলেপ। চিহড়লতা গোলাকার মুখটায় কষ্ট পাওয়ার হাজার শিকড়।

বৌদি আমাকে অভিযুক্ত করে বললেন, সেই যে গেলেন আর একবার খোঁজও নিলেন না। কী জানি, কোনও যদি দোষ করে থাকি ক্ষমা করে দেবেন।

বৌদির কথায় লজ্জায় আমি কুঁকড়ে গেলাম, অপরাধবোধে কেঁপে গেল চোখের তারা। কোনও কিছু বলার আগে বৌদি বললেন, সীতাকে নিয়ে বারাসত গিয়েছিলাম ওখানে ওর কাকা থাকে। অনেকদিন যাওয়া হয় না, তাই ক'দিন ঘুরে এলাম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিলাম—সে কাজ হল না।

বৌদি পরিষ্কার করে না বললেও সীতার বিয়ের ব্যাপারে তারা যে বারাসত গিয়েছিলেন এটা বুঝে নিতে আমার কোনও অসুবিধা হল না। জংশনে নেমে রং-পাহাড়ের বাস খুব ঘন ঘন পাওয়া যায়। তাই, জংশনে নেমে রিকশা ধরে ওরা বাস স্ট্যান্ডে এসেছে। কথা বলার ফাঁকে, বৌদি বাসের গতি-বিধির উপর নজর রাখছিল।

সেই থেকে সীতা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেনি। থমথমে মুখে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শুনছিল। বৌদি বললেন, আমি আপনাকে প্রথমে দেখতে পাইনি, সীতাই প্রথম দেখেছে। ও বলার পর ওই ছেলেটাকে দিয়ে আপনাকে ডেকে পাঠালাম।

খুব ভালই হয়েছে। না ডাকলে দেখাই হত না।

বৌদি করুণ মুখে হাসলেন, হ্যাঁ, দেখা হয়ে ভালই হয়েছে। ক'দিন থেকে আপনাদের কথা খুব মনে পড়ছিল। কেন জানি না খুব মনে পড়ে। আসলে আমাদের তো আর কেউ নেই—তাই।

বৌদি এমন বিষন্ন সুরে কথাগুলো বলছিলেন যা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। কথাগুলো যেন অন্তর থেকে ছেঁকে তোলা। এবং প্রতিটি শব্দই শানানো তীরের মতো আমার বুকে গেঁথে গেল। এক অব্যক্ত, নীরব যন্ত্রণায় আমি বাক্যহারা চোখে বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বৌদির অভিযোগ-গুলো অসত্য বা বানানো নয়। সেই এক শীতের সন্ধ্যায় সিগ্রেট কিনতে গিয়ে অভয়বাবুর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল, ভদ্রলোকের সুমধুর, সদালাপী ব্যবহার অল্প সময়ের মধ্যে গভীর রেখাপাত করেছিল আমাদের মনে। মেসে ফিরে এসে বহুবার আমি ওদের কথা ভেবেছি। কিন্তু যে দায়িত্ব উনি আমাদের দিয়েছিলেন তা পালন করতে পারিনি বলেই মনের দিক থেকে আমি কিছুটা অসামাজিক হয়ে পড়েছিলাম। অকর্মণ্যতা আমাকে শাসন করত। সীতার ওই সবুজ সুন্দর মুখটা প্রায়ই আমাকে দায়িত্ব সম্বন্ধে

সজাগ করে দিত। আমার ইচ্ছা ছিল সীতার একটা ভাল সম্বন্ধ যোগাড় করে গর্বে বুক ফুলিয়ে আমি রঙ পাহাড়ের ওই গ্রামটাতে ঢুকব। বৌদি এবং অভয়বাবুকে চমকে দেব! কিন্তু সেই সৌভাগ্য আমার আর হয়ে ওঠেনি। আমি চেষ্টা করেও হেরে গিয়েছি। শেষের দিকে অভয়বাবুর আসার সংবাদ পেলেই অফিস থেকে পালিয়ে যেতাম। ওই সরল সুন্দর মনের মানুষটিকে প্রতিদিন ফিরিয়ে দিতে আমার ভাল লাগত না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুঃখ আমি না বুঝলেও তার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখের ভাষা বুঝতে আমার অসুবিধা হত না। যে তীব্র আশা নিয়ে অভয়বাবু আমার কাছে আসতেন, তার সেই আশার বীজকে সাহায্যের জল সিঞ্চনে আমি অনুকূল স্তরে পেঁছে দিতে পারিনি। এ ব্যর্থতা একান্তই আমার। বটুকে আমি কখনো এ ব্যাপারে দায়ী করিনি। বটু ভিন্ন ভাষী যুবক। তার পক্ষে যা অনায়াস সাধ্য নয়—আমার পক্ষে তা সহজসাধ্য কাজ। তবু প্রতিনিয়ত বটু আমাকে মনে করিয়ে দিত। আর আমিও মগজে পুরে নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরতাম। কিন্তু ওই ঘোরাই, কাজের কাজ কিছু হয়নি।

আজ এই দুপুরবেলায় বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও কৈফিয়ৎ বা অজুহাত আমার বুক ঠেলে উঠে আসে না। আমি কেমন ঝিমোন চোখে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকি। সীতার হাতে একটা সবুজ রংঙের বালতি-ব্যাগ। তাতে জামা-কাপড় বোঝাই। সে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল আমাদের। বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। নিজের বিয়ের কথায় নিজে কেন লজ্জিত হবে—সেইজন্য তার এই দূরত্ববোধ। দিনের আলোয় বাস স্ট্যাণ্ডের খোয়া-পাথর ভর্তি মাটিতে সীতাকে দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। এক অদ্ভুত শঙ্কায় তার ভেতরটা বুঝি অস্থির হচ্ছিল, ট্রেন জার্নির দরুন নাকি অন্য দুশ্চিন্তায় তা বুঝতে পারলাম না। তবে বিবাহ সংক্রান্ত কথা-বার্তায় ও যে খুশি নয়, তা ওর হাবভাবে বুঝতে পারলাম। নয়নলোভন মুখমণ্ডলে অকস্মাৎ মেঘে ঢাকা আকাশের মতো বিষণ্ণ, গম্ভীর প্রতিচ্ছায়া। যেন চাঁদ মুখ ঢেকেছে ওই ভয়াল কালো মেঘে। বজ্র বিদ্যুৎ-এর তীব্র ঝলকানিতে মাঝে মাঝে জলে ডোবা পুজোর ফুলের মতো সপ্রতিভ হচ্ছে উঠছে তার মুখ। এক হাতে আঁচল চেপে সীতা অমন করে কী ভাবছে? সে কি তার নিজের ঘোলাটে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত? সীতার মতো মেয়েরা অল্পতে ভেঙে পড়ে না—এটা আমার বিশ্বাস। তাছাড়া তার কী এমন বয়স, এই বয়সে রেল কলোনিতে অনেক মেয়ে ফ্রক পরে খুকু সেজে ঘুরে বেড়ায়। তবে সীতা কেন গভীর চিন্তায় ডুবিয়ে দিচ্ছে নিজেকে।

আমি সীতার কাছে এগিয়ে যাই। ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, তোমাদের ওখানে না গিয়ে অন্যায় করেছি। কিন্তু তুমিও তো আমার

সঙ্গে কথা না বলে রীতিমতন অন্যায় করছ। কি হল, তোমার মুখে হাসি নেই, তুমি কি সত্যিই আমাদের উপর রাগ করেছ?

সীতার রক্তিম ঠোঁট নড়ে উঠল মৃদু কম্পনে, বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে সে বলল, আমার রাগ-অভিমানে আপনার কী এসে যায়। আমার নাম তো সীতা। আমার পুরো জীবনটাই তো দুঃখের।

ছিঃ, এমন কেন ভাবছ?

ভাবব না? সীতা ছলছলে চোখে তাকাল, আমরা গরিব। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে লোকে যদি বদনাম করে, সেই ভয়ে তো যান না। বাবা আমাকে সব বলেছে। বাবাকে দেখলে আপনি তো 'অফিসার ডাকছে' এই অজুহাতে চেয়ার ছেড়ে পালিয়ে যান। বাবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে চলে আসেন। বলুন তো একটা বয়স্ক মানুষের প্রতি আপনার এমন ব্যবহার করা কি ঠিক? অথচ, আপনি জানেন না হয়তো, বাবা আপনাদের দু-জনকে কী ভীষণ ভালবাসে, বিশ্বাস করে। আমাদের বাড়িতে এমন কোনও দিন যায় না যেদিন আপনাদের আলোচনা হয় না। সেই বোকা সরল মানুষটাকে আপনি কীভাবে এড়িয়ে চলেন বুঝি না।

তুমি চুপ কর সীতা। আর্তনাদের মতো কথাগুলো বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে, আমি তাড়া খাওয়া পশুর মতো হাঁপিয়ে উঠে দয়া ভিক্ষার চোখে ওর দিকে তাকালাম। সীতা স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ, অমনোযোগী দৃষ্টিতে হর্ন বাজিয়ে, কাদা জল ছিটিয়ে চলে যাওয়া বাসটার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমি যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি সেদিকে ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। পালসাওলার টেপ-রেকর্ডারের ভাঙা স্বর আমাদের দু-জনের কানের পর্দায় আছড়ে পড়ল। সীতা অন্যমনস্কতার সাগর থেকে ভুস করে উঠে দাঁড়াল, আমার দিকে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চোখে তাকিয়ে গলায় শ্লেষ ফুটিয়ে বলল, আপনাকে দোষ দেওয়া তো আমার ভুল। অথচ, কোন্ অধিকারে যে কথাগুলো বলে ফেললাম তা ভেবে লজ্জা পাচ্ছি। বাবা আপনাদের সেদিন যে দায়িত্ব দিয়েছিল তা থেকে আমি আপনাদের মুক্তি দিলাম।

আমি বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে সীতার কথাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম। এতক্ষণ আমার মধ্যে যে স্ফুরিত আবেগ ছিল তা এখন কথার বিষে জর্জরিত। সীতার তাপ উদ্রেককারী চোখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করছে। কেন যে ভয় করছে, কেন যে কেঁপে উঠছে রক্তস্রোত তা আমার বোধগম্য হয় না। তবে, সীতার মর্মস্পর্শী, অভিমানী কথাগুলো আমাকে যে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে এ সম্বন্ধে আমি সন্দেহহীন। কোনও এক অসংলগ্ন মুহূর্তে আমার মনে হয়, সীতার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হত। এমন নগ্নভাবে উদ্ভাসিত হত না মুখোশ। ভদ্রতার আড়াল দিয়ে আমি বেশ

স্বচ্ছন্দে বুকে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরতে পারতাম। কিন্তু একি হল আমার? কেন পরিষ্কার চোখে আমি সীতার দিকে তাকাতে পারছি না। আমার অপরাধটা কোথায়? আমি তো কোনও অন্যায় করিনি? অভয়বাবুকে সীতার বিয়ের ব্যাপারে আমি কোনও মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিইনি। 'চেষ্টা করে দেখব' এই আশ্বাস বাক্যে তো কোনও অন্যায় গোপন করে নেই।

বৌদি সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন। সীতার চড়া কথাগুলো তার কানেও ঢুকেছে। আমাকে নীরস মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি মলিন হেসে বললেন, ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। যাদের ও খুব আপন ভাবে তাদেরকে ও কথা শোনায়। আসলে ওর এই উগ্র মেজাজটাই ওর সব নয়।

তা আমি জানি। আমি হাসলাম, সীতাকে আমি চিনেছি সেদিন সন্ধ্যায়। তৃষ্ণার জল চাইতেই ও বিনা সংকোচে ঘড়া থেকে জল ঢেলে দিল। এবং পরে কুয়োয় গিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জল ভরে নিল। এমন মন ক-জন মেয়ে পায়?

বৌদি কিছুক্ষণ মৌন থাকলেন। মেয়েব প্রশংসায় তার পরিশ্রান্ত মুখে সুখের ভাঁজ পড়ল। সীতা দেখি তখনও একপাশে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে। ওর চেহারায় কেমন একটা বেপরোয়া ভাব। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সে যেন মোটেও ভাবিত নয়। ওর এই সাহসী মনোভাবটি আমার খুব পছন্দ হল। সাধারণত মেয়েরা যেমন নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ভয় পায়, সীতাকে তেমন দেখাল না।

সালসাওলা টিয়া পাখিটার রক্তাক্ত ডানাটা ডানে-বাঁয়ে ঝুলিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। আমি দেখলাম একজন আদিবাসী যুবতী পাকা কাঁঠাল মাথায় নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাস স্ট্যান্ড থেকে। তার পিছনে পেট পিলে তিনটি ছেলে-মেয়ে। তারা বোঁচকা নিয়ে কোনওমতে হাঁটছিল। দৃশ্যটা পীড়াদায়ক। আমি সেদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে রুমালে আমার ঘাম মুখটা মুছলাম। তবু, সারা মুখে কেমন একটা তৈলাক্ত ভাব ছড়িয়ে থাকল যা মাঝে-মাঝেই আমার কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দেখা দেয়।

সীতাকে সেদিন রাতের অন্ধকারে এবং হ্যারিকেনের অস্বচ্ছ আলোয় দেখেছিলাম, এবং দেখে বুঝেছিলাম—সীতা সুন্দরী, ওর দেহবিন্যাসে পুরুষ আকর্ষণের অনেক কারণ আছে। আজ দিনের আলোয় সেই কথাটাই দ্বিতীয়বার যাচাই করে নিলাম। সীতা সুন্দরী এ বিষয়ে আমার কোনও দ্বিমত নেই, তবু ওকে দেখে মনে হয় ও যেন হাজার জোনাকি পোকার মধ্যে রঙিন একটা প্রজাপতি। রাতের সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ এখন অনেকটা নির্বাপিত দীপশিখার মতো। এত অন্ধকার কেন এই সুশ্রী, লাবণ্যমণ্ডিত

মুখে ছড়িয়ে রয়েছে? এই অন্ধকারের চিত্রপট কি ক্লান্তিজনিত নাকি হৃদয়চিরে উঠে আসা দুঃখের শিলালিপি। এমন, করুণামাখা মুখ কেন বিষাদের কালিমায় ছয়লাপ? যারা হাসতে পারে, যারা হাসলে পৃথিবীর আয়ু বেড়ে যায়, পৃথিবী সুন্দর হয়, এবং সেই সুন্দরতা মেখে নিয়ে অন্যেরা আয়ুষ্মান হতে পারে—তারা যদি সহসা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তাহলে নদীর জোয়ার থেমে যায়, কোকিল ডাকতে ভুলে যায়, ফুল সুগন্ধ বিতরণে অক্ষম হয়। আমি একথা সীতাকে বলতে পারি না। বললে একটু বাড়াবাড়ি শোনায়। আমাদের পাশে বৌদি আছেন, তিনি এমন উচ্ছ্বসিত কথা শুনলে আমাকে ভুল বুঝতে পারেন এই ভেবে আমি মুখে কুলুপ আঁটলাম।

বাস আসতে তখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকি ছিল, বাস স্ট্যাণ্ডের মাইকে এমন ঘোষণা ভেসে এলে সীতাকে দেখলাম বেশ চিন্তিত। ও আর সাহস করে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না, হয়তো যা বলা উচিত নয় তা বলে ফেলেছে মুখ ফসকে কিংবা গোপন উত্তেজনায়। বৌদিও বাস বিলম্বে আসার কারণে চিন্তিত। কেননা মেন রাস্তায় নেমে তাদের আবার হাঁটা পথে যেতে হবে অনেক দূর। সঙ্গে কোনও পুরুষ মানুষ নেই তাই অতটা নির্জন পথ একা যাওয়াই দুশ্চিন্তার। তবু, বৌদি রীতিমতন সাহসী। নাহলে, বারাসত থেকে এতদূরে সোমত্ত মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসা কি মুখের কথা!

সেই কখন ট্রেন থেকে নেমে রিক্শা ধরে এখানে এসেছেন, তারপর হয়তো বাসের অপেক্ষায় চা-ও খাওয়া হয়নি। আমি এতক্ষণ এই দিকটা বিস্মৃত হয়েছিলাম। খেয়াল হতে নিজেরই খারাপ লাগল। বৌদি শুকনো চোখে তাকিয়ে ছিলেন ইতস্তত জল জমা শান বাঁধানো মাঠটার দিকে। সীতাও বিবর্ণ মুখে বাতিল ব্যাগটা হাতে নিয়ে উদাস হয়ে কী যেন ভাবছিল। আমি সীতাকে বললাম, তোমার হাতের ব্যাগটা দাও। অনেকক্ষণ ধরে আছ, তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে?

সীতা স্মিত হাসল, না কষ্টের কী আছে? এতক্ষণ বইতে বইতে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তবু আমি জোর করে ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিলাম। সীতাও আর বাধা দিল না, স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিল। ব্যাগটা নেওয়ার সময় ওর হাতের স্পর্শে আমি কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে সীতার দিকে তাকালাম, দেখলাম সীতার ভেতরেও কেমন একটা দুরু দুরু ভাব। ও আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে বলল, আমার গলাটা বড্ড শুকিয়ে আসছে, এখানে কি একটু জল পাওয়া যাবে না?

বৌদি সীতার পাশে সরে এসে গায়ে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কী রে, তোর কী শরীর খারাপ লাগছে?

সীতা শুকনো ঢোক গিলে ম্লান মুখে বলল, না মা, আমি ভাল আছি।

হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা আবার বাস স্ট্যাণ্ডে ফিরে এলাম। তখন আকাশ জুড়ে ভয়াল দৈত্য মেঘের যাতায়াত ; চকিতে আলোর ঝলকানি তুলে গর্জে উঠছিল বিদ্যুৎ। যে কোনও সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে এমন আশঙ্কায় সেই অশুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমরা। সীতাকে দেখলাম বেশ চিন্তায় পড়েছে, ও হাতের চুড়িগুলো বারবার নেড়ে-চেড়ে নিজেকে সুস্থির রাখার চেষ্টা করছিল। আর চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভীত হয়ে পড়ছিল। আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, আজ তোমরা আমার এখানে থেকে যাও। কাল আকাশ পরিষ্কার হলে বাসে তুলে দেব।

বৌদি বেশ সমস্যায় পড়েছেন তা ওনার মুখ দেখলেই অনুমান করা যায়। সীতা কী সব ভাবছিল, তার মুখে কোনও কথা নেই। এমন সময় বাস এবং বৃষ্টি এল হুড়মুড়িয়ে। সীতা আমার দিকে তাকিয়ে কেমন নিস্তেজ স্বরে বলল, একটা কথা বলব রাখবেন ?

আমি বললাম, বল।

সীতা তার কাজলঘন ডাগর চোখ তুলে আমাকে আগাগোড়া দেখল। তারপর গলায় দাবি প্রতিষ্ঠা করে বলল, এই অবস্থায় মায়ের সঙ্গে যেতে ভয় হয়। মেন রোডে নেমে অতোটা পথ অন্ধকারে যাবো কী করে? আপনি যদি সঙ্গে যেতেন তাহলে খুব ভাল হত। নাহলে কপালে যে কী আছে কে জানে!

বৌদি আমার মুখের দিকে ইতিবাচক কিছু শোনার জন্য তাকালেন। সীতাও তাকিয়ে থাকল সেই একই ভঙ্গিমায়।

আমি ইতস্তত স্বরে বললাম, আমার যে কাল সকালে অফিস আছে। এবার সীতা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এল আমার পাশে। হয়তো আমার চোখে যাওয়ার একটা সামান্য ইঙ্গিত দেখতে পেয়ে সে বলল, ভোর থেকে উঠে রান্না করে দেব, আপনি খেয়ে-দেয়ে সকালের বাস ধরে চলে আসবেন। শুধু তো একটা রাতের ব্যাপার। বাবা আপনাকে সাইকেলে মেন রোড অব্দি পৌঁছে দেবে। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না।

সীতা যখন কথা বলে এক অদৃশ্য শক্তি বুঝি ওর ভেতরে কাজ করে। আমি কেমন বিমোহিত হয়ে গেলাম ওর কথায়। সাপ বিনুনী চুলটা ও বুকের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে পিঠের উপর ফেলল। আমি তখনও ভাবছি যাব কী যাব না!

বৃষ্টি নামল হুড়মুড়িয়ে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাসও এল তার কিছু পরে। সীতা তার ছোট্ট রুমাল দিয়ে জায়গা রেখেছে জানলার ধারে। আমাকে হাতের ইশারায় ডাকল, উঠে আসুন।

আমি আগুন পোকার মতো এগিয়ে গেলাম। তখনো অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে।



পনেরো

রাতটা অভয়বাবুর বাড়িতে কাটিয়ে সকাল দশটার মধ্যে রেল কলোনিতে ফিরে এলাম, তখনও আকাশ বহুমূত্র রোগীর মতো চিরিক চিরিক ঢালছে, আমাদের মেসবাড়ির সামনের পাহাড়টায় ভেড়ার লোমের চেয়েও গুচ্ছ গুচ্ছ, দলা দলা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছিল মেমসাহেবদের স্পর্ধিত তন্বী শরীর নাচিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মতো। আকাশের মতো আমার মনটাও বিভিন্ন কারণে ভারাক্রান্ত, অপমান আর নীরব অভিমানের নীলস্রোতটা আমার বুকে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে। মেন রোডে এসে আমার মনে হয়েছিল হঠাৎ করে সীতার যাদুকরী কথার ফাঁদে পা না দিলেই আমার পক্ষে ভাল হত। বাস চলতে শুরু করেছিল। বাসে আমি আর সীতা পাশাপাশি বসেছিলাম, ওর অনাঘ্রাণিত দেহকুসুমের সুগন্ধ কামিনী ফুলের বাগানের সুগন্ধময়তা আমার তৃষিত মনটাকে বিমোহিত করেছিল, আমি অব্যক্ত চাহনিতে অত কাছ থেকেও সীতাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম। সীতা ছিল কিছুটা উদভ্রান্ত আর বেপরোয়া। সে আমার কাছে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সরে এসে উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো দেখাচ্ছিল গাইডের মতো। বিহারের এই অঞ্চলের পাহাড় ধরিত্রী মায়ের কোমল শরীরে বিসদৃশ আবের মতো, অথচ সেই উঁচু পাথর-ভূমির দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপিত হচ্ছিল বারবার। সীতার চুলের স্পর্শে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম, ওর টুকরো হাসি মাখানো কথাবার্তাতে আমি যেন সুগভীর প্রাণের স্পন্দন টের পাচ্ছিলাম। বাস যখন অরণ্যভূমির বুক চিরে সভ্যতার দ্রুতগামী রথের মতো সমুখে অগ্রসর হচ্ছিল তখন ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে, চোখ বন্ধ করে সীতা চুপচাপ পড়েছিল, যেন আমি পাশে আছি, ওর কোনও ভয় নেই এমন নিগূঢ় আস্থা। মেয়েরা, বিশেষত পূর্ণবয়স্কা কোনও যুবতী যদি আমার পাশে থাকে তাহলে তাদের তৃপ্ত নিঃশ্বাস প্রবাহে আমার বুক কেমন আনচান করে, আমি কিছুতেই সহজ হতে পারি না, সহজ হতে গিয়ে শীতের পাতাঝরা গাছের মতো আপাত

নিষ্প্রাণ হয়ে যাই। সীতা আমার এই অস্বস্তিকর মনোভাবকে ধরতে পারেনি, আর পারেনি বলেই সে ছিল হাওয়ায় দোলা সজনে পাতার চেয়েও ছন্দময়ী, আপন গতিধারায় মত্ত এক বুনো নদী। আমি মরুভূমি হলেও সে আমাকে তার দেহ তরঙ্গের নানা কলাকৌশলে, অদ্ভুত শারীরিক উন্মাদনায় ভিজিয়ে দিচ্ছিল। বৃষ্টির পরে পাহাড়দের যেমন শান্ত আর গোবেচারা দেখায় সীতা আদৌ তেমন ছিল না, বরং সে ছিল উলটো, বেগবতী হাওয়ার মতো, শাখা-প্রশাখায় দোলা ওঠা মালতীলতার মতো। আমি ভুল করেও তার শরীরে ইচ্ছাকৃত কোনও জৈবিক স্পর্শ দিইনি, কেননা মেয়েদের পাশে ঘনিষ্ঠভাবে বসলেই তাদের দেহ সুষমার আদি সুগন্ধই আমাকে ঐশ্বরিক আমেজে ডুবিয়ে দেয়। বড় রাস্তায় যখন বাস থেমেছিল তখন সন্ধের শুরু, নদীর জলে রঙের খেলা ছিল না, গোমড়া মুখে আকাশটা তেঁতুল গাছের ঘন পাতার আড়ালে অন্ধকারটুকু অঙ্গে মেখে রীতিমতন ভীতিপ্রদ হয়ে উঠছিল। বৃষ্টি ঝরছিল সবেগে, হাওয়ায় এলোমেলো বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল মোটা-মোটা বৃষ্টির দানা। এমন অপ্রতিকূল অবস্থায় গ্রামের পথে হেঁটে যাওয়াই দুরূহ। আমরা তিনজনে চড়ুই ভেজা হয়ে একটা মহুয়া গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলাম প্রায় ঘন্টাখানেক। কিন্তু মহুয়া গাছের আশ্রয় ফুটো ছাতারতলায় দাঁড়ানোর চেয়েও বিরক্তিকর, কোনওমতে মাথাটা বাঁচলেও আমরা ভিজে গিয়েছিলাম অত্যন্ত বাজেভাবে। সীতা পড়েছিল সিনথেটিক হালকা প্রিন্টের শাড়ি, জল তাকে স্বচ্ছ করেছিল আরও। আর সেই স্বচ্ছতা আদিম নেশায় ভরিয়ে তুলেছিল মনকে। আমি সীতাকে নয়, সীতার যাবতীয় গোপন ঐশ্বর্যকে মণিময় সাপিনীর মতো হিসহিসিয়ে উঠতে দেখেছিলাম চকিত বিদ্যুৎ-এর আলোয়। যা আমার অদেখা, যা আমার স্বপ্নের জগতে তাকে দু-চোখের সামনে উদ্ভাসিত দেখে রক্ত মাংসের মনটা চাপা অন্তরক্ষায় উত্তেজনার জ্বরে রোগীর মতো ধুঁকছিল। লাল মাটি কাদায় সীতা হাঁটছিল আমার পাশাপাশি, ওর ভেজা আঁচল ভালবাসার পোস্টারের মতো অনেক সময় লেপটে যাচ্ছিল গায়ে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে সীতার গভীর, আত্মপ্রত্যয়ী চোখ দুটোকে দেখছিলাম গভীর তন্ময়তায়। ওর চোখ দুটো যতদূর মনে পড়ে স্বাভাবিক ছিল না। যদিও শীতের রাত নয়, বর্ষার শীতলতম রাত—তবু দু-জনের দেহ নিঃসৃত তাপে কিছুতেই হিম-আর্দ্র অনুভূতিতে ঝিমিয়ে যাইনি আমরা। লাল মাটির কাদায় আমার সাদা পায়জামায় হোলির রঙ, আর সীতার সেই সিনথেটিক শাড়িটা, তার কথা আর বললাম না, তা বড় বিশ্রী দেখাচ্ছিল, যা বড় মেয়েদেরকে বিব্রত করে তেমনই কিছু একটা। ফলত, কৃত্রিম অভিমানে ঈষৎ কম্পমান সীতার ঠোঁট দুটো অপরিপক্ক আতা ফুলের মতো ঈষৎ ফাঁক। এক নিগূঢ় আবেদন

তার ভেতর লুকানো ছিল যা প্রত্যক্ষ করে বুকের রক্ত 'ছলাক' দিয়ে উঠেছিল আমার। অন্ধকার যে মানুষের কত সর্বনাশ করে সেদিন আমি টের পাই। অন্ধকারে আমরা তিনজন মানুষ পাশাপাশি হেঁটেও কেউ কাউকে চিনতে পারিনি। পাহাড়ি পথ মসৃণ নয়, বরং হাড় জাগানো কোনও প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কালের মতো। ফলে, বারবার হোঁচট খাচ্ছিলাম আমরা। সীতা বাহাদুরি দেখিয়ে হাঁটতে গিয়ে পাথরখণ্ডে হোঁচট খেয়ে হাঁটু মুড়ে যন্ত্রণাময় শরীরে এক সময় বসে পড়ল মাঝ পথে। আমি তাকে অস্ফুটে ডাকলাম, সীতা—সীতা! সে উঠল না। বউদি তখন হেঁটে গিয়েছেন হাত পনেরো দূরে। আমি সীতার আর্তি মাখানো চোখের দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম নিভৃতে, রক্ত তখন তোলপাড়, ভাসমান মেঘের চেয়েও মন আমার উড়ুউড়ু। বাতাসে কোথা থেকে ভেসে এল ফুলের গন্ধ, বাতাসের শিসে আমি শুনতে পেলাম আগত বর্ষার চিরকালীন সেই সুর। সীতা বসেই আছে, ভ্রুক্ষেপহীন তার চাহনি। অথচ স্বপ্নিল, রঙিন, হাওয়া লাগা আমলকি বনের মতো কম্পমান। সে গাছের নিস্তব্ধ ভাষায় কথা বলে উঠল, আমাকে একটু টেনে তুলুন। আমি আর একলা দাঁড়াতে পারছি না—তার কথায় সেই যাদুটোনা, বর্ণময় আহ্বান, আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম, শুধু হাত বাড়ানো নয়—আমি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে শক্ত করে ওর হাতটা চেপে ধরলাম। আমার মনে হল, আমার পায়ে যে রাঙামাটির কাদা লেগেছে তা যেন স্বর্গের অমৃত সুধা, আর আমি যার হাত ধরে আছি সে কোনও নারীর নয়, পুরুষ সম্মোহনকারী কোনও লতার।

পথ কথাতেই ছোট হয়ে আসে। সীতাকে আমি শুধিয়েছিলাম, ভালবাসা কাকে বলে তুমি জানো? সীতার সেই বক্র হাসি আমার এখনও মনে পড়ে, সে নিতান্ত অবলীলায় ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল. এই যে বৃষ্টিপাত ভালবাসা অনেকটা এই রকম। পাহাড় ভিজে যায়, মনও ভিজে যায়। ভালবাসা অনেকটা এই রকম।

ওর কথার তাৎপর্য আমার বোধগম্য হয়নি, অবুঝের মতো তাই ওকে শুধিয়েছিলাম সকালে যে প্রখর রোদ উঠবে, তাতে পাহাড় পুড়বে—মনও পুড়বে, এই পোড়াটি কি তাহলে ভালবাসার কোনও অঙ্গও নয়?

আমি জানি না। স্মিত হেসে আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছিল সীতা।

সে রাতে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় আমি ওদের ছোট টালির ঘরটায় শুয়ে আছি। বৃষ্টির আত্মহত্যার শীৎকার আমার কানে আসে। আর প্রতি-মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠি। বাইরে নিমপাতার কাঁপুনি। মধ্য বয়স্ক পাতার স্নেহছায়ায় থোকা থোকা আঙুর ফলের মতো নিমফল খসে পড়ে টালির ছাদে। ঠিক জলতরঙ্গ নয়, অনাবিষ্কৃত কোনও বাজনার মতো সেই

শব্দ আমাকে বিবশ করে রাখে। ঠিক তখন সীতা আসে, তার হাতে পেনকিলারের ট্যাবলেট। হলদে হয়ে যাওয়া সেই ট্যাবলেট আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, এটা খেয়ে নিন। আমি মশারি টাঙিয়ে দিচ্ছি—যা মশা, নাহলে আপনি ঘুমোতে পারবেন না।

আমি সীতার দিকে হা-মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকি, এই মেয়েটাই আমাকে তৃষ্ণার জল দিয়েছিল, আমাকে এখানে আসার জন্য মাত্রাতিরিক্ত পীড়াপীড়ি করেছিল। তবে এর চোখে কি অন্য ভাষা লুকানো আছে, যে ভাষার গুঞ্জনে ভ্রমর ফুলের কাছে তাড়িত হয় সেই শাশ্বত নিয়মে। সীতা মশারি টাঙিয়ে দিল, ওর গোড়ালি জড়িয়ে শুয়ে থাকা রুপোর তোড়াটা তখন কি সুন্দরই না দেখাল আমার চোখে। আমি আর নিজের উচ্ছ্বসিত আবেগকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে পারলাম না, উত্তেজনায় রক্তিম স্বরে বললাম, সীতা, এই সীতা—

সীতা আঙুল কামড়ে সোনালী পাখির মতো আমার দিকে তাকাল। আমি পুরুষ মাকড়শার মতো ভালবাসার অন্তর্নিগত লালা ঝরিয়ে সংসার কল্পজগতের জাল বুনে চলেছি, আর সেই জালে একটি স্ত্রী-মাকড়শা, অর্থাৎ সীতা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেমন আঙিনায় সেদ্ধ ধান ছড়িয়ে তৎপর হাতে কোনও সুগৃহিনী পাখি তাড়ায়, সীতাকে বসতে বললাম আমার পাশে। সে বসল সরস্বতীর কায়দায়, চেয়ে থাকল ফুল-লতা-পাতা আঁকা গোবর ছড়া দেওয়া দেওয়ালের দিকে। ঘন ঘন শ্বাস নেওয়াতে ওর বুক দুটো দ্রুত উঠছিল, নামছিল, যেন জোয়ার এসেছে ওর শরীরে—আর সেই জোয়ারের তোড়ে ভেসে আসা পাখির ছানার মতো হঠাৎ কিনারা পেয়ে ও আমার বুকে সঁপে দেবে পরম নির্ভরতায়। কিন্তু সীতা তা করল না। চুপচাপ পা ঝুলিয়ে বসে সে আমার আবেগ ফুটন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃসংকোচে শুধোল, আপনার সেই বন্ধুটা কেমন আছে? তারপর সে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে কপাল টিপে চোখ বুজে পড়ে থাকলাম, আমার অভিমান সম্পৃক্ত মনে সীতা যেন কঠিন কথার হাতুড়ি দিয়ে পেরেক গেঁথে দিয়েছে অজান্তে। হঠাৎ এই মুহূর্তে বটুর প্রসঙ্গ আসায় আমি খুশি হলাম না। তেতো ঢোঁক গিলে বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকলাম চুপচাপ। সীতা খুব ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল খুব মাথা ধরেছে? কিছু মনে না করলে মাথাটা কি একটু টিপে দিতে পারি?

সীতা সেই অগ্নি উৎপাদক, জীবনদায়ী উচ্ছ্বাস কোথায় হারিয়ে ফেলল? ওর চোখে সারাদিনের ক্লান্তিজনিত ঝিমুনি। ঘুমে জড়িয়ে আসছিল চোখ। তবু, ওর মোলায়েম করতল পদ্ম ফুলের মতো শুয়ে থাকল আমার কপালে। আবেশে চোখ বুজে এল আমার, খোলা জানলা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এল ভেজা হাওয়া, আমি কেঁপে উঠলাম, আমার আড়ষ্ট হাত বাড়িয়ে কোনও

মতে ছুঁয়ে দিলাম ওর শিমুলে তুলো নরম হাত। সীতা আমার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে চুপ করে থাকল। তার এই মৌনতা সম্মতির। ঝড় হয়ে ভরিয়ে তুলল বুকের বাতাস। আমি খুব ভীতু গলায় শুধোলাম,—আমাকে কি তোমার খুব স্বার্থপর মনে হয়?

সীতা মলিন হাসল, আমরা সবাই তো কম বেশি স্বার্থপর। তারপর সে উঠে দাঁড়াল, হাই তুলে ঘুম তাড়িয়ে বলল, শুয়ে পড়ুন, আপনাকে খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। আমি মরিয়া হয়ে বললাম, পরিশ্রান্ত হলেও আজ তোমার সঙ্গে কতগুলো জরুরি কথাবার্তা সেরে নেওয়া প্রয়োজন। তুমি কি আর আধঘণ্টা আমার জন্য সময় দিতে পারবে?

সীতা আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসল। পা দোলাতে দোলাতে সে আমাকে বলল, বলুন, কী বলবেন বলছিলেন?

আমি অনেক ভেবে বললাম, তোমার বিয়ের ব্যাপারে দু-চারটে কথা বলতে চাই। আলোচনায় বসতে তোমার কী আপত্তি আছে?

সীতা এবারও হাসল, আপত্তির কী আছে, বলুন।

আমার প্রথম প্রশ্ন, তোমার কি ধরনের ছেলে পছন্দ?

সীতা খোঁচা মারা গলায় বলল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? আমার জন্য কি কোনও পাত্র ঠিক করেছেন?

হ্যাঁ, একজনকে মনে মনে ভেবে রেখেছি। তুমি যদি সাহস দাও তো বলি।

সীতা হা-হা করে হাসল, এই পোড়া কপালে বর জুটেছে তাহলে? বাবা তো ভেবে-ভেবেই অস্থির। মা-ও কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে আমার চিন্তায়। যাক, বাঁচা গেল তাহলে। সীতা হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্তির শ্বাস নিল।

আমি বলি বলি করেও নিজের কথাটা বলতে পারলাম না। ভাবলাম, যাওয়ার আগে অভয়বাবুকে বিয়ের প্রস্তাবটা নিজের মুখেই দিয়েই যাব। আমাকে নিশ্চয়ই ওদের কারোর অপছন্দ হবে না। ভদ্রলোককে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে পেলে একদিক দিয়ে আমি লাভবান হব। ভেবে দেখেছি, ওরা গরিব কিন্তু মনের দিক থেকে ওরা প্রত্যেকেই আকাশ-ছোঁয়া, বিস্তৃত প্রান্তরের মতো খোলা মনের মানুষ। আমি তো অর্থ চাই না— বৃহৎ মনের মানুষ চাই। সীতা চলে যাওয়ার পর আমি ডাইরির পাতা ছিঁড়ে বাড়ির ঠিকানাটা যত্ন করে লিখলাম। অভয়বাবুকে বলব বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আর আমিও মেসে ফিরে রেজিস্ট্রি ডাকে একটা চিঠি দেব বাড়িতে। সব কিছু বুঝিয়ে লিখতে হবে, না হলে বাড়ির লোকে আমাকে ভুল বুঝতে পারে।

বাতি নিভিয়ে আমি ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম এল না, সুখ

চিন্তায় ঘুম ভিন্নদেশের যাত্রী হয়েছে। বাইরে তখন অবিরাম বর্ষণের শব্দ। ব্যাঙ ডাকছিল, সেই ছন্দোবদ্ধ সম্মিলিত শব্দের অনুরণন আমার কানে সানাইয়ের সুরের ঝংকারে প্রতিফলিত হল। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা সঙ্গীত আমাকে কিছুতেই আর ঘুমাতে দিল না। এই নিথর, শব্দময় রাত্রিতে সীতার ঘরে আমি জেগে আছি, বাইরে জল পড়ার শব্দ। দেওয়ালে বুক চেপে টিকটিকিটা আর্তনাদের মতো ডেকে উঠতেই আমি হাত তুলে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু টিকটিকিটা ভয়ার্ত চোখ নিয়ে কোথায় যে আত্মগোপন করল আমি তাকে আর খুঁজে পেলাম না। এই ঘরে ঘুন ধরা ছোট একটা আলনা ছিল যাতে শোভা পাচ্ছিল সীতার ব্যবহৃত পোশাক-আশাক। আমি হ্যারিকেনের সলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে এক নৃশংস উত্তেজনায় টিকটিকিটাকে খোঁজার জন্য মরিয়া হয়ে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। যত খুঁজি ততই সীতা আমার চোখে উদ্ভাসিত ভোরের মতো ধরা দেয়। সেই অনাগত আলোক ধারায় আমি যেন প্লাবিত হয়ে যাই। এ ঘরের প্রত্যেকটা জিনিসে সীতার শরীরের অনাঘ্রাণিত সুগন্ধ মিশে আছে। আমি সব ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখি। এই বর্ষণ মুখর রাতে এক পাগল সত্তা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ঘরের আনাচে-কানাচে আমি আমার হাতের স্পর্শ দিই, লাফ দিয়ে পেড়ে আনি সীতার কাঁচ বাঁধানো ফটোটা। ব্যাকুল চোখে দেখি। আমার মন ভরে ওঠে। সীতা যে আমাকে ভালবাসে এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। সীতা আমার হৃদয় আকাশে এক মাত্র চাঁদ। তার ঝরনা স্বচ্ছ আলোয় আমি আমার সংসার পাতব, আমাদের ছোট্ট উঠোনে হামা দেবে সীতার গর্ভের সন্তান। সেই কাঁচ বাঁধানো ফটো আমি বুকে চেপে ধরে আদর করি, ধুলো জমা কাঁচে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান ভুলে ঠোঁট ছোঁয়াই। এইভাবে চলতে থাকে অনেকক্ষণ। বাইরে বৃষ্টিপাত থামে না। এক সময় আমি সীতার যত্নে গুছিয়ে রাখা বইয়ের আলমারিটার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ি। আলমারির ডালা খুলে বের করে আনি বই-খাতা। যেন এসবের মধ্যেই সীতাকে আমি খুঁজে পাব এমন সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। হঠাৎ বই-পত্রের মধ্যে থেকে একটা পুরনো ডাইরি আমার পায়ের কাছে ছিটকে পড়ে। আমি আগ্রহ ভরে ওটা দু-হাত বাড়িয়ে তুলে নিই। চার বছর আগেকার পুরনো ডাইরি। পাতাগুলো লালচে হয়ে এসেছে বয়সে। তাতে যত্ন নিয়ে প্রচলিত আধুনিক গান লেখা। সম্ভবত রেডিও থেকে শুনে-শুনে। কোথাও কাটাকাটি, দ্রুত লেখার ঝোঁক, কোথাও বা ভুলভ্রান্তি। কোথাও বা সাংসারিক কথা-বার্তা লেখা। কবে, কী কারণে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে মন খারাপ হয়েছিল— সে কথাও বেশ গুছিয়ে ডাইরির পাতায় লেখা আছে। ডাইরির মাঝামাঝি এসে আমাকে থামতে হল। এখানে হাতের লেখা বেশ ছোট-ছোট।

কোনও এক আদিবাসী যুবক সীতার কাছে হাস্যকরভাবে প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছিল সে কথা লেখা আছে। মহুয়া ফুলের মালাটা ছিঁড়ে ফেলে সীতা তাকে ঠাস করে একটা চড় মেরেছিল। এইভাবে আমার ডাইরি পড়ার আগ্রহটা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। সীতাকে আমি নতুন রূপে আবিষ্কার করে চমৎকৃত হই। ডাইরির একদম শেষের দিকে এসে আমি আবার থমকে দাঁড়াই। মন দুলে ওঠে উত্তেজনায়। এই ডাইরিতে বিক্ষিপ্ত-ভাবে এক গ্রাম্য কায়দায় সীতা তার জীবনের মূল, নাড়া দেওয়া ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়া লিখে রেখেছে। কোন ধারাবাহিকতা নেই, কেবল লেখা। মহাপুরুষদের কতগুলো ভাল ভাল কোটেশন আছে। বেশির ভাগ কোটেশনগুলো নর-নারীর প্রেম সম্পর্কিত। আমার একটা ধারণা ভেঙে গেল। আমি সীতাকে যতটা অজ্ঞ সাধাসিদে এবং সরল মনের ভেবেছিলাম—সে বাস্তবিক ততোটা নয়। ডাইরির শেষ পাতায় চোখ এনে আমি সাপের গায়ে পা দেওয়ার মতো চমকে উঠলাম। ডট পেনে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা আছে, 'সীতা নামের মেয়েরা জনম দুঃখী। তাদের কপালে সুখ বিধাতা লেখেনি।' শুধু এই বাক্য দুটি ছাড়া পুরো পৃষ্ঠাটা ফাঁকা। তারপর আর গোটা দশ-বারো পাতা ছিল। তারই একটাতে লেখা: সে আমাকে এমনভাবে দেখছিল যাতে করে আমি খুব লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে ইতিপূর্বে কেউ দীর্ঘ সময় ধরে এত নিবিড়ভাবে দেখেনি। আমি চারা আমড়াগাছের তলা থেকে পালিয়ে যেতে গিয়েও পালিয়ে যেতে পারিনি। আমার খুব শীত করছিল। সেই সঙ্গে ভয়ও করছিল। আমি যদি চোখ নামিয়ে নিতাম তাহলে আমার হার হত। সেই আদিবাসী ছেলেটার মতো এই ছেলেটা এত উগ্র নয়, ওর মুখটা আমি এ গ্রামের কারোর সঙ্গে মেলাতে পারিনি। ভগবান জানে, কেন যে ওর সঙ্গে আমার সন্ধেবেলায় দেখা হল। দেখা না হলেই মনে হয় ভাল হত। ঘরে ফিরে এসে আমি একটুও স্বস্তি পাইনি। শুধু ভয় করেছে। ছেলেটা যদি এসে পড়ে তাহলে মুখ দেখব কী করে? এই অব্দি পড়ে আমি আমার কপালের ঘাম মুছে নিয়ে পরের পৃষ্ঠা উল্টালাম। সীতা লিখেছে: ওরা সত্যি সত্যি এল। ওরা যে সিগরেট কেনার নাম করে বাবার সঙ্গে গল্প করবে—এটাও আমার কাছে স্বপ্নের মতো। আমি দরজার আড়াল থেকে ওকে লুকিয়ে দেখেছি। এমন শান্ত, নিরীহ মুখ আমি কি এর আগে কখনও দেখেছি? ওরা যখন চলে গেল আমি অন্ধকারেও অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম· আমার খুব কান্না পাচ্ছিল তখন।

এর পরের পৃষ্ঠায় আমার সম্বন্ধে কয়েকটা কড়া বিরূপ মন্তব্য লেখা আছে: মাখনবাবু বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। ওনার চোখের চাহনি

দেখে আমি বুঝে নিয়েছি, লোক সুবিধের নয়। বাবা কেন যে ওনাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছিল—, আমার ঠিক মাথায় ঢুকছিল না!

তারপরের ফাঁকা পৃষ্ঠাতে লেখা—তার নাম 'বটু'। ডাক নামটা শুধু জানা হল, কিন্তু ভাল নামটা জানা হল না। তারপরের একটা গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে 'বটু-বটু' লেখা!

আমার হাত থেকে ডাইরিটা খসে পড়ল, কপালের ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম আমাকে জ্বালাতন করে মারল। সীতার মুখটা ক্রমশ ধোঁয়াটে দেখাচ্ছিল। তখন পরাজিত মানুষের মতো ধুঁকতে-ধুঁকতে আমি বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। নিজের এই স্বেচ্ছা অধঃপতনের জন্য আমি কাউকে দায়ী করতে পারলাম না। বটু আমাকে হারিয়ে দিয়েছে, আমি সীতার কাছে হেরে গিয়েছি—এই সত্যে উপনীত হয়ে আমি আমার ঘেমো কপালটা টিপে ধরলাম দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। আমার আর ঘুম এল না। যে স্বপ্নের ডানায় ভর করে আমি এতক্ষণ হাওয়ায় ভাসছিলাম, সেই স্বপ্নের পাখিটা মুখ থুবড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে, আমি তার ফেনিল মুখ আর যন্ত্রণার করুণ গোঙানি শুনতে পাচ্ছিলাম। সীতাকে আমি হৃদয় দিয়ে যতটুকু বুঝেছিলাম, সে বোঝায় ভুল ছিল, বিরাট এক ধসের মুখে আমি স্বপ্নের ইমারত গড়তে চেয়েছিলাম। আঘাতটা একদম শুরুতে হাওয়াতে আমি যে করেই হোক নিজেকে ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনব। সীতা তো জানল না আমি তার মনের কথা জেনেছি! যদি সে জানত আমি ওর গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জেনে ফেলেছি তাহলে আর কোনওদিন মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারতাম না। সেটা হত আমার চরম পরাজয়। এখন আমি হারলেও মাথা উঁচু করে হেরেছি, সব দিক অক্ষত রেখে হেরেছি।

ভোরবেলায় চা-বিস্কুট খেয়ে আমি আর সময় ব্যয় না করে বেরিয়ে পড়লাম। অত সকালে সীতার স্নান সারা, ওকে শিশির ধৌত হেমন্তের ধানগাছের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। সারা মুখে প্রাতঃকালীন প্রসন্নতা, ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলল, আপনি এখনই চলে যাবেন, মা বলছিল খেয়ে যাওয়ার জন্য।

আমি ওকে বললাম, রাতে যা খেয়েছি তা এখনও হজম হয়নি। আমি তো আবার আসব। তখন যত ইচ্ছে খাইও।

ঠিকানা লেখা চিরকুটটা তখন আমার বুক পকেটে, বিষাক্ত কোনও সাদা পোকার মতো আমাকে দংশন করছিল। চিরকুট বের করে এনে আমি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম, তারপর হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে মোহমুক্ত চোখে সীতার দিকে তাকালাম।

সীতা খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেন যে, কী লেখা ছিল ওতে ?

আমি বেদনা হজম করে বললাম, বাড়ির ঠিকানা। ভেবেছিলাম—দিয়ে যাব তোমাদের। কিন্তু ওটার আর এখন কোন প্রয়োজন নেই।

সীতা না বুঝেই হা-করে আমার মুখের দিকে তাকাল, ও কী বুঝল জানি না তবে ওকে খুব শুকনো এবং বিমর্ষ দেখাল। ওর ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গিয়ে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল কপালে। অভয়বাবু কী একটা কাজে দোকানঘরে ঢুকে যেতেই আমি নিচু স্বরে সীতাকে বললাম, কাল রাতে তোমাকে বিয়ের কথা বলেছিলাম—তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই। আমি যে পাত্রের কথা ভেবে রেখেছি তাকে নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ হবে ?

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল সীতার মুখ, তবু সে অস্ফুটে বলল, আপনার পছন্দের পাত্রটি কে, আমি কি তাকে দেখেছি ?

আমি ঘাড় নেড়ে ওকে অভয় দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, সে তোমার খুব জানা-শোনা। এমন ভাল ছেলে আজকালকার দিনে খুবই কম পাওয়া যায়। বটুর সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি খুব সুখী হবে। আমি আজই গিয়ে বটুকে সব বলব। তোমার মতো স্ত্রী পাওয়া তার কাছে তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।

সীতা দেখি টিপ্ করে আমাকে প্রণাম করল। ওর চোখ দুটো জলে ভেজা, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছিল, আমার নাম তো সীতা! আমার কপালে কি সুখ আছে ?



ষোল

মেসে ফিরছিলাম, হাসান মাস্টারের সঙ্গে দেখা হল করাত কলের কাছে। দুশ্চিন্তায় ভদ্রলোককে শুকনো কাঠির মতো দেখাচ্ছিল; মাথার চুল যেন জংলি পাখির বাসা, মুখটা তামাটে দেখাচ্ছিল দুর্ভাবনায়। গায়ের জামা-কাপড় নোংরা, কোঁচকানো আমাকে দেখে তিনি যেন ভরসা পেলেন এমন চোখে তাকালেন।

বাস স্ট্যান্ডে নেমে আমারও মাথার ঠিক ছিল না, অপমানে দগ্ধে যাচ্ছিল ভেতরটা। তার উপরে সারাক্ষণ টিপ-টিপানো বৃষ্টি, সঙ্গে ছাতা নেই যার জন্য আমি ভিজে গিয়েছি কাক-চড়ুইয়ের মতন। রাত জাগার ধকল চোখের নিচে কালির পোঁচ দিয়েছে যথেষ্ট, দুর্ভাবনারা আমাকে কিছুতেই যেন নিষ্কৃতি দিচ্ছিল না। ভেবেছিলাম—বাস থেকে নেমে সোজা চলে যাব অফিসে, সেখানে গিয়ে তিনদিনের সি-এল লিখব শারীরিক অসুস্থতার জন্য। কিন্তু কী ভেবে সেখানেও গেলাম না। একবার ভাবলাম জংশনে ফিরে যাব বিকেলের বাসে, গিয়ে ভাল ছেলের মতো অফিসের কাজে ডুবে যাব, কেন আর অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে নিজের সুস্থ মাথা খারাপ করা। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তও আমার টলে গেল। আমি যে কী করব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না, একটু অন্যমনস্ক হলেই সীতার মুখটা ভেসে উঠছিল মনের পর্দায়। আর তখনই আমি যেন ঋণের দায়ে ডুবে যাওয়া কিংবা রক্তহীন মানুষের মতো ফ্যাকাসে ধূসর চোখ তুলে আশপাশের অবাঞ্ছিত দৃশ্য দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

মাস্টারমশাই অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ বহুদর্শী মানুষ। তিনি এক ঝলক দেখেই চিন্তিত মুখে শুধোলেন, কী হয়েছে তোমার, আজ যে বড় উন্মনা দেখছি। তারপর আমার কোঁচকানো কোঁচকানো পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি কোথাও থেকে জার্নি করে আসছ? কোথায় গিয়েছিলে? অনেকদিন তোমাকে রেল কলোনিতে দেখিনি।

আমি স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলাম, মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি এক মাসের জন্য জংশনে গিয়েছি। ওখানে একটা স্পেশাল ওয়ার্ক চলছে। কাজটা শেষ হতে মাসখানেক লাগবে। যতদিন না কাজ শেষ হয় ততদিন আমি ওখানেই থাকব।

মাস্টারমশাই শুনে আশ্বস্ত হলেন, তা ভাল, আমি ভেবেছিলাম তোমাকে হয়তো ট্রান্সফার করে দিয়েছে—তোমাদের যা বদলির চাকরি বলা তো যায় না কখন কী হয়ে যায়!

মাস্টারমশাই আমাকে নিয়ে ভাবেন এটা জেনে আমারও ভাল লাগল। এই সদাশিব মানুষটার কাছে রেল কলোনির পুরনো মানুষগুলোর কিছু না কিছু ঋণ জড়িয়ে আছে। পরোপকারী সজ্জন এই ব্যক্তিটি কখনই নিজের সুখের কথা ভাবেনি, অন্যের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে তাঁর যেন জীবন সার্থক। গত বছর পুজোর সময় মাস্টারমশাইকে আমি একটা ধুতি কিনে দিয়েছিলাম, মাস্টারমশাই হাসি মুখে তা নিয়েছিলেন আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, তোমাদের বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়। বটুটা তোমার সংস্পর্শে এসে মানুষ হয়ে গেল। আমি আর ওকে নিয়ে চিন্তা করি না। আমি জানি—বটু ভুল করলে তুমি তাকে শুধরে দেবে আর তুমি ভুল করলে বটু তোমাকে শুধরে দেবে। তোমাদের এমন সুদৃঢ় বন্ধুত্ব আজকালকার দিনে খুব কম দেখা যায়। তারপর আফসোস করে বলেছিলেন, আমার ছেলেটা তো আর মানুষ হল না, অথচ ওকে মানুষ করার জন্য আমি কম চেষ্টা করিনি! করাত কলের ঘ্যাসঘ্যাসু শব্দে হাসান মাস্টার বিরক্ত হয়ে বললেন, চল, ওই শিম গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াই। তারপর আমার উদভ্রান্ত মতিগতি আঁচ করে বললেন, তোমার তাড়া নেই তো। কী ব্যাপার সেই তখন থেকে কী ভাবছ বল তো, বাড়ির খবর সব ভাল তো?

আমি জোর করে হাসার চেষ্টা করলাম, বাড়ির খবর সব ভাল, কিন্তু আমি একটা সমস্যায় পড়েছি।

কী সমস্যা, আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলতে পার। মাস্টারমশাই তেজদীপ্ত স্বরে কথাটা শেষ করে দূরের সবুজ পাহাড়টার দিকে তাকালেন, পুরুষ মানুষ হল ওই পাহাড়ের মতো, সহজে তাকে ভেঙে পড়তে নেই, ভেঙে পড়লে গোটা জাতিটাকেই অপমান করা হয়।

আমি ভরসা পেয়ে বললাম, বটুর ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলতে চাই।

হাসান মাস্টার গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ভাবলেন, তারপর গুঁড়ো বৃষ্টিতে ভিজে থাকা কাঁচাপাকা চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে বললেন, তাহলে ওই ইস্কুলটার বারান্দায় চল। ওখানে বসে শান্তিতে শোনা যাবে। এসব সিরিয়াস কথা গাছতলায় কি মানায়?

আমরা রেল ইস্কুলের ফাঁকা বারান্দায় ছুটতে ছুটতে চলে এলাম, তখনও ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছিল, বড় রাস্তার দু-ধারে অর্জুন আর শিমুল গাছগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিল। পাহাড়টাকে এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। টানা বর্ষায় পাহাড় এখন রীতিমতন উর্বশী, কেবল হাতছানি দিয়ে ডাকে—আয় আয়। আর মেঘগুলো যেন চপলা রমণী এলো চুল শুকায় পাহাড়ের উপর বিছিয়ে।

হাসান মাস্টার দুঃখ করে বলেন, এখন আর কী দেখছ? দশ বছর আগেও এটা ছিল গভীর অরণ্যক্ষেত্র। এখন সেই জমাটবাঁধা বনভূমি কোথায়? সব ঠিকেদারের করাত আর আদিবাসীদের টাঙ্গি-কুড়ালে সাফ হয়ে গেল! যার জন্য দেখছ না, বৃষ্টি কত দেরিতে আসে! রোদের তেজ কত তীব্র। অরণ্যছায়া সরে যাওয়াতে মানুষের মন কত রুক্ষ, কর্কশ।

আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলটি এককালে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আদিপীঠ ছিল তার আভাস এখনও চোখ মেলে দেখলে বোঝা যায়। এখানকার মতো নীল আকাশ, পাহাড়-ঝরণার যৌথ সঙ্গীত এখনও কোন কোন জায়গায় বিদ্যমান। হাসান মাস্টার দাড়িতে হাত বুলিয়ে ভাবুক চেহারায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বাস্তবের মাটিতে ফিরে এসে বললেন, এসব কথা বাদ দাও। হ্যাঁ, তুমি যেন কী বলছিলে?

আমি কীভাবে কথাটা শুরু করব তারই গোড়া খুঁজতে মগ্ন ছিলাম। তার আগেই মাস্টারমশাই বললেন, বটুর ব্যাপারে কী সব বলবে বলেছিলে বল!

আমি থতমত খেয়ে বললাম, বটুর জন্য একটা মেয়ে দেখেছি। এখন আপনার অনুমতির প্রয়োজন।

মাস্টারমশাই সব না শুনেই সম্মতির হাসি হাসলেন, তুমি বটুর জন্য মেয়ে দেখেছ এতো বড় আনন্দের কথা! এতে অনুমতির কী দরকার? তারপর, কাঁচা-পাকা যত্নহীন অগোছাল দাড়িতে হাত বুলিয়ে সুতীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালেন, মেয়েটিকে কি বটু দেখেছে, ওর পছন্দ? আমি 'হ্যাঁ' বলতেই মাস্টারমশাই তার বয়স্ক মুখে যৌবনের হাসি ঝরিয়ে বললেন, এতো বড় উত্তম কথা। তা, আমি কি মেয়েটিকে একবার দেখতে পারি?

কেন পারেন না, যদি বলেন তো আজই আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। আপনি না দেখলে বটুর সেখানে কোনও মতেই বিয়ে হবে না। বিয়ের ব্যাপারে আপনিই হলেন অভিভাবক। আপনাকে বাদ দিয়ে এত বড় কাজ কোনও মতেই সুসম্পন্ন হবে না।

গর্বে বুক ভরে উঠল হাসান মাস্টারের, পরিতৃপ্তির শ্বাস ফেলে বললেন,

তা আমি জানি। ছেলেটাকে তো রেল স্টেশন থেকে আমিই তুলে এনে নিজের ঘরে জায়গা দিয়েছিলাম। তা ও অকৃতজ্ঞ নয়, এখনও দেখা হলে মাস্টারসাব বলতে অজ্ঞান। আমার নিজের ছেলের কাছে যে খাতির যত্ন পাই না, বটু আমাকে তার চেয়েও অনেক বেশি দেয়। তুমি শুনলে অবাক হবে হোমিওপ্যাথি ওষুধের পুরো দামটাই প্রতি মাসে বটু আমাকে জোর করে দিয়ে দেয়। আমি নিষেধ করলেও শোনে না। বলে, আমার তো আপনাদের আশীর্বাদে কোনও কিছুরই অভাব নেই। একটা দোকান থেকে তিনটে দোকান হয়েছে, খাপরার ঘুপচি ঘর থেকে পাকা দালান উঠেছে এখন যদি গরিব দুঃখীদের জন্য না ভাবি তাহলে কখন ভাবব।

বটুর আর্থিক স্বচ্ছলতা এখন রেল কলোনির গুণীজন মহলে বহু আলোচিত অধ্যায়। কয়েক মাসের মধ্যে বটুর ব্যবসা যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে—যা দেখে অনেকেরই চোখ টাটায়। নিন্দুকেরা বলে, বটু চা দোকানির এই বাড়-বাড়ন্ত সব সুদের পয়সায়। এমন কাঁচা পয়সা থাকবে না। মানুষের দীর্ঘশ্বাস গায়ে লাগলে পয়সার ফুটানি সব শুকিয়ে যাবে। এক শ্রেণীর লোক অন্য কথা বলে, কয়লার ভেতর বটু একতাল কাঁচা সোনা পেয়েছে। সেই সোনার ওজন কেজি খানেকের কম নয়। এবং তা সে জংশনের বড় মহাজনদের কাছে বিক্রি করে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছে। এমন কথা শুনে বটু যে দুঃখ পায় না তা নয়। আমি যতদূর সম্ভব ওকে বুঝিয়ে বলি। তাতে কিছুটা রাগ প্রশমিত হয়।

মাস্টারমশাই বলেন, বটু পরিশ্রমী ছেলে, যার শরীরে তাগত আছে তার কি কোনওদিন টাকার অভাব হয়। আমি তো বটুকে আজ এত বছর ধরে দেখছি—আজ অব্দি ওর মধ্যে কোনও দোষ দেখিনি। শুধু সুদে টাকা খাটানোর ব্যাপারে আমি ওকে একদিন সতর্ক করে দিয়েছিলাম। সেদিন থেকে এসব ধান্দা বন্ধ করে দিয়েছে সে। মাস্টারমশাই হাঁফ ছেড়ে বললেন, যে সৎ পথে চলবে তার ভাল হবে না তো কি অন্যের ভাল হবে? তুমি ওর বিয়ের কথা-বার্তা বলে এসে খুব ভাল করেছ। আমিও অনেকদিন থেকে একটা ভাল মেয়ের সন্ধানে ছিলাম। আমার দায়িত্বটা তুমি পালন করে দিয়েছ জেনে এতে আমার কাঁধ হালকা হল।

কথা হল বটুকে রাজি করানোর যাবতীয় দায়িত্ব হাসান মাস্টার নিজের ঘাড়ে তুলে নেবেন, আমি শুধু পাশে থাকব। কিন্তু আমার ভয়টা থেকেই গেল। সুখিয়া নামের মেয়েটিকে বটু এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না—এ কথা সে অনেকবার আমাকে কথা প্রসঙ্গে শুনিয়েছে। ওর ঘাড় থেকে সুখিয়ার ভূত না নামালে বিয়ের পিঁড়িতে ওকে বসানো যাবে না। আমার এই ভয়ের কথা মাস্টারমশাইয়ের কাছে খোলাখুলি বলতে পারলাম না, বলতে

পারলে হয়তো সামান্য স্বস্তি পেতাম এবং নিজেকে খুব পরিচ্ছন্ন মনে করতাম।

মাস্টারমশাই আমাকে শুধিয়েছিলেন, মেয়েটার নাম কী?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম, সীতা।

এরপর জাত এবং ভাষার প্রশ্ন এসে পড়েছিল অনিবার্যভাবে। আমি মাস্টারমশাইকে বুঝিয়ে বললাম, জাত কোনও ফ্যাক্টর নয়। আপনি জোর দিয়ে বললে বটু আপনার কথা অমান্য করতে পারবে না। তাছাড়া, আজকাল জাত-পাত তো তেমন একটা কেউ মানে না। বটুর একজন সহধর্মিণী দরকার। সব দিক থেকে সীতা ওর উপযুক্ত।

ভাষার ব্যাপারে মাস্টারমশাই সামান্য খুঁতখুঁত করছিলেন। আমি জোরের সঙ্গে বললাম, ভাষাও কোনও সমস্যা নয়। বটুতো ভালই বাংলা বলতে পারে। ওর দোকানের অধিকাংশ খদ্দেরই তো বাঙালি।

মাস্টারমশাই গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, বউ তো খদ্দের নয়, বউ হল লক্ষ্মী। ঠিক আছে চল কত দূর কী করা যায়। তোমাদের জাতপাত, এমন কী ভাষার দ্বন্দ্ব আমি কখনও ভুল করেও মনে স্থান দিই না। ওগুলো বড় ভঙ্গুর জিনিস। ভেঙে ফেলা কাঁচের চেয়েও ধারাল, রক্তপাত ঘটিয়ে ছাড়ে।

বটুকে বুঝিয়ে বলাতে সে প্রথমে কুঁইকুঁই করে, শেষ পর্যন্ত রাজি হল। আমি আনন্দ উত্তেজনায় বটুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, জান তো, সীতা তোমাকে ভালবাসে। কাল রাতে আমি ওর পুরনো ডাইরিটা দেখেছিলাম। তাতে সে তোমার কথা লিখে রেখেছে। একটা মেয়ে কখন তার ডাইরিতে নির্দিষ্ট একজন যুবকের নাম লিখে রাখে—এ নিশ্চয়ই তোমাকে ভেঙে বলতে হবে না। যাও, কালই পাকা দেখা দেখতে যাব। তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। এখন, এই সুখের দিনে তুমি সবাইকে মিষ্টি মুখ করাও। চটপট কর, মাস্টারমশাই কাজের মানুষ তাকে তো তোমার জন্য বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারব না।

বটু কর্মচারীকে পাঠিয়ে তিন রকমের মিষ্টি আনাল রেল ইস্টিশানের দোকান থেকে। তখন আর বৃষ্টি নেই, একেবারে ঝরঝরে মেঘমুক্ত আকাশ। স্যাঁতসেঁতে ভাবটা চড়া রোদ পড়তেই বেমালুম হারিয়ে গেল। বটু যে খুশি হয়েছে তা ওর চোখ-মুখ দেখলে বোঝা যায়। হাসান মাস্টারমশাই আমাকে বললেন, তুমি তাহলে ওদের একটা খবর পাঠিয়ে দিও। আমরা তাহলে বুধবারেই যাব। ওই দিনই পাকা দেখা দেখে বামুন ঠাকুর নিয়ে দিনক্ষণ সব ঠিক করে আসব।

আমি বললাম, সেই ভাল, শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। বটুর পরিতৃপ্ত, সুখী মুখের দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল বুকটা।

মিষ্টিটায় কামড় মারতেই এতক্ষণের জমিয়ে রাখা তেতো ভাবটাও বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল বাইরে। আমি পরমুহূর্তে ভেবে দেখলাম, আমার এই হীনমন্যতা মোটেও শোভা পায় না। বটু আমার প্রবাস জীবনের বন্ধু। আমি যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম তখন এই বটুই আমাকে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছে। তার সুখে আমার তো সুখী হওয়া উচিত। আমরা যখন গল্প-গুজবে বিভোর হয়ে মিষ্টি খাচ্ছিলাম তখন মোরাম ফেলা রাস্তার উপর দিয়ে একটা রিকশা এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল বটুর চায়ের দোকানের সামনে। হুড তোলা রিকশায় গাঁটু হয়ে পায়ের উপর পা তুলে বসেছিল জালাল। তার সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, চুল ছোট করে কাটা। চোখ মুখ শুকিয়ে ঢুকে গিয়েছে গর্তে। জেলে যে ও মোটে সুখে ছিল না তা ওর ঘোলাটে চোখ আর চোয়াল-বসা মুখটা দেখলে বোঝা যায়। জালাল রিকশা থেকে নামল না, সিটের উপর বসে বটুকে চিৎকার করে শুধোল, আব্বা আছে?

হাসান মাস্টার ছেলের গলা শুনে ধড়ফড়িয়ে নেমে এলেন রাস্তায়। তার চোখে মুখে অদ্ভুত বিহ্বলতা। জালাল খৈনির পিকটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ঘরের চাবিটা দাও। জেলখানা থেকে আজ আমাকে ছুটি করে দিয়েছে। এখন আমাকে কে পায়!

□ □

২২শে শ্রাবণ, আজ বটুর বিয়ের দিন।

গত পাঁচদিন থেকে মেসে আমাদের 'মিল অফ', বটু গিয়ে রামধনকে বলে এসেছে, তুমিও আমাদের সঙ্গে খাবে, জংশন থেকে ঠাকুর এনেছি সে-ই এ কয়দিন রেঁধে বেড়ে খাওয়াবে। রামধন এতে বেজায় খুশি। ক-দিন তাকে রাঁধতে হবে না এই জন্য সে ছুটির আমেজে ঘুরছে। তার খৈনি খাওয়ার মাত্রাটা ক-দিন থেকে বেড়ে গিয়েছে অতিরিক্ত।

সকালে পরিমল গেল রঙ পাহাড়ের গ্রামে, তার হাতে গায়ে হলুদের তত্ত্ব। প্রায় কেজি পাঁচেক ওজনের একটা রুইমাছ সকালে গিয়ে বড় বাজার থেকে আমি কিনে এনেছি। মাছ নাকি শুভ কাজে জরুরি, এবং গায়ে হলুদ পাঠানোর সময় মাছ ব্যতিরেকে পরিমল খালি হাতে যাবে কী করে?

নিজের বিয়ে বলে নয়—এমনিতেই বটু হাত খোলা প্রকৃতির মানুষ। খরচাপাতিতে তার জুড়ি সে নিজেই। আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, সময় করে তুমি একবার বাস মালিকের সঙ্গে দেখা করে আসবে। আর এই হাজারটা টাকা ওকে দিয়ে আসবে। বাস যেন চারটের মধ্যে দোকানের

সামনে এসে যায়। যারা বরযাত্রী যাবে তাদেরকে একবার বলে দিও তারা যেন সময় মতো এসে যায়।

আমি বটুকে আশ্বস্ত করে বললাম, এ সব নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না। আমরা যখন আছি তখন তোমার আর অত চিন্তা না করলেও হবে। দেখে নিও সব কাজ ভালমতন হয়ে যাবে। যার মন ভাল তার কোনও কাজই আটকায় না।

হাসান মাস্টারমশাই ব্যস্ত ছিলেন প্যাণ্ডেল তদারকির কাজে। দোকানের সামনের ফাঁকা জায়গায় রঙিন কাপড় ঘিরে তৈরি করা হয়েছে খাওয়ার জায়গা। বসার জায়গা তার পাশেই। সেখানেও প্যান্ডেল বানিয়ে প্রায় শ-খানেক চেয়ার রাখার ব্যবস্থা। মাইকওলাকে বলা হয়েছে দোকানের তক্তপোশটার পাশে বসতে। ওখানে ভিড়টা কম হবে। এবং যন্ত্রপাতি রেকর্ডগুলো যত্নে থাকবে। বাঁশ পুঁতে টাঙানো হয়েছে দুটো চোঙা মাইক। চারটে বক্স প্যাণ্ডেলের ভেতরে পাশাপাশি বাজবে। সেই সকাল থেকে বিসমিল্লা খাঁর সানাই বাজাচ্ছিল মাইকওলা, বাতাসে সানাইয়ের সুর, সেই সুর এখন পুরো রেল কলোনির কানে। সবাই জেনেছে, বটু চা-দোকানির বিয়ে। বটু তার মাসকাবারি খদ্দের আর মহাজনদের নিমন্ত্রণ করেছে, সেই সঙ্গে বস্তির গরিব-দুঃখীদের সাধ্যমত খাওয়াবে। এ প্রস্তাবটা হাসান মাস্টারের দেওয়া এবং বটু তাতে রাজি হয়েছে।

পাকা দেখার দিন সীতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন হাসান মাস্টার। বটু দু-ভরির বালা তৈরি করে রেখেছিল আগে থেকে। আমি শুধু সীতার হাতের মাপটা এনে দিয়েছিলাম। সেদিন অভয়বাবু তার সামর্থের কথা জানিয়েছিলেন এবং দেনা-পাওনার প্রসঙ্গ উঠতেই কেমন সঙ্কুচিত এবং ভীত হয়ে পড়েছিলেন। সেখানেও বটুর ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। বটু সাহস দিয়ে বলেছিল, দেনা-পাওনা নিয়ে ভাবতে হবে না। আপনার সামর্থে যা কুলায় তাই দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে দেবেন। আমার বাড়তি কোনও দাবি নেই।

অভয়বাবু বলেছিলেন, তিন চার গাছা চুড়ি আর কানপাশা দেবেন। বটু তাতেই রাজি। আমরা যারা ভেবেছিলাম বটু ব্যবসায়ী ছেলে, দেনা-পাওনার ব্যাপারে ও অভয়বাবুকে ছেড়ে কথা বলবে না, তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হল।

বটু সকাল থেকে চা ছাড়া কিছু খায়নি। আজ বিয়ে বলে পুরুত ঠাকুর ওকে খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি পৈতে রগড়ে বলেছেন, চা আর সরবৎ ছাড়া তুমি যেন সলিড ফুড আর কিছু খেও না। জীবনের এই সুখের দিন ছেলে-মেয়ে উভয়কে একটু কষ্ট করতে হয়। এটাও একটা সংযমের পরীক্ষা।

পরিমল চলে যাওয়ার পর আমাদের হাতে বিশেষ কোনও কাজ ছিল না। বটুকে দেখলাম ও বেশ চিন্তিত। আমার ভেতরেও সেই চিন্তার ছাপ পড়েছে। বিয়ে মানেই ঝামেলার কাজ। একটু এদিক-ওদিক হলেই ঝগড়া-বিবাদ-অশান্তি।

বিয়ের সাতদিন আগে বটু আমাকে বলেছিল চন্দনাদের টেলিগ্রাম করতে। আমি পোস্ট-অফিসে গিয়ে আরজেন্ট টেলিগ্রাম করেছি। সুজিতকে লিখেছি আসার জন্য। ওরা নিশ্চয়ই আসবে। দীর্ঘদিন হল চন্দনার কোনও খোঁজ-খবর পাইনি। কাল রাতেও স্বপ্নে ওকে দেখেছি। ওরা যদি সবাই মিলে আসে তাহলে তো ভালই হয়। ক-দিন থেকে জায়গাটা দেখে যেতে পারবে।

বটু আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ঘরে, বলল—তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে। বলেই সে চেয়ারটা দেখিয়ে দিল বসতে। তারপর, উবু হয়ে খাটের তলা থেকে স্যুটকেস বের করে এনে চাবি খুলে বের করে আনল একটা ছোট পোঁটলা। আমি ঝুঁকে পড়লাম সেই দিকে। বটু সেই পোঁটলাটা খাটের ওপর রেখে অতি যত্নে গিঁট খুলল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ওতে কি আছে?

বটু হাসি মুখ করে বলল, গয়না! বলেই সে পুঁটলিটা আমার দিকে এগিয়ে দিল, দেখো তো, এগুলো কেমন হয়েছে!

আমি গহনাগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখলাম। কোনমতে সাত-আট ভরির কম হবে না। বটু সবই স্যাকরার কাছ থেকে অর্ডার দিয়ে গড়িয়ে এনেছে। সীতাকে সে সাজিয়ে-গুছিয়ে ঘরে তুলতে চায়। অভয়বাবুর সামর্থ কম তাই বলে বটু কেন পিছিয়ে থাকবে? ভগবানের দয়ায় তার তো এখন কোনও কিছুর অভাব নেই।

আমি ওর কাঁধটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললাম, খুব সুন্দর হয়েছে, এগুলো পরলে সীতাকে আরও সুন্দরী দেখাবে।

বটু লজ্জা পেল আমার কথায়। গহনার পুঁটলিটা ভাল করে গিঁট দিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা তোমার কাছে রাখ। এগুলো তুমি সীতার বাবার হাতে দিয়ে দেবে। কেউ যেন না জানতে পারে। লোক জানাজানি হলে সেটা ভাল দেখাবে না। আমি চাই না ওরা কারোর কাছে ছোট হয়ে যাক।

বটুর এই ভাবনাগুলো ওর প্রতি আমাকে আরও শ্রদ্ধাশীল করে তুলল। ওর এই দরাজ মনটাকেই আমি ভালবাসি। সকালে যখন পরিমল গেল গায়ে হলুদ নিয়ে তখন বটু তার হাতে পাঁচ হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়েছিল অভয়বাবুকে দেবার জন্য। এই টাকাটা বটু ধার হিসাবে দেয়নি। দিয়েছে বিয়ের খরচের জন্য। গরিব মানুষ অভয়বাবু। মেয়ের বিয়ে দিতে এত

টাকা কোথায় পাবেন? বটু চায় না তার সুখের জন্য কাউকে যেন অযথা বিপদে পড়তে হয়।

ফুলের দায়িত্ব ছিল রামধনের উপর, বাজারে তার এক আত্মীয় আছে ফুল-ব্যবসায়ী। হরেক কিসিমের ফুল পাওয়া যায় তার কাছে। আমি রামধনকে বলেছিলাম, রজনীগন্ধার বড় মালা আনবে দুটো। আর যদি পার তো কিছু আধফোটা গোলাপের কুঁড়ি। আর হ্যাঁ, এগুলো আনার সময় ফুলশয্যার ফুলের কথা বলে আসবে। দেখো যেন বাসিফুল না দেয়। রামধন তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে, শালপাতায় মোড়ানো ফুলের বান্ডিলটাকে সে নামিয়ে রেখে মেসে চলে গেল বিশ্রাম নিতে। রিজার্ভ করা বাস ছাড়বে ঠিক বিকেলের পরে, অর্থাৎ ঠিক সন্ধের মুখে। সঙ্গে হ্যাজাক থাকবে চারটে, কেননা বাস যাবে বড় রাস্তা অবধি—বাদবাকি পথ হেঁটে যেতে হবে। যদিও সামান্য জ্যোৎস্না আছে, তবু হ্যাজাক আর টর্চ লাইট নেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য।

বিকেলের দিকে আমরা সবাই রেডি হয়ে চলে এলাম, যাঁরা বরযাত্রী যাবেন তাঁদের সাজের বাহার দেখে অষ্টমী পুজোর কথা মনে পড়ল। প্রবাস জীবনে সরস্বতী আর দুর্গা পুজো ছাড়া তেমন কোনও উৎসবের মুখোমুখি হয় না কেউ। বটুর বিয়েটা তাই আমাদের কাছে একটা নতুন উৎসবের মতো। আমার বন্ধুগুলো মন-প্রাণ এক করে খাটছে, বটুও তাদের যত্ন-আত্তির কোনও ত্রুটি রাখছে না। তার বিনীত স্বভাব কাউকেই উচ্ছৃঙ্খল হতে দিচ্ছে না। আমি দেখছিলাম কী অদ্ভুত তৎপরতায় বটু সব দিক বজায় রেখে চলেছে।

বিকেলের আগেই রিজার্ভ বাসটা ফুলে ঢাকা হয়ে বটুর দোকানের সামনে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে গেল আমাদের মধ্যে। আমি গিয়ে ডেকে আনলাম বটুকে। ও দেখি ধুতি পরে জামাই সেজে বসেছে। শ্রাবণের বিকেল তবু দরদরিয়ে ঘামছিল। ওর মুখে সদা বিরাজমান হাসিটা নেই, বড় চিন্তিত আর বিব্রত দেখাচ্ছিল ওকে।

আমি ওকে বললাম, বটু, এবার আমাদের বেরোতে হবে।

বটু অদ্ভুত চোখে তাকাল। ওর সুন্দর চোখ দুটো ছলছল করছিল জলে। বটু আমার কাছে সরে এসে আমার হাতটা চেপে ধরল আস্তে। আমি শুধোলাম, কী হল বটু?

আজ বড় মায়ের কথা মনে পড়ছে। কেন জানি না চোখের জল আমি আটকে রাখতে পারছি না। বটু নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে উঠল, মাখনদাদা, আমার পাপ আমাকে সব সময় তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আজ এই সুখের দিনে মাকে আমি ভুলতে পারছি না।

মাকে কী কখনও ভোলা যায়, তোমার এ চেষ্টা তো বৃথা চেষ্টা।

আমার কথায় চোখের জল মুছে নিল বটু, উদাস তাকিয়ে বলল, সুখিয়াকে আমি পেয়েছি, কিন্তু মাকে তো কোনদিন পাব না—তাই কেন জানি সেই তখন থেকে চোখ দুটো আমার জলে ভিজে যাচ্ছে।

হাসান মাস্টার ঘরে ঢুকে এসে তাড়া দিলেন আর দেরি করা চলবে না। আকাশে এক চিলতে মেঘ উঠেছে, যে কোনও সময় বৃষ্টি হতে পারে। আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়া উচিত।

বটু যখন নত হয়ে মাস্টারের পা ছুঁয়েছে তখন রামধন এসে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা চোখে ডাকল। আমি ঘরের ভেতর থেকে বললাম, কী হয়েছে রামধন?

রামধন কিছু বলল না, কেবল হাতের ইশারা করে ডাকল।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি, কী হয়েছে, বলবে তো?

আপনি একবার বাইরে আসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

রামধনের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম আমি। ফুলে-ফুলে সাজানো বাসটার দিকে তাকিয়ে রামধন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কিছুটা হেঁটে এসে। রাধাচূড়া গাছটার তলায় হেঁটে এসে সে কেমন বিমর্ষ মুখে আমার দিকে তাকাল। আমি কিছু বলার আগেই ও বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলল, বাবু, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। একবার এখুনি আমার সঙ্গে মেসে চলুন। পরিমলদা ফিরে এসেছে, তিনি আপনাকে ডাকছেন।

পরিমল ফিরে এসেছে, কেন তার তো আমাদের সঙ্গে আসার কথা ছিল? আমি রামধনকে দু-হাতে ধরে উত্তেজনায় ঝাঁকিয়ে দিই।

রামধন কাঁচুমাচু মুখে বলল, আসল ঘটনা আমি কিছু জানি না। পরিমলদা বলল, আপনাকে গোপনে ডেকে আনতে। তাই—

হেঁটে নয় যেন বায়ুযানে আমি মেসে পেঁছিলাম। সেই এক চিলতে মেঘ বিরাট আকার ধারণ করে পুরো আকাশটাকে ছেয়ে ফেলেছে। একটু আগের শান্ত বাতাস, এখন রীতিমতন মাতাল। মেসে ঢুকে আমি দেখি পরিমল হাত-পা ছড়িয়ে জামার বোতাম খুলে শুয়ে আছে দড়ির চৌপায়। আমার পায়ের শব্দে ক্লান্ত, অবসন্ন দৃষ্টি মেলে তাকাল। তারপর দু-হাতে ভর দিয়ে হুঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে বসল খাটিয়ায়। আমি উত্তেজনায় ঘামছিলাম। গলায় ব্যস্ততা ফুটিয়ে বললাম, কী ব্যাপার তুই ফিরে এলি? তোর কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই!

পরিমল কেমন অসহায় মুখ তুলে আমাকে দেখল। তারপর, শান্ত স্বরে চৌপায়াটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, বস।

আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, এখন কি বসার সময়? ওদিকে বাসে সবাই উঠে বসেছে। এখুনি বাস ছাড়বে—

বাস ছাড়ার আর দরকার নেই। থমথমে গলায় কথাগুলো বলে দু-হাত

দিয়ে মুখটা ঢাকল পরিমল, কালকের ডেটে সীতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। একটা গুণ্ডা জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। গ্রামের লোক প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু ওর দলের লোকের কাছে কেউ ভিড়তে পারেনি। যাওয়ার সময় ওরা নাকি বোম চার্জ করে পালিয়েছে।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, আমি কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। বরবেশী বটুর মুখটা আমার মাথায় আঘাত হানল বুঝি। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলাম।

পরিমল নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বসে থাকলে চলবে না। এখুনি তুই যা। গিয়ে বটুকে সব বুঝিয়ে বল।

আমি কাতরে উঠলাম, এ মুখ নিয়ে আমি বটুর কাছে যাব কী করে? ও কত আশা করে আছে, আমি কী করে এই দুঃসংবাদ ওকে শোনাব। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি পারব না। তুই বিশ্বাস কর পরিমল, এত কঠিন কাজ আমার দ্বারা হবে না।

এক অস্ফুট আর্তনাদ আমার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। আমি পরিমলের হাত ধরে কাকুতি-মিনতি করে বললাম, তুই চল, তুই গিয়ে সব বুঝিয়ে বলবি। আমি তোর পাশে থাকব।

পরিমল এবার ভেঙে পড়ল, তা হয় না মাখন। যে কাজ তোর দ্বারা হবে না সে কাজ আমার দ্বারা হবে কী করে?

আমরা যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি তখনই আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে হাসান মাস্টার ঘরে ঢুকে এলেন। আমাদের ওভাবে বোবার মতো বসে থাকতে দেখে তাঁর মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, কী হল তোমরা কী বরযাত্রী যাবে না? কী ছেলে বল তো, হাতে কি আর সময় আছে? এখন বাস না ছাড়লে পেঁছিবে কখন? চল চল আর দেরি করো না।

আমি কোনও মতে ভার মাথা তুলে উঠে দাঁড়ালাম। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। হিংস্র গলায় শুধোলাম, মাস্টারমশাই—

কোথায় যাবো? আমি বকচোখে তাকিয়ে রাগে-ঘেন্নায় থরথরিয়ে কেঁপে উঠলাম। সানাইয়ের সুর তখন আমার কানে তাতানো সূঁচের মতো খোঁচা মারছে। মানুষের কোলাহল, আনন্দ-চিৎকার সব মৃত মানুষকে ঘিরে শোক-বিলাপের মতো শোনাল। আমি চিৎকার করে বললাম, পরিমল, তুই যা। গিয়ে সানাইটা বন্ধ করে দে। শোকের বাড়িতে কি সানাই বাজে?

একি বলছ তুমি? মাস্টারমশাই সপ্রশ্ন চোখে উত্তেজনায় জর্জরিত মুখের দিকে তাকালেন, আজকের দিনে তোমার মুখে এমন কথা শোভা পায় না। তুমি না বটুর বন্ধু? ছিঃ, সে বেচারি শুনলে কী ভাববে বল তো!

ওর আর ভাবার মতো কিছুই থাকল না, যা ছিল সব শেষ হয়ে গিয়েছে। দু-হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি। মাস্টারমশাই সস্নেহে আমার পিঠে হাত দিলেন, তার হাত টিউনিং-ফর্কের মতো কাঁপছিল। আমি হাতটা সরিয়ে দিতে গিয়েও পারলাম না। হাতের চেটোতে চোখের জলটা রগড়ে নিয়ে বললাম, বটুর সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে মাস্টারমশাই। একটা গুন্ডা সীতাকে জোর-জবরদস্তি বিয়ে করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে কালকে। এই দেখুন, পরিমল ফিরে এসেছে। অভয়বাবু দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন আমাদের। এখন বলুন কী আমাদের করণীয় ?

তুমি কী শোনালে মাখন? এমন সংবাদ শোনার আগে আমার কেন মৃত্যু হল না! কথাগুলো কোনও মতে বলেই পাথর চোখে তাকিয়ে থাকলেন মাস্টারমশাই। পুড়ে যাওয়া গাছের মতো কালিমা লিপ্ত মুখ। গালের কোঁচকান মাংসগুলো থরথর করে কাঁপছিল। সেই তমসাঘন রেখার পাশ দিয়ে অকস্মাৎ ফুটে ওঠা ঘামের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল অনবরত।

আমি ধরে বসিয়ে দিলাম মাস্টারমশাইকে। মাস্টারমশাই টলতে টলতে বসে পড়লেন চেয়ারে। মাথার চুলগুলো খামচে ধরে বললেন, জানোয়ারটাকে আমি ছেড়ে দেব না। এবার ওর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমরা দেখে নিও, ও আমার হাতেই মরবে—

শোকে-তাপে, জ্বালা-যন্ত্রণায় মুহূর্তের মধ্যে কালচে হয়ে গেল মাস্টারমশাইয়ের মুখমণ্ডল। এক অলঙ্ঘনীয় গ্লানিতে পুড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। কেন যে আমার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না—তা আমার অজানা। বিড়বিড়িয়ে আপন মনে বকে চলেছিলেন তিনি। তার সামনে দাঁড়ানোর স্পর্ধা হারিয়ে ফেলছিলাম ক্রমশ।

ইত্যবসরে মাস্টারমশাই তাঁর ধুতির খুঁটে মুখ মুছে নিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না। আমরা ভেঙে পড়লে বটুকে কে সান্ত্বনা দেবে ?

চল তোমরা আমার সঙ্গে চল।

বটুকে আপনি কী বলবেন ?

আমার প্রশ্নে মাস্টারমশাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন, যা সত্যি, যা ঘটেছে তা সবই বটুকে বুঝিয়ে বলা উচিত। আমরা এতগুলো মানুষ একজনকে কি বুঝিয়ে বলতে পারব না ?

হাসান মাস্টারমশাই-ই বটুকে বাসের পিছনে ডেকে নিয়ে গেলেন, আমি, পরিমল, মাস্টারমশাইকে অনুসরণ করলাম। মাস্টারমশাই আমতা-আমতা করে বললেন, দেখ বটু, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আর সেই দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েছে একজন গুন্ডা। বটু না বুঝে হাঁ করা চোখে তাকাল। সারা দিনের উপোসী চোখ ভয়ে দপদপিয়ে উঠল নিমেষে। মাস্টারমশাই বটুর কাঁধে

হাত রাখলেন, কাঁধটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, পুরুষমাত্রই সিংহের চেয়ে বিক্রমী। অল্পতে সে ভেঙে পড়ে না। আর তুমি তো সিংহ নও, সিংহদের রাজা।

বটু দুর্ঘটনার আঁচ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠল, কী হয়েছে আপনি নিঃসন্দেহে বলুন। ছোট্ট বেলা থেকেই যখনই সুখের মুখ দেখেছি তখনই আঘাত এসে ভাঙচুর করে দিয়েছে আমাকে। আপনি বলুন মাস্টারমশাই, আমি কোনও কষ্ট পাব না।

মাস্টারমশাই সজল চোখে বটুর গলার রজনীগন্ধার মালাটার দিকে নিষ্পলক তাকালেন, বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন, মালাটা তুমি খুলে ফেল, সীতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

বটু মালাটা খুলল না, মাথা উঁচু করে হেঁটে এল দোকান ঘর অব্দি। তারপর তালা খুলে ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে দৈনন্দিন পরা লুঙিটা টেনে নিল আলনা থেকে। আজানুলম্বিত রজনীগন্ধার মালাটা সে সযত্নে খুলে টেবিলের উপর রেখে দিল। তারপর হাসি মুখে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, মাখনদাদা, বরযাত্রী যাঁরা সেজেছেন তাদেরকে তুমি বুঝিয়ে বল—আজ যা ঘটল তার জন্য ওঁরা যেন আমাকে মাফ করে দেন।



সতেরো

ততক্ষণে সানাই থেমে গেছে সমবেত সকলেই জেনে গিয়েছেন বটুর দুর্ভাগ্যের খবর। তবু বটুর কোনও মানসিক পরিবর্তনই নেই, সে আগে যেমন ছিল তেমনি খুশি। আমরা ওকে বারবার করে নিষেধ করলাম, দোকান না খুলতে। বটু আমাদের কথা শুনল না, হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, এই দোকানই আমার লক্ষ্মী, ওকে নিয়েই আমি বেঁচে থাকব।

অনেক রাতে চরাচর যখন শান্ত, মেসে আমার ঘুম আসছিল না। গুন্ডাদের উপর রাগ হচ্ছিল প্রচন্ড ; মনে হচ্ছিল ওকে সামনে পেলে আমিই প্রথম ঘাতক হতাম। কিন্তু সে ধূর্ত শেয়াল, রাজহংসী ধরে নিয়ে পালিয়ে গেছে। হাসান মাস্টারের মনের অবস্থা এত শোচনীয়, যে-কোনও মুহূর্তে ওনার হৃৎপিণ্ডের গতি থেমে যেতে পারে। ওনাকে কোনও কড়া ভাষা বলাই আমাদের উচিত নয়।

বাসটা গ্যারেজে চলে যাওয়ার পর থেকে আমি আর মাস্টারমশাইকে দেখতে পাইনি। উনি নাকি বলে গিয়েছেন, বদলা নিয়েই ফিরবেন।

ঘুম না আসলে আবোল-তাবোল কত রকমেব যে প্রশ্ন এসে জড়ো হয়। শ্রাবণ মাসের রাত, অথচ এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, চাঁদ উঠেছে থালার মতো। বিকেলের সেই জলবাহী মেঘটা কোথায় কোথায় যেন নিরুদ্দেশ। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে বসলাম চৌপায়ায়। পাশের খাটিয়ায় তখন উশখুশিয়ে উঠল মেস ম্যানেজার পরিমল, তোর কাছে সিগারেট হবে মাখন, দে তো একটা।

আমি সিগারেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, এখনও ঘুমোসনি ?

তুইও তো ঘুমোসনি। পরিমল ঠোঁট কামড়ে আমার দিকে তাকাল, বটুর কথা ভাবছিস নিশ্চয়ই ! যদি সব ঠিক-ঠাক থাকত তাহলে এতক্ষণে বটুর বিয়েটা শেষ হয়ে যেত। আচ্ছা, রাত কত হল বলতো ?

কত আর, দেড়টা-দুটো হবে !

পরিমল আঁতকে ওঠার চোখে তাকাল, বাব্বাঃ, এত রাত! ঘুমিয়ে পড়, কাল আবার ভোরে উঠে বটুর কাছে যেতে হবে! এ সময় ওর পাশে থাকা খুব দরকার। বটু যা সেন্টিমেন্টাল ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করে না বসে।

আমি কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। একটা পাগল বুদ্ধি আমার মাথায় ভর করল। আমি পরিমলের চোখে চোখ রেখে বললাম, বটুর জন্য আমাদের কিছু করা দরকার। ওকে তো আর এইভাবে আইবুড়ো রাখা যায় না। আমার যদি বোন থাকত তাহলে আমি বটুর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতাম। এবং তা নেক্সট ডেটেই।

পরিমল আমার প্রস্তাব শুনে প্রথমে একটু অবাক হল, তারপর সমর্থনের গলায় বলল, তুই ঠিকই বলেছিস মাখন। বটুর মতো ভাল ছেলে খুব কমই হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমারও কোন বোন নেই। থাকলে কালই ছুটি নিয়ে চলে যেতাম এবং এই শ্রাবণ মাসেই বিয়ের পর্ব চুকিয়ে ফেলতাম।

পরিমল খুব মুডি ছেলে, ও যা বলে তা কিছুটা অগোছাল হলেও তাতে কোনও কথার মারপ্যাঁচ নেই।

এই ভাবে দু-জনে মুখোমুখি বসে একের পর এক সিগারেট পোড়ালাম কিন্তু সুবিধাজনক কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। পরিমল মাথায় এলোমেলো আঙুল চালিয়ে কী যেন গভীরভাবে ভাবছিল। শেষে ব্যর্থ হতে আমার মুখের দিকে কেমন হার মানা চোখে তাকাল, ভেবে দেখলাম রেল কলোনীতে তেমন একটা মেয়ে নেই যে বটুর জীবনসঙ্গী হতে পারে। আসলে বটুর জন্য চাই সুন্দর মানসিকতার মেয়ে—যে বটুকে পূর্ণতা দেবে ভালবাসবে—ওর তিক্ত অতীতকে ধীরে ধীরে ভুলে যেতে সাহায্য করবে। পোড় খাওয়া মেয়ে ছাড়া, একেবারে সদ্যোদ্ভিন্ন যুবতী মেয়ের দ্বারা এমন কাজ হবে না।

পরিমলের কথায় চকিতে চন্দনার মুখটা আমার মনের কোণে গঙ্গার জলে ভেসে যাওয়া ঠাকুরের ফুলের মতো দেখা দিয়েই হারিয়ে গেল। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। পরিমলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে সরে গিয়ে বললাম, পেয়েছি, তেমন মেয়ে আমার হাতেই আছে। আর সেই মেয়েকে বটুর খুব পছন্দ। চল, এখুনি চল। বটু যদি রাজি থাকে তাহলে সকালের গাড়িতে আমি কলকাতা চলে যাব। মাসীমা আর চন্দনাদের নিয়ে ফিরে আসব কালকের ভোরে। তুই পাঁজি দেখত—এ মাসে বিয়ের কোনও ডেট আছে কিনা।

পরিমল চন্দনা নামেই চেনে, কলকাতার যাবতীয় ঘটনা আমি ওদের অনুপুঙ্খ বলেছি। নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলে সে আনন্দে তুড়ি মেরে বলল, গুড আইডিয়া। দাঁড়া, আমি পঞ্জিকাটা দেখে নিচ্ছি। তারপর বটুর

কাছে যাওয়া যাবে।

পঞ্জিকা পাওয়া গেল না, বাংলা ক্যালেণ্ডারেই বিয়ের তারিখ পেয়ে গেলাম। বাইশে শ্রাবণের পরেও পর পর দুটো ডেট আছে। পরিমল একরকম টানতে-টানতে নিয়ে এল বটুর কাছে।

ভোরের আলো ফুটতে তখন আর বেশি দেরি নেই, কাক-পক্ষীর সরব ডাকে দিন ঘোষণার ইঙ্গিত। আমরা গিয়ে দেখলাম, বটুর ঘরে আলো জ্বলছে তখনও! মশারি টাঙানো নেই, অথচ পরিপাটি বিছানা। বুঝতে পারলাম, সারা রাত বটু ঘুমোয়নি। চেয়ারে বসেই এত বড় রাতটা কাটিয়ে দিয়েছে অক্লেশে।

আমাদের পায়ের শব্দে সচকিত বটু বলল, কী ব্যাপার, এতো ভোরে? তোমরা কি রাত ভোর আমার জন্য ঘুমাওনি?

আমি বুঝিয়ে বললাম, ঠিক তা নয় বটু। এমনিতেই ঘুম আসছিল না। আসলে টেনশনটা তো তোমার একার নয়—আমাদের সকলের।

কী করব মাখনদাদা, সবই ভাগ্য। বটুর কণ্ঠস্বরে ভেঙে পড়ার সূচনা, কপালে না থাকলে তোমরা যতই চেষ্টা কর না কেন কাজের কাজ কিছু হবে না!

এবার হবে। একবার হেরে গিয়েছি বলেই বার বার হেরে যাব—এমন কি কোনও মাথার দিব্যি দেওয়া আছে? বটু কেমন ঝিমুনি লাগা চোখে আমাদের দু-জনকে দেখল। ঠোঁটের কোণে চিকণ হাসি ফুটিয়ে সে চেয়ে থাকল আবছা আলো-আঁধারি পথের দিকে। বড় ক্লান্ত, বিবশ সেই চাহনি। আমার ভয় ধরে গেল। তবু, দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, বিয়ে তোমার দেবই-তা যেখানে হোক। দেশে মেয়ের কোনও অভাব নেই—এই অব্দি বলেই আমি বটুর চোখের দিকে তাকালাম, ওর প্রতিক্রিয়ার আঁচ নেওয়ার চেষ্টা করলাম গোপনে। বটু প্রতিক্রিয়াহীন। আমি বললাম, চন্দনার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা পাকা করতে আজ সকালের গাড়িতে আমি কলকতায় যাচ্ছি। দরকার হলে ওদের আমি সঙ্গে আনব। শুধু তুমি একবারের জন্য 'হ্যাঁ' বল! বটু ফ্যাকাসে হেসে বলল, ওরা কী এখন আসতে পারবে?

আমি জোরের সঙ্গে বললাম, কেন পারবে না, আলবাৎ পারবে। তুমি চন্দনাকে জানো না ওর টান তোমার প্রতি কত তীব্র।

বটু সেই একই রকম শব্দহীন হাসল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে উঠে গেল টেবিলটার দিকে। ড্রয়ার খুলে বের করে আনল একটা টেলিগ্রামের কাগজ। হা-হা হাসতে-হাসতে বলল, এটা পড়। পড়লেই সব বুঝতে পারবে।

আমার হাত কাঁপছিল তবু টেলিগ্রামটা কেড়ে নিলাম তড়িৎ বেগে।

MARRIAGE SETTLED ON 22nd SHRABAN WITH CHANDANA. ATTEND WITHOUT FAIL.—SUJIT.

ক্যাপিট্যাল লেটারে লেখা শব্দগুলো পড়তে আমার বেশি সময় লাগল না। আমি যেন আমার চোখের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলাম। বটু মলিন হেসে শুধোল, খুব ঘাবড়ে দিয়েছি, তাই না ?

আমি ওর কথায় কান না দিয়ে বললাম, এটা কবে এসেছে ?

বটু বলল, পাঁচদিন আগে। বলেই সে ক্ষমাপ্রার্থীর চোখে আমার দিকে তাকাল, বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে মাখনদাদা, তোমাকে জানানো হয়নি। আসলে দু-জনের বিয়ের তারিখই একই দিনে। তুমি যদি ওদের বিয়েতে চলে যাও, এই ভয়ে আমি টেলিগ্রামটা চেপে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল,—আমার বিয়ের ঝামেলাটা চুকে গেলে সীতাকে নিয়ে আমরা একবার কলকাতা থেকে ঘুরে আসতাম।

আমার মুখে কথা নেই। সুজিতের উপর অভিমানে বুক ভরে গেল আমার। রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে আমরা মুখ লুকোব কোথায় ?

আমার ভাঙাচোরা মুখটার দিকে তাকিয়ে পরিমল ভার গলায় বলল, এই পাতাটাও কেটে গেল। আসলে, বটুর ভাগ্যটাই খারাপ।

বটু সেই একই ভাবে হেসে উঠল। হাসিতে যে কান্নার ছোঁয়া থাকে তা খুব গূঢ়ভাবে না দেখলে বোঝা মুশকিল। সুজিত আর চন্দনার উপর এক অর্বাচীন রাগে আমার বুকটা জ্বলে গেল ! টেলিগ্রামটা টুকরো করে ছিঁড়ে ভোরের বাতাসে আমি উড়িয়ে দিলাম !



আঠারো

মাসখানেক হতে চলল তবু বটুর মনের অবস্থা শান্ত হল না, ঝড়ো হাওয়ার মতো সে অশান্ত, কখনও বিবাগী বাউল বাতাসের মতো সে উদাসী। আমি তাকে যত দেখি ততই গভীর সংশয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। ভাবি, একি হাল হয়েছে বটুর! সেই চনমনে স্ফূর্তির জোয়ার বটু কোথায় হারাল? কেন সে পাহাড়ের চেয়ে গম্ভীর, পাথরের চেয়েও রুক্ষ, কঠিন। এক নির্মম কর্কশতা, পাথর কাঠিন্য বটুর উপর ভর করেছে। ওর হাসিতে আগের সেই প্রস্ফুটিত কাঁটালীচাপা নির্মেদ স্বচ্ছতা থাকে না, ধোঁয়াশা শুষ্ক মলিন হাসি। তবে কি বটু নিজেকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করার রাস্তায় হাঁটছে? একি তার অভিমান না কি নিজেকে নিঃশেষ করে আড়ালে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস? আমার কিছুতেই মাথায় ঢোকে না কেন নিজেকে তিলে তিলে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে বটু?

গতকাল সকালে বটুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল রেল ইস্টিশানে। বটু আমাকে আড়চোখে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল, সে যে আমার মুখোমুখি হতে চায় না তা ওর চোখ দুটোই আমাকে বলেছিল। কাজের তাড়া ছিল আমার তবু বটুকে দেখে ওর মুখোমুখি হবার বাসনা আমি ত্যাগ করতে পারলাম না। জোরে হেঁটে এসে বটুকে ধরে ফেলেছিলাম আমি। আর ধরা পড়ে যেতেই বটুর সেকি সঙ্কোচ। হাতে তার তখন জ্বলন্ত সিগারেট, আমাকে দেখে লুকোচ্ছিল। বটুর এই পরিবর্তন আমি খুব অবাক হয়ে দেখছিলাম। যে বটু বিড়ি, খৈনি এমন কি সিগারেট খেত না, সেই বটু এখন শুধু সিগারেট-বিড়ি নয় হাঁড়িয়া আর চুল্লু—দেশি মদে ডুবে আছে। স্বভাব যখন নিম্নগামী হয় সহসা তখন তাকে রোখা যায় না। অধঃপতিত স্বভাব অনেকটা ঢালু পথে ব্রেক ফেল করা বাসের মতো। কোথায় গিয়ে যে ঠোক্কর মারবে তার কোনও আগাম আভাস পাওয়া যায় না। যদি কোনও কারণে বেঁচে যায় তাহলে সেটা ভাগ্য, আর যদি ঠোক্কর খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে তাহলে ধরে নিতে হবে, এটাই

হল নিয়তি বা ভাগ্য বিপর্যয়। বটুর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট দেখে আমার যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমি বোঝাতে অক্ষম। বটুকে ভালবাসি বলেই হয়তো বিদীর্ণ হচ্ছিল বক্ষস্থল। সিগারেট-বিড়ি বা মদ খাওয়া কোনও পাপ কাজ নয়। কিন্তু বটুর ক্ষেত্রে তা শুধু পাপ নয় গর্হিত কর্ম হিসাবে প্রতিফলিত হল। বটুর সঙ্গে পরিচয় আমার এখানে আসার পর থেকেই, ওর দারিদ্রতার কিছুটা অধ্যায় আমার চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ঘটে গেছে। ওর আর্থিক স্বাচ্ছলতাও কম দিন দেখিনি। তখনও কোনদিন বটুকে আমি ধূমপান করতে দেখিনি। ধূমপায়ী বা মদ্যপদের উপর বটুর চাপা ক্ষোভ বা বিতৃষ্ণা আমি অনেকবার লক্ষ করছি। ও কতবার আমাকে জ্ঞান দেবার ভঙ্গিমায় বলেছে, মাখনদাদা, নেশা ভাঙ করা ভাল না। শরীরের পক্ষে এগুলো ক্ষতিকর। তুমি কি পার না এসব ছেড়ে দিতে? আমি ক্ষীণ হেসে বলেছি, ছেড়ে দিতে পারলে তো ভীষণ ভাল হত কিন্তু বহুবার ছাড়বার চেষ্টা করেও যে পারিনি। বটু কেমন আক্ষেপের হাসি হেসে বলত, মানুষ পারে না এমন কি কোনও কাজ আছে? তুমি একটু চেষ্টা করলেই ঠিক পেরে যাবে। এক প্যাকেট সিগারেট না কিনে একটা-দুটো কেনো। এতে খাওয়ার ঝোঁকটা কমবে। যে বটু আমাকে ধূমপানের কুফল সম্বন্ধে উপদেশ দিত, এবং নিজে ধূমপান থেকে শত হাত দূরে থাকত সেই 'ভাল ছেলে বটু' আজ ভয়ানক নির্লজ্জ বেপরোয়াভাবে নিজেই ধূমপান আসক্তিতে জড়িয়ে পড়েছে। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই তার এই অধঃপতন যা আমি বহুবার দেখেছি এবং দেখে মর্মাহত হয়েছি। প্রথম দিকে বটুকে আমি ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়েছি এবং ধূমপানের কুফল সম্বন্ধে ওকে সতর্ক করেছি। বটু সতর্ক হয়নি, পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। খুব যখন আমি ওকে চেপে ধরেছি তখন ও নিরুপায় হারমানা স্বরে বলেছে, মাখনদাদা, মানুষকে তো কোনও না কোনও নেশা নিয়ে থাকতে হয়। বিশেষত যার কিছু নেই, সব খোয়া গিয়েছে সে কী নিয়ে বাঁচবে? আমি যখন একা থাকি হাজার ভাবনা আমাকে শ্বাস নিতে দেয় না। বেঁচে থাকাটা তখন কত যে অর্থহীন তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। চিন্তা-ভাবনাগুলো খণ্ড খণ্ড শিলা-পাথর হয়ে আমার বুকে চেপে বসে। শ্বাস রোধ করে দেয়। তখন নিজের শোক ব্যথা ভুলতে আমি নেশা করি। জানি এতে মুক্তি নেই, তবু এ আমার ব্যথা ভোলার ব্যর্থ চেষ্টা।

বটুকে আমি কোনমতে বুঝিয়ে উঠতে পারিনি, শুধু আমি কেন মেসের কেউ বটুর মনে কোনও রেখাপাত করতে পারিনি। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর থেকে প্যাকেট-প্যাকেট বটুর কাছে কিছু নয়, মুড়ি-মুড়কি খাওয়ার মতো বটু সিগারেট খায়। যত দিন যাচ্ছে তার এই আসক্তির তীব্রতা বাড়ছে।

ওর দোকানের কর্মচারীগুলো আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে, বটু প্রায় সময় নাকি স্টেশনের ধারে মদ ভাঁটিতে পড়ে থাকে। দোকানের ওপর ওর আর নজর নেই। সকাল হলেই বটু নাকি জলের বদলে মদ দিয়ে মুখ ধোয়।

কর্মচারীরা যে বাড়িয়ে বলে না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সেদিন বাস স্ট্যান্ডের কাছ থেকে কোনও এক পরিচিত রিকশাওলা বটুকে দোকান অব্দি পেঁৗছে দিয়ে গেল। বটুর সারা মুখে গ্যাঁজরা, ঘাম। চুল ভেজা। প্যাণ্ট-জামার দশা অবর্ণনীয়, জলকাদায় ছয়লাপ। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও ফ্যাকাসে হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। আমি শ্লেষপূর্ণ কঠিন স্বরে বললাম, ছিঃ বটু, তুমি এত নিচে নেমে গেছ। তোমাকে এখন বন্ধু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়। বটু আমার কথার প্রতিবাদ করেনি, এটা তার মহৎ গুণ। আমি বটুকে ধরে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিয়েছিলাম। বিছানায় শুয়ে বটু ছেলেমানুষের মতো কাঁদছিল, মাখনদাদা, আমি মরে যাব। আমার পেটটা মাঝে-মাঝে ব্যথায় গুলিয়ে ওঠে! তখন মুঠো-মুঠো খাওয়ার সোডা, ট্যাবলেট-ক্যাপসুল খেলেও কিছু হয় না। আমি জানি পেটে আমার ঘা হয়েছে। ঘা পেটে মদ খেলে আমি আর ক-দিন বাঁচব মাখনদাদা। আমি বটুকে সান্ত্বনা দিই, এসব ছাই-পাঁস খাওয়া তুমি ছেড়ে দাও। তোমার ব্যবসা আছে, ব্যবসা নিয়ে ডুবে যাও।

বটু তার অক্ষমতার কথা ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয়, জানি মদ খেলে আমার সর্বনাশ হবে তবু মদ ছাড়া আমি থাকতে পারি না। যার কিছু নেই তাকে তো একটা কিছু নিয়ে বাঁচতে হবে।

বটু যেভাবে বাঁচতে চায়, সেটা আদৌ বাঁচার রাস্তা নয়। কিন্তু মানুষ যখন ধারাবাহিকভাবে ভুল করে তখন তাকে শুধরে দিতে গেলে অপ্রিয় হতে হয়। আমি অপ্রিয় হতে রাজি আছি তবু বটু ভাল হয়ে যাক। বটুর এই উচ্ছৃংখল আচরণের জন্য আমি কখনও সখনও ওই চিন্তাটাকে দায়ী করি। নষ্টকীটের মতো জালাল বটুর সুন্দর হৃদয়টাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। হাসান মাস্টার যদি এই দুঃসময়ে থাকতেন তাহলে হয়তো বটু নিজেকে এ ভাবে শেষ করে দিতে পারত না। মানুষটাকে বশ মানানোর যাবতীয় ওষুধ হাসান মাস্টারের ওই গোলগাল মাথায় স্তরে স্তরে সাজানো ছিল। আমি দেখেছি—ওই একটি মাত্র লোককে বটু সমীহ করত, এবং তার উদ্ধত মাথার কাছে বটুকে এক অনুগত ছাত্রের মতো দেখাত। কিন্তু কয়েক মাস থেকে হাসান মাস্টারের কোনও খোঁজ নেই! বস্তির লোকেরা আক্ষেপ করে বলে পাগলা বুড়ো মনে হয় আর বেঁচে নেই। সে হয়তো টেন্নেনে গলা দিয়েছে কিংবা ফাঁস নিয়েছে। যদি বেঁচে থাকত আমাদের টানে সে কি একবারও আসত না!

আমি নিশ্চিত, আত্মহত্যা করার মতো মানসিকতা হাসান মাস্টারের কোনও দিনও ছিল না। যার ভেতরে জ্ঞানের সমুদ্র তিনি কেন এই অজ্ঞানতার কাজ করবেন! হাসান মাস্টার বেঁচে আছেন। যতদিন না তিনি ওই গুন্ডাটার খোঁজ পাচ্ছেন, ততদিন এখানে আসবেন না। ওই দৃঢ়চেতা মানুষটি বদলা নিয়েই ফিরবেন।

মেসের ঠাকুর রামধন বলছিল, সে নাকি গুন্ডাটাকে বিলাসপুরের রাস্তায় দেখেছে। কিন্তু নাম ধরে ডাকা সত্ত্বেও সে রামধনের মুখোমুখি হয় না. সোজা ট্রাক নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে জটিল আবর্তিত রাস্তায়।

রামধনকে আমি বলেছিলাম, তুমি ঠিক দেখেছো তো, নাকি চোখের ভুল। রামধন খুব জোরের সঙ্গে বলেছে, ভুল আমার হতেই পারে না। যে ছেলেটাকে হাফপ্যাণ্ট পরা বয়স থেকে দেখছি—দিনের আলোয় তাকে আমি ভুল দেখব। হতেই পারে না,—ওটা ওই ছিল। আর যদি সে না হবে তাহলে আমাকে দেখে ভয়ে অমন পালালো কেন? আমি কি বাঘ, ভালুক যে খেয়ে নিতাম?

গুন্ডাটার পালিয়ে বেড়ানো নিয়ে নানা জন নানা কথা বলে, আমি কার কথা বিশ্বাস করব? আর ওটাকে খুঁজে পেলেও সীতাকে তো আর উদ্ধার করতে পারব না। তাতে বটুরই বা লাভ কী?

ঋতুচক্রের নিয়মানুসারে একটা বছর ঘুরে এল, আর একটা বর্ষাকাল পেখম মেলা ময়ূরের মতো আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সময়ের পলি অনেক শোকতাপকে ঢেকে দেয়। বটুর ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ উলটো। যত দিন যাচ্ছে বটু তার ভগ্ন স্বাস্থ্য, জঞ্জাল ভর্তি মুখমণ্ডল নিয়ে অস্থিচর্ম সার মানুষের বিজ্ঞাপন হয়ে উঠছে। ওর দিকে তাকাতেও এখন ভয় হয়।

মেসের ছেলেরা বটুকে এখন এড়িয়ে চলে, ওদের আশঙ্কা বটুর টিবি হয়েছে। বটু আর বেশিদিন জীবনের রথকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

আমি ওদের এই অশুভ আশঙ্কাকে গুরুত্ব দিই না। ডাক্তার মুখার্জি বিলাসপুর বদলি হয়ে যাবার পর ডাক্তার চট্টরাজ এসেছেন তাঁর জায়গায়। বটুকে আমি বহুবার তাঁর কাছে চেক আপ করানোর জন্য নিয়ে গিয়েছি। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, দেখুন এর কোনও অসুখ নেই। শারীরিক দুর্বলতা যা আছে তা দু-একটা টনিক খেলে ভাল হয়ে যাবে। তবে মাঝে-মাঝে যে জ্বর আসে সেটা মাত্রাতিরিক্ত অনিয়মের জন্য। একস্-রে প্লেটে টিউবারকিউলোসিসের কোনও লক্ষণ দেখছি না। পেটে যে ব্যথাটা হয় তা ওষুধে ছাড়বে না। তার জন্য মদটা পুরোপুরি ছাড়তে হবে।

আমি বটুর মাথায় বন্ধুত্বের সমব্যথী হাতটা বুলিয়ে দিয়ে বলি, শুনলে তো বটু, তোমার কোনও অসুখ নেই। তুমি পুরোপুরি সুস্থ। যেটুকু

তোমার দুর্বলতা আছে তা মনের। ডাক্তারবাবু তো মনের রোগের কোনও ওষুধ দিতে পারবেন না। মনের রোগ যার হয়েছে তার সংযম নিষ্ঠা আর আত্মবিশ্বাস রোগের একমাত্র ওষুধ।

বর্ষাকালটা বাড় বাড়ন্তের সময়। সন্ধের সময় আকাশ মেঘলা থাকলে আমরা সাধারণত কোথাও বেরোই না, মেসে বসে তাস খেলি। পরিমলের তাস খেলার বড় বাতিক, অথচ সামান্য দানে ভুল হলে ও প্রায় হাতাহাতি করে ছাড়ে। এবং সাধারণ ঘটনাকে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে যায়। গতকাল আমার সঙ্গে তাস খেলা নিয়ে পরিমলের তুমুল তর্কাতর্কি হয়েছিল, রাগ করে পরিমল পুরো তাসটাই ছিঁড়ে ফেলেছে। যার জন্য আজ খেলা বন্ধ। তার উপরে সন্ধে থেকে গুমোট একটা আবহাওয়া। পুরো আকাশটাই পাকা ফোঁড়ার মতো টনটন করছিল বৃষ্টি ধারায় নিজেকে হালকা করার জন্য। কারেণ্ট ছিল না বলেই মেস একেবারে অন্ধকার পুরী। এমন সময় চা আর সান্ধ্যকালীন জল খাবার দিয়ে গেল রামধন। আমি একটা ম্যাগাজিনের পাতা উলটে বিজ্ঞাপনের ছবি দেখছিলাম, আর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তারিয়ে-তারিয়ে নারী সৌন্দর্যের নির্যাসটুকু উপভোগ করায় মগ্ন ছিলাম। ঠিক সেই সময় রামধন আমাকে উচ্চস্বরে ডাকল, বাবু মদন এসেছে।

মদন বটুর হেড কর্মচারী। বিশ্বস্ত, অনুগত। আমি কিছুটা বিরক্ত হয়ে রামধনকে বললাম, পাঠিয়ে দাও।

মদন এসে উদ্ভ্রান্ত, বিপদগ্রস্ত চোখে তাকাল।

আমি শুধোলাম, কী হয়েছে? বটু কি কোন খবর দিয়েছে?

মদন কেমন কাঁচুমাচু চোখে তাকিয়ে ভেঙে পড়া স্বরে বলল, বটুদার আবার পেটের বেদনা শুরু হয়েছে। কাটা পাঁঠার মতো কেবল ছটফট করছে বিছানায়।

আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বললাম, আমি কী করব, আমার কাছে কেন এসেছ? তার চেয়ে দু-বোতল মদ এনে দাও, ওগুলো খেয়ে শুয়ে থাকুক।

মদন গেল না, শান্ত, অনুগত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল সামনে। আমি ম্যাগাজিনের পাতাগুলোয় চোখ বুলিয়ে শুধোলাম, পেটে যন্ত্রণা কখন থেকে শুরু হয়েছে? কোনও ওষুধ খেয়েছে কি? ওর তো এ রকম প্রায়ই হয়।

হয়, কিন্তু এবারেরটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ওষুধ, খাওয়ার সোডা সবই খেয়েছে তবু ব্যথা কিছুতেই কমছে না। আপনি একবার চলুন, সব নিজের চোখে দেখে আসবেন।

আমি গিয়ে কী করব, আমি কি ডাক্তার?

মদনের চোখে-মুখে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন খেলে গেল। সে কিছুটা

স্বর চড়িয়ে বলল, বিপদ বলেই তো ছুটে এসেছি, এবার যাওয়া-না-যাওয়া সব আপনার উপর। কথাগুলো বলেই সে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, আমি ওকে ডাকতেই ও থমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, কিছু বলবেন ?

আমি ঢোক গিলে বললাম, তুমি এক্ষুনি গিয়ে একটা রিক্‌শা ডেকে আন। দেরি যেন না হয়। ওকে ডাক্তার চট্টরাজের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

মদন চলে যাবার পরই প্যান্ট-জামা বদলে আমি বটুর কাছে চলে এলাম। অন্ধকার ঘরে বটু শুয়েছিল তক্তপোষের উপর। ধনুকের মতো ভাঁজ করা তার শরীর। কষ্টাভিব্যক্তির টুকরো-টুকরো শব্দগুলো আমার কানে এসে লাগল। আমি দেশলাই জেলে হ্যারিকেনটা ধরালাম, বন্ধ জানলা-দরজাগুলো খুলে দিলাম হাওয়া-বাতাস চলাচলের জন্য। তাতে এতক্ষণের দম বন্ধ করা গুমোট অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল। আমাকে একবার ঘাড় তুলে দেখে নিয়ে বটু আবার পূর্বের অবস্থায় হাত-পা কুঁকড়ে, হাঁটুটা পেটের কাছে চেপে ধরে শুয়ে থাকল। নুন দেওয়া জোঁকের মতো মাঝে মাঝেই সে সরব আর্তনাদে হাত খানেক উঠে বসেই আবার নেতিয়ে পড়ছিল বিছানায়। অনেকটা মূর্ছিত মানুষের অবস্থা। আমি ওর পাশে বসে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম—বটু, বটু। তোমার কোথায় কষ্ট বটু ?

বটু অস্ফুট আর্তনাদ করে আমার হাতটা চেপে ধরল, আমাকে বাঁচাও মাখনদাদা, বাঁচতে যে আমার বড় ইচ্ছে হয়।

আমি ওকে সাহস দিয়ে বললাম, তুমি তো পরগাছা নও, তুমি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ গাছ। মাটি-জলবায়ু-সূর্যকিরণ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে, তুমি এত ভেঙে পড়ো না শক্ত হও।

বটুকে কোনওমতে দাঁড় করালাম। বললাম, লুঙিটা বদলে প্যান্টটা পরে নাও। আমাদের এক্ষুনি ডাক্তার চট্টরাজের কাছে যেতে হবে।

বটু যন্ত্রণা বিকৃত স্বরে বলল, ডাক্তারের কাছে গিয়ে কী হবে ? মাখনদাদা, আমার এ রোগের কোনও ওষুধ নেই। এর একমাত্র ওষুধ হল মরণ।

আমি বটুর মুখে হাত চাপা দিলাম, ওকে বুকে টেনে নিয়ে বললাম, তুমি না ছেলে, তোমার এত ভেঙে পড়লে চলে ?

বটু জলে ভেজা পাখির ছানার মতো আমার বুকে মাথা রেখে কেঁপে উঠল বাতাস লাগা তেঁতুল পাতার মতো। এক সময় দেখি—তপ্ত অশ্রুধারায় আমার কাঁধের কাছটা ভিজে যাচ্ছে, অনর্গল বটুর দু-চোখ থেকে নেমে আসছে শ্রাবণের ধারা। আমি বটুকে কিছুতেই কান্না থেকে সংযত করতে পারলাম না। বটু তার হিসাব লেখা ডাইরির ভেতর থেকে ধোঁয়াশা, অস্পষ্ট, মলিন, বয়সের ভারে জীর্ণ লাল হয়ে যাওয়া একটা পাশপোর্ট মাপের ছবি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবেগরুদ্ধ গলায় বলল, আমি যদি না ফিরি এই ফটোটা সযত্নে তোমার কাছে রেখে দিও। যখন কলকাতা যাবে তখন মা গঙ্গার বুকে

একে ভাসিয়ে দিও। আমি জানি গঙ্গা হল সব মানুষের মিলনের অন্তিম স্থল।

মদন যখন রিকশা নিয়ে ফিরল তখনও রেল কলোনিতে আলো আসেনি, ইলেকট্রিকের খাম্বাগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। টিপ টিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল, সেলুনের জল স্প্রে করার মতোন। রিকশার হুড তুলে দিয়ে বটুকে জড়িয়ে ধরে বসলাম। বটুর বসে থাকার ক্ষমতা ছিল না. রিকশা মন্দির রাস্তার বাঁকটা পেরোতেই বটুর মাথাটা আমার কোলের উপর ঢলে পড়ল।

হাসপাতাল নয়, এখন ডাক্তার চট্টরাজকে তার বাংলোতে গেলেই পেয়ে যাব। রিকশাওয়ালাকে সেই মতো নির্দেশ দিতেই সে জোরে প্যাডেল ঘুরিয়ে অন্ধকারে ডাক্তারবাবুর গেটের সামনে রিকশাটাকে দাঁড় করিয়ে দিল। আমি রিকশাওয়াকে অপেক্ষা করতে বলেই বটুকে নিয়ে সামনের লনটাতে ঢুকে গেলাম।

ডাক্তার চট্টরাজ খুব সৌখিন মানুষ। তার ঘেরা বাগানটাতে নানান ফুলের সমারোহ ; টবে লাগানো বিভিন্ন জাতের ক্রশব্রিড করানো গোলাপগুলো আকর্ষণির মূল বিন্দু। মাধবীলতার ঝোপটা হেলে পড়েছিল গেটের উপর। তবু থোকা থোকা ফুলগুলো তারার মতো অন্ধকারেও দেখা যায়। আমি বটুকে লম্বা বারান্দায় সাজিয়ে রাখা বেতের চেয়ারে বসতে বলে কলিং বেলের নব্ টিপলাম।

ডাক্তারবাবু দরজা খুলে অবাক গলায় বললেন, কী ব্যাপার মাখনবাবু ?

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, বটুকে নিয়ে এসেছি, সন্ধে থেকে ও আর পেটের যন্ত্রণায় উঠতে পারছে না। ওই দেখুন কেমন জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।

এ তো সেই পুরনো কেস। আমাকে বসতে বলে ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকে গেলেন, তারপর দু-কাপ চায়ের কথা বলে স্টেথো হাতে বেরিয়ে এলেন। বটুকে পরীক্ষা করে বললেন, সেই পুরনো ব্যথা, ওষুধ তো সব চেঞ্জ করে দিয়েছি, এখন কী করি বলুন তো—বলেই আবার উঠে গেলেন ঘরের ভেতর. একটা ট্যাবলেট বটুর হাতে দিয়ে বললেন, এটা খেয়ে নিন। কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি বাইরে থেকে কিনে নেবেন। আশা করছি ভাল হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু যখন প্রেসক্রিপশান লিখছিলেন, তখন একটা ট্রে তে দু-কাপ চা নিয়ে কাজের মেয়েটা এগিয়ে এল সামনে। কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্পটা যথেষ্ট আলো দিচ্ছিল। আমি সেই বাতির আলোয় মেয়েটার মুখের দিকে তাকালাম, মেয়েটা দেখি আমার দিকে পাথর চোখে তাকিয়ে আছে। এত চেনা মুখ এখানে, এভাবে দেখব কল্পনা করিনি। আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ কী করে সম্ভব হয় ? স্বপ্ন দেখা তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষের মতো অতর্কিতে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, সীতা, তুমি-ই-ই ! তখনই প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠা গাছের মতো দুলে উঠল সীতা, তার

হাতের ট্রে-টা খসে পড়ল মাটিতে, ঝন-ঝনাৎ শব্দে ভেঙে চুরচুর হল চীনামাটির কাপ। ভয়ার্ত চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে টাল মাটাল পায়ে ছুটে গেল ঘরের দিকে।

আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে, উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে আবার বসে পড়লাম চেয়ারে। ডাক্তার চট্টরাজও ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল। বটু যন্ত্রণা হজম করে তাকিয়েছিল ভাঙা কাপ-প্লেটগুলোর দিকে। ডাক্তার চট্টরাজ সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিনতিকে কি আপনি চেনেন?

আমি অবাক গলায় বললাম, কে মিনতি? ওর নাম তো সীতা।

সীতা!

আমি ডাক্তার চট্টরাজের বিস্ফারিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ওর নাম সীতা-ই। ওই মেয়েটার জন্যই তো বটুর এমন দশা।

তার মানে? পালটা প্রশ্নে ডাক্তার চট্টরাজ আমাকে উত্তক্ত করে তুললেন।

আমি বললাম, আপনি শান্ত হয়ে বসুন। আমি আপনাকে সব বলছি।

সেই প্রথম দিন সীতার সঙ্গে আলাপের ঘটনা থেকে শুরু করে বটুর বিয়ে ভাঙার সমস্ত কথাই আমি ডাক্তার চট্টরাজের কাছে সবিস্তারে খুলে বললাম। সব শুনে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের দিকে উঠে গেলেন তিনি। ফিরে এলেন মিসেস চট্টরাজকে সঙ্গে নিয়ে। পাশাপাশি চেয়ারে বসে মিসেস চট্টরাজ আমাকে বললেন, আপনি যাকে 'সীতা' বলছেন আসলে ও আমাদের কাছে মিনতি নামেই পরিচিত। আমরা যখন বিলাসপুরে ছিলাম তখন ওকে কাজে রাখি। আমাদের বাংলো পিয়ন সুখলাল ওকে কাজে ঢুকিয়ে দেয়। সুখলালের মুখেই শুনেছিলাম, মেয়েটা মাস তিনেক হল বিধবা হয়েছে। ওর স্বামী ট্রাক চালাত। একদিন বেহেড মদ খেয়ে ট্রাক চালাতে গিয়ে সরাসরি একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল। একেবারে হেড ইঞ্জুরি এবং স্পট ডেথ। মেয়েটার দুর্দশা দেখে দয়া হল। সেই থেকে মিনতি আমাদের সঙ্গে আছে। বড় ভাল মেয়ে। কাজের মেয়েরা যে এত ভাল হয়—আমার ধারণা ছিল না।

আমি ঢোক গিলে বললাম, বউদি, ওর সঙ্গে কি একটু কথা বলতে পারি?

কেন পারবেন না? দাঁড়ান, ওকে আমি ডেকে দিচ্ছি।

সীতা একা এল না, বউদিই তাকে জোর করে ধরে আনলেন। একটা ফাঁকা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলাতে ও কিছুতেই বসল না। ডাক্তার চট্টরাজ তখন মধ্যস্থতায় এগিয়ে এলেন। সীতাকে বললেন, বস। তোমার সঙ্গে কিছু দরকারি আলোচনা আছে। তারপর বটুকে দেখিয়ে বললেন, একে তুমি চেন?

সীতা মুখ নামিয়ে নিয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে সশব্দে কেঁদে উঠল। বউদি সীতার গায়ে মাথায় সযত্নে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, কাঁদছ কেন,

আজ তো তোমার সুখের দিন! এই দিনটাই তো তোমার জীবনে অনেক আগে আসা দরকার ছিল। যাই হোক, একটা বছর পিছিয়ে গিয়েছে। মাঝখানের ঘটনাগুলোকে দুর্ঘটনা বলে মনে করে নিও। মানুষের জীবনে এ রকম অনেক কিছুই হয়ে থাকে।

এ আনন্দে ডাক্তার চট্টরাজ বললেন, মাখনবাবু তখন তো চা খাওয়া হল না, এখন এক কাপ হয়ে যাক।—তারপর সীতার দিকে কৌতুকের চোখে তাকিয়ে বললেন, যাও, জীবনের সেরা চা-টা তুমি করে খাওয়াও। হ্যাঁ, দু-কাপ—চার কাপ। বটুও খাবেন।

চা পর্ব চুকে যাবার পর আমি ডাক্তার চট্টরাজকে বললাম, বটুর প্রেসক্রিপশানটা দিন। ওষুধগুলো বাজার থেকে আনতে হবে।

ডাক্তার চট্টরাজ পরিচ্ছন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে আমার দিকে তাকালেন কিন্তু প্রেসক্রিপশানটা দিলেন না। ওটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বললেন, প্রেসক্রিপশানের আর দরকার হবে না। বটুর একমাত্র ওষুধ হল সীতা। আপনারা বটুর বিয়ের ব্যবস্থা করুন, আমি নিজের হাতে সীতাকে সম্প্রদান করব।

শ্রাবণ মাসের সাত তারিখে বটুর বিয়ের দিন ধার্য করা হল। রেল ইনস্টিটিউট ভাড়া নিয়েছেন ডাক্তার চট্টরাজ। আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেননি তিনি। সীতা রীতিমতো ভাগ্যবতী বলেই অমন দরাজ হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়েছে। ডাক্তার চট্টরাজের দান তার জীবনে দেবতার আশীর্বাদের মতো। মিসেস চট্টরাজ বধূবেশী সীতাকে নিজের হাতে সাজিয়েছেন, বর্ণময় আলোকচ্ছটায় মোহিনী, অপরূপা হয়ে উঠেছে সীতা। তার দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না সহসা।

সম্প্রদানের সময় লোকাল থানার ও-সি এসে ডাক্তার চট্টরাজকে ডেকে নিয়ে গেলেন দূরে। কী সব আলোচনা সেরে ফিরে এলেন আবার। আলোচনা যে সন্তোষজনক হয়নি তা ও-সি-র উগ্র মেজাজ আর দুর্ভাবনায় হঠাৎ কালি হয়ে যাওয়া ডাক্তার চট্টরাজের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। পুলিশ দেখে বটুর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল তাকে। সীতা পথ ভোলা হরিণীর মতো অসহায় চোখে তাকিয়ে। পলকে সমস্ত আনন্দ কে যেন নিংড়ে নিয়েছে তার সুসজ্জিত, সুভাষিত দেহ থেকে। মিসেস চট্টরাজ তাকে সস্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় পেও না সীতা। যে কোনও শুভ কাজে এ ধরনের বাধা-বিপত্তি এসেই থাকে। মানুষের ধর্ম হল মাথা ঠান্ডা রেখে সব কিছুকে অতিক্রম করা।

ডাক্তার চট্টরাজ অনুনয়ের গলায় ও-সি-কে বললেন, অধৈর্য হবেন না মিস্টার ঘোষ। বিয়েটা আগে হয়ে যেতে দিন তারপর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আপনার কাছে আমরা ভিক্ষা চাইছি।

ও-সি মাথার টুপি খুলে বুক চাপা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে থাকলেন রুদ্ধশ্বাসে। সানাইয়ের সুর তখন বাতাসে ভরে আছে হিম বুক নিয়ে ঘুরে বেড়ানো শীতের সকালের মতো। মানুষের আনন্দ-উল্লাসে তিলমাত্র বিঘ্ন ঘটেনি, সব আয়োজনই নিখুঁত।

বিয়ের পরে বটুর হাতে হ্যান্ডক্যাপ পরালেন পুলিশ। একটা মানি অর্ডারের শেষাংশ দেখিয়ে বললেন, এটা কি তোমার হাতের লেখা ?

বটু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই ও-সি বললেন, সুখিয়া পাশোয়ান তোমার কে হয় ?

এবার চুপ করে থাকল বটু, ঘামে গুলে গেল তার কপালের চন্দন।

ও-সি ভ্রূ বেঁকিয়ে কঠোর স্বরে ধমকে উঠলেন, তুমি তোমার কাকাকে খুন করেছ, তুমি তোমার মাকেও খুন করেছ, তোমার নামে জোড়া খুনের অভিযোগ। তুমি কি এই অভিযোগ অস্বীকার কর ?

বটু নীরব সম্মতি জানাতেই পুলিশ ভ্যানটা ওকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল অন্ধকারে। মিসেস চট্টরাজের হাত ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল সীতা, বউদি, আমি যে সব পেয়েও আবার হারিয়ে ফেললাম !

মিসেস চট্টরাজ সস্নেহে সীতার মাথায় হাত রাখলেন, মানুষের কোনও কিছুই হারায় না। তুমি অপেক্ষায় থাক সীতা। এই অপেক্ষাই হবে তোমার অগ্নি পরীক্ষা।

তখনও পবিত্র হোম যজ্ঞের আগুন নেভেনি। সেই প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে ভরসায় চোখের জল মুছে নিল সীতা।